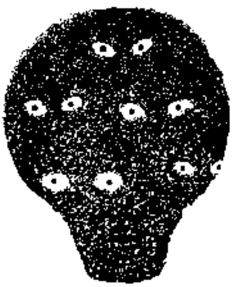

ভৌতিক ডট কম
অনীশ দেব

৯টি গল্প

৩টি উপন্যাস

সবগুলোই ভৌতিক

# ভৌতিক ডট কম



অনীশ দেব



সুপ্রিম পাবলিশার্স
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Bhoutik Dot Com
by *Anish Deb*

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০১১

**প্রকাশক**
*শতদল জানা*
*১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট*
*কলকাতা ৭০০ ০৭৩*

**মুদ্রাকর**
*নবলোক প্রেস*
*৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট*
*কলকাতা ৭০০ ০০৬*

**অক্ষরবিন্যাস**
*প্রদ্যুৎ সাহা*
*৭, কামারডাঙ্গা রোড*
*কলকাতা ৭০০ ০৪৬*

**প্রচ্ছদ**
*সুদীপ্ত দত্ত*

**১৫০ টাকা**

*গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়*

*— শ্রদ্ধাভাজনেষু*

*মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য় আপনি আমার প্রথম গল্প 'ভারকেন্দ্র' প্রকাশ করেছিলেন। লেখালেখির পথে দাঁড়িয়ে সেই ঘটনাটা সবসময় মনে পড়ে।*

# সূচিপত্র

## গল্প



## উপন্যাস

# একমিনিট, আপনাকে বলছি

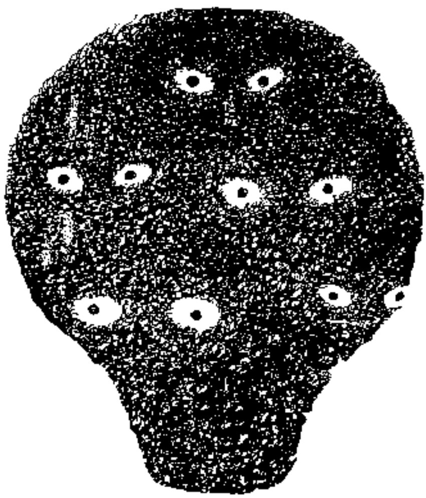
আপনার হাতে এখন একটা নতুন বই। এই বইয়ের মধ্যে রয়েছে ন'টি গল্প, আর দুটি উপন্যাস—একেবারে নতুন, বইয়ের দু-মলাটে এল এই প্রথম। এ ছাড়া রয়েছে আরও একটি উপন্যাস 'আঁধারপ্রিয়া'—যা একযুগ আগে 'আঁধারপ্রিয়া' নামের একটি বইতে 'আমার যুদ্ধ' নামের একটি উপন্যাসের সঙ্গে প্রথম জায়গা করে নিয়েছিল। এই উপন্যাসটি যদি আপনি আগে না পড়ে থাকেন তা হলে এটা আপনার 'বোনাস'। আর যদি ঘটনাচক্রে এই লেখাটি আপনার আগে পড়া হয় তা হলে আর-একবার লেখাটি পড়ার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করছি।

এই বইয়ের একডজন লেখা পড়ে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হল সেটা জানতে পারলে বেশ হত। কারণ, আপনি নিয়মিত পড়েন বলেই আমার এত লেখালিখির ঘটা। আমার ই-মেল আই-ডি নীচে দিলাম। আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারলে ভালো লাগবে।

আপনাকে 'ভৌতিক' পরিবেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। তা ছাড়া একমিনিট সময়টাও বোধহয় শেষ হয়ে গেছে।

অনীশ দেব

# গল্প



# তোমার আসা চাই

ঠিক এইভাবেই সিদ্ধার্থকে বলত নিনি। যেন জন্মদিনের পার্টিতে ওকে ইনভাইট করছে।

বিয়ের আগে যখনই রাস্তাঘাটে, মেট্রো রেলের কাউন্টারের সামনে, কিংবা সিনেমা হলে সিদ্ধার্থর সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত তখন এইভাবেই জোর দিয়ে বলত নিনি। অথচ ও নিজেই দেরি করে আসত—সবসময়। এ নিয়ে সিদ্ধার্থ কিছু বলতে গেলেই হাউমাউ করে বাধা দিয়ে বলত, 'মেয়েদের ওরকম একটু দেরি হয়। পরে আসব না তো কি আগে এসে ভোম্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব!'

এখন অন্ধকারে বসে সেসব কথা মনে পড়ছিল আর চোখের কোণে জল আসছিল। আজ আসবে তো সিদ্ধার্থ? নাকি আসবে না?

ঘরের এককোণে ধূপ জ্বলছিল। অন্ধকারে উজ্জ্বল লাল ডগাগুলো গুনল নিনি। তেরোটা। সাগরিকা বলেছে, 'তেরোটা ধূপ জ্বালালে ভালো হবে। বেশ স্পিরিট-ফ্রেন্ড্লি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হবে।'

নিনির সামনে গোলটেবিল। টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে একটা লম্বা মোমবাতি। একপায়ে দাঁড়িয়ে জ্বলছে।। সেই মলিন আলোয় কালচে টেবিলের কাঠ অল্পসল্প চকচক করছিল। সেখানে একটা সাদা কাগজ পাতা, তার ওপরে ধ্যাবড়া করে খানিকটা সিঁদুর মাখানো। আর সেই সিঁদুরের ওপরে ত্রিভুজের চেহারায় সাজানো তিনটে কড়ি। কড়ির গায়ে মোমের আলো হাইলাইট তৈরি করছে।

নিনির বাঁ-পাশ থেকে সঙ্গীতা ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই, নড়িস না। কনসেনট্রেট কর। একমনে সিদ্ধার্থর কথা ভাব.....।'

টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে ওরা চারজন।

নিনি, সাগরিকা, সঙ্গীতা আর সন্দীপন।

আজকের মেইন আইডিয়াটা সন্দীপনের। সাথে ওর বউ সঙ্গীতা, আর নিনির বেস্ট ফ্রেন্ড সাগরিকা উৎসাহের ইন্ধন জুগিয়েছে। নিনির একেবারেই মত ছিল না। কিন্তু তিনজনের চাপের কাছে ও শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে।

সিদ্ধার্থ অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে আজ কতদিন? কুড়ি পেরিয়ে একুশদিন।

চারতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। রাত তখন বড়জোর এগারোটা। নিনিও ছাদে ছিল। আকাশের তারা আর উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনের আলো

দেখছিল। একইসঙ্গে ছুটে আসা বাতাসের আদর উপভোগ করছিল।

হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! একটা আচমকা আর্ত চিৎকার: 'নিনি—!'

চমকে ঘুরে তাকিয়েছিল। অন্ধকার পাঁচিলের ওপরে সিদ্ধার্থের সিলুয়েট আর দেখা যাচ্ছে না। সিগারেটের আগুনের বিন্দুটাও আর নেই।

ছুটে পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল নিনি। অনেক নীচে, গুলি খাওয়া বেলে হাঁসের মতো, এলোমেলো হয়ে পড়ে পড়ে আছে সিদ্ধার্থ।

নিনির মাথাটা কেমন পাক খেয়ে গিয়েছিল। শুধু মনে আছে, ছাদে লুটিয়ে পড়ার আগে ও আকাশের তারা দেখতে পেয়েছিল।

সেইদিন থেকে সংসারে নিনি একা হয়ে গেল। বাবা চলে গেছেন সেই কোন ছোটবেলায়। মা-ও চলে গেছেন চারবছর আগে। ভাই-বোন কেউ ছিল না। তাই শুধু সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ও বেঁচে ছিল।

অন্ধকারে একটা খসখস আওয়াজ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপনের চাপা গলা শোনা গেল, 'কেউ কি এসেছেন?'

চাপা কাশির শব্দ শোনা গেল।

নিনির হাতের ওপরে সঙ্গীতার হাতের চাপ বেড়ে গেল। ডানদিকে বসা সাগরিকার শুধু হাতের চাপ বাড়ল না, হাতটা তিরতির করে কাঁপতেও লাগল।

'কেউ কি এসেছেন?' আবার সন্দীপন।

কাপড়ে কাপড় ঘষার শব্দ হল। অচেনা একটা গলা অস্পষ্টভাবে 'হুঁ' বলে উঠল।

নিনি ভয় পেয়ে গেল। যদিও প্ল্যানচেট-ফ্যানচেটে ওর এতটুকুও বিশ্বাস নেই। সে-কথা ও বারবার বলেছে। কিন্তু ওরা তিনজন শুনলে তো!

সন্দীপন একই প্রশ্ন তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার করল, কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ঘরের চতুর্দিকে তাকাল নিনি। মোমের আলোর পরিধি পেরিয়ে ঘরের অন্ধকার আনাচেকানাচে ওর সন্ধানী চোখ ঘুরে বেড়াল। কোনও অস্বাভাবিক বাড়তি ছায়া কি নজরে পড়ছে?

সিদ্ধার্থর চলে যাওয়াটা খুব দুঃখের হলেও তার মধ্যে একটা সান্ত্বনার ছোঁয়া আছে। কয়েকদিন আগে ওকে খুশি রাখার চেষ্টা করতে-করতে সাগরিকা হঠাৎ বলে ফেলেছে, 'শোন, সিদ্ধার্থর ব্যাপারটা খুব স্যাড মানছি—বাট এটা তো ঠিক যে, এখন তুমি ব্যাপক বড়লোক। লাইফে সেফটির জন্যে টাকা একটা মেজর ফ্যাক্টর। সিদ্ধার্থর সবকিছু তো তুই-ই পাবি। যে যাওয়ার সে গেছে—কিন্তু তোমার মুখের রুপোর চামচ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না...।'

না, সাগরিকা কিছু ভুল বলেনি। সিদ্ধার্থর সাম্রাজ্য নেহাত ছোট ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর থেকে নিনির কোনও স্বপ্নকে আমল দেয়নি ও। ওর কাছে জীবন বলতে ভালো থাকা-খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, গাড়ি, বাড়ি, হইহল্লোড়, ফুর্তি—ব্যস।

অথচ নিনির আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল, ছবি আঁকা শিখে বড় পেইন্টার হওয়ার সাধ ছিল। ও ভেবেছিল, আমেরিকায় গিয়ে এই সাধগুলো ও পূরণ করবে, কিন্তু হয়নি। সিদ্ধার্থ ওর ইচ্ছেগুলোয় সায় দেয়নি। বরং ওর পেইন্টার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কখনও-সখনও বাজে ঠাট্টা করেছে। ওর সঙ্গে এ নিয়ে তর্কাতর্কিও করেছে নিনি। তারপর তর্ক থেকে ঝগড়া।

কিন্তু শুধু এই সমস্যাটুকু ছাড়া সিদ্ধার্থর আর কোনও সমস্যা ছিল না। হি ওয়াজ আ গুড হাজব্যান্ড।

হঠাৎই ফিসফিসে গলায় কে যেন টেনে-টেনে উচ্চারণ করল, 'নি—নি—।'

নিনির গায়ে কাঁটা দিল। এই প্রথম ওর মনে হল ও যেন প্রাণ খুলে সিদ্ধার্থকে বলতে পারছে না, 'তোমার আসা চাই!' বরং যেন মনে হচ্ছে, এই অন্ধকার ঘরে ও যেন না আসে। ও যদি প্রেতলোকে এখন থেকে থাকে তা হলে সেখানেই থাক। কিন্তু সিদ্ধার্থ কি এখন নিনির কথা শুনবে? ও কি নিনির চিন্তা টের পাচ্ছে?

আবার পা টেনে চলার ঘষটানির শব্দ। এবং হালকা অস্পষ্ট গলায় কে যেন বলল, 'নিনি। নিনি—আমি এসেছি।'

নিনির মনে হল, এই কাঁপা-কাঁপা ফিসফিসে স্বর যেন অন্য কোনও হিমশীতল জগৎ থেকে ভেসে আসছে।

কিন্তু এ অসম্ভব! নিনি ভালো করেই জানে ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। ওরকম যা-কিছু শোনা যায় সবই মনের ভুল—দেখা কিংবা শোনার ভুল। এখন ও যে-কথাগুলো শুনছে সবই হ্যালুসিনেশান।

'নিনি...নিনি...আমি...আমি এসেছি...।'

সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র ভয়ের চিৎকার।

মেয়েলি গলায় ওদেরই কেউ চিৎকার করেছে। মনে হল, চিৎকারটা নিনির ডানদিক থেকে এল।

চিৎকারের তীব্রতায় নিনি আঁতকে উঠল। সন্দীপন হঠাৎই জোরালো গলায় বলল, 'কোনও ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। আমি আলো জ্বালছি...।'

আলো জ্বলে উঠল।

সাগরিকা মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সঙ্গীতা আর সন্দীপন ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎই সন্দীপন দু-হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'ও. কে. বাবা! সরি। সরি এভরিবডি, সরি। ওইসব ভূতের আওয়াজ আমি করেছি। আর নিনির নাম ধরে ফিসফিস করে ভুতুড়ে কথাগুলো আমিই বলেছি। স্রেফ মজা করার জন্যে—আর নিনিকে আওয়াজ দেওয়ার জন্যে। ও সবসময় বলে ভূত বলে কিছু নেই।' সাগরিকার মাথায় হাত বোলাল সন্দীপন: 'সাগরিকা, কাম ডাউন লেডি। আই সেইড আই অ্যাম সরি....।'

নিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ ওর কেমন যেন দম আটকে আসছিল।

শেষ পর্যন্ত বহু তোয়াজ করে সাগরিকাকে শান্ত করা গেল। সন্দীপন মজা করে এ-কথাও বলল, 'আচ্ছা, এবার চুপ কর—তোকে একটা এক্সট্রা-লার্জ ক্যাডবেরি খাওয়াব।'

প্ল্যানচেট-পর্ব এভাবেই শেষ হল।

একটু পরে ওরা তিনজন চলে গেল। আড়াইহাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে নিনি এখন একা। গেস্ট বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ও গোলটেবিলটার দিকে তাকাল। নিভিয়ে দেওয়া মোমবাতিটা একপায়ে দাঁড়িয়ে। ধূপকাঠিগুলো জ্বলে-জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। সিঁদুর মাখানো কাগজ আর কড়িগুলো এখন কত নিরীহ দেখাচ্ছে।

সন্দীপনটা বরাবরই একটু ফাজিল। প্র্যাকটিক্যাল জোক করে অন্যকে হেনস্থা করে। তবে মানুষটা ভালো। হয়তো নিনির মন ভালো করার জন্যই ও এরকম একটা ভয়ের নাটক করেছে।

গেস্ট বেডরুমের আলো নিভিয়ে দিল নিনি। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল। এখন ও কত একা! কিন্তু একইসঙ্গে কত স্বাধীন!

গুনগুন করে দু-লাইন গান গাইল নিনি। অতীত এখন অতীত। এখন ওকে তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। ওর ইচ্ছেগুলো এখন ইচ্ছেমতো ডানা মেলতে পারে।

হঠাৎই দরজায় নক করার শব্দ শুনতে পেল।

চমকে উঠল নিনি। আওয়াজ লক্ষ করে ফিরে তাকাল।

গেস্ট বেডরুমের দরজার ওপাশ থেকে কেউ আলতোভাবে নক করছে।

ঠক-ঠক। ঠক-ঠক।

নিনির নার্ভ মোটেই কমজোরি নয়। ও একটুও ভয় পেল না। উলটে বন্ধ দরজাটার খুব কাছে এগিয়ে গেল।

দরজাটা খুলবে না কি?

আবার নক করার শব্দ।

তারপর ফিসফিসে গলায় কেউ ডেকে উঠল, 'নিনি, আমি এসেছি—।'

সন্দীপন কি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মজা করছে?

অসম্ভব! কারণ, ওরা তিনজন অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। নিনি ওদের ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। তারপর নিজের হাতে দরজা লক করেছে। এতে কোনও ভুল নেই, ভ্রান্তি নেই।

আবার ডাকল সে, 'নিনি, দরজা...খোলো। আমি...আমি এসেছি...।' যন্ত্রণায় কাতর একটা মানুষ হাঁপাতে-হাঁপাতে শ্বাস টেনে-টেনে কথা বলছে।

নিনি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি তো সবসময় বলতে, "তোমার আসা চাই।" তাই আমি এসেছি। দরজা খোলো, নিনি—তোমার সঙ্গে কথা আছে....।'

নিনি একটু ভয় পেল এবার। উদভ্রান্ত চোখে চারপাশে তাকাল। কী করবে ভেবে পেল না।

নক করার শব্দ ক্রমশ জোরালো হতে লাগল। হতে-হতে সেটা ধাক্কায় বদলে গেল।

'নিনি! নিনি!'

গলাটা এবার সিদ্ধার্থর মতো লাগছে না?

এখন নিনি কী করবে? চিৎকার করবে? অন্য ফ্ল্যাটের লোকজনদের ডাকবে?

'কে? কে তুমি?' নিনি মরিয়া হয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

'নিনি, তুমি দরজা না খুললে.....আমি....দরজা....ভেঙে....।'

'না! তুমি সিদ্ধার্থ নও! তুমি...তুমি...।'

'হ্যাঁ, আমি সিদ্ধার্থ। আমি জানি....সেদিন রাতে....ছাদে স্মোক করার সময়....কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আর তুমিও সেটা ভালো করে জানো, নিনি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ এ-কথা জানে না। এবার বিশ্বাস হল তো! নাউ বি আ গুড গার্ল...অ্যান্ড ওপেন দিস ড্যাম ডোর, উইল য়ু?'

# আমার বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুল

মৌমিতাকে আমার বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলের আসল ব্যাপারটা খুলে বলিনি। কারণ, খুলে বলাটা খুব সহজ নয়। কিন্তু ও যে বারবারই আমার বাঁ-হাতের দিকে তাকায় সেটা আমি লক্ষ করেছি। এখনও দেখছি, ও কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে আমার বাঁ-হাতের দিকে চেয়ে আছে।

আমি বাঁ-হাতে সবসময় সাদা দস্তানা পরে থাকি। কাপড়ের দস্তানা। ঠাটবাটওলা রেস্তরাঁয় বেয়ারারা যেমন পরে থাকে। এখনও আমাদের টেবিলের আশেপাশে দু-তিনজন বেয়ারা এরকম সাদা দস্তানা পরে আছে।

মৌমিতাকে আজ ডিনার খাওয়াতে 'দ্য অর্কিড'-এ নিয়ে এসেছিলাম। ই এম বাইপাসের ধারে এই 'দ্য অর্কিড' রেস্তরাঁটা মন্দ নয়। এখানে জগঝম্প নাচ-গান নেই। তার বদলে শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ। খুব সফ্ট টোনে খুশির মুড তৈরির মিউজিক বাজছে। এসি-র তীব্রতা প্রায় শীত করার মতো। বেশিরভাগ টেবিলই ভরতি থাকলেও কারও কথা শোনা যাচ্ছে না। সবাই নিশ্চয়ই নীচু গলায় কথা বলছে। আমাদেরই মতো।

'একটা কথা জিগ্যেস করব?' মৌমিতা হঠাৎ মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

'করো।' আমি জানতাম ও কী জিগ্যেস করবে।

'তুমি বাঁ-হাতে সবসময় গ্লাভ্স পরে থাকো কেন?'

'গ্লাভ্স নয়—গ্লাভ বলো...' হেসে বললাম আমি, 'আমি তো শুধু বাঁ-হাতে পরেছি—দু-হাতে পরিনি।'

'তুমি আনসারটা এড়িয়ে যাচ্ছ।' কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বায়নার সুরে ও বলল, 'বলো না! বলতে কোনও প্রবলেম আছে?'

আমার মনটা হঠাৎ কেমন-কেমন হয়ে গেল। প্রবলেম? ভালো কথাই বলেছে মৌমিতা। প্রবলেম নেই আবার!

একহাতে দস্তানা পরে থাকি বলে অনেকের কাছেই আমাকে জবাবদিহি করতে হয়। কাউকে বলি, এটা আমার এক বিচিত্র শখ। কাউকে বলি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ার সময় এই অভ্যেসটা ডেভেলাপ করেছে। আবার কাউকে বা তিতিবিরক্ত হয়ে বলি, আমার বাঁ-হাতে স্কিন ডিজিজ আছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কী সেটা একজন ছাড়া কাউকে বলিনি—অন্তত এখনও।

কৌতূহল থাকাটা দোষের নয়। সুতরাং মৌমিতার কোনও দোষ নেই।

ব্যাপারটা ওর জানতে ইচ্ছে করতেই পারে। তাই ওর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'মৌ, বলতে কোনো প্রবলেম নেই। তবে...মানে...এর পেছনে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে...।'

ও বড়-বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই? তা হলে বলো—প্লিজ...।'

রেস্তরাঁর ছায়া-ছায়া আলোয় আমি ওকে ভালো করে দেখতে চাইলাম।

মৌমিতা। লম্বা স্লিম চেহারা। মাথার একরাশ চুলে সোনালি রঙের ঝিলিক। লম্বাটে ফরসা মুখ। টানা-টানা চোখ। এই চোখে চোখ পড়লে নজর ফেরানো যায় না। চোখা নাক। সামান্য ফোলা দু-ঠোঁট যেন সবসময়েই দুষ্টু হাতছানি দিচ্ছে।

মৌমিতাকে আমি ভালোবসি। খুব সাধ ওকে নিয়ে বাকি জীবনটা একসঙ্গে থাকব। আমার ভেসে-বেড়ানো দিকশূন্য ছন্নছাড়া জীবনে ও সারথি হয়ে আসুক। আমাকে সামলে নিক। আমাব সুখ-দুঃখের শরিক হোক। আমার অভিভাবক হয়ে উঠুক।

মৌমিতাকে এখনও এসব কথা বলিনি। দস্তানার গল্পটা বলার পর বলব। মনে হয় না ও আমাকে ফিরিয়ে দেবে।

আমি বেয়ারাকে ডেকে বিল দিতে বললাম। তারপর মৌ-কে চাপা গলায় বললাম, 'এখানে নয়—গল্পটা তোমাকে গাড়িতে যেতে-যেতে বলব।'

ও খুব খুশি হল। কোল্ড ড্রিঙ্কের খালি গ্লাসটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'সোনু, আই লাভ য়ু...।'

আমি বললাম, 'গল্পটাতো এখনও শোনোনি...আগে শোনো...তারপর...।'

বিল মিটিয়ে আমরা দুজনে উঠে পড়লাম। রেস্তরাঁর কাচের দরজার কাছে এসে দেখি বৃষ্টি পড়ছে—তবে তেমন জোরে নয়। আমি আর মৌ হাত ধরাধরি করে ছুট লাগালাম গাড়ি লক্ষ করে।

গাড়িতে গুছিয়ে বসার পর মৌ বলল, 'বৃষ্টিটা হেভি রোম্যান্টিক—তাই না?'

'তুমি পাশে থাকলে আমার কাছে মরুভূমিও রোম্যান্টিক লাগবে।'

'ওয়াও!' বলে আমার জামা ধরে টান মারল মৌ। ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে ছোট্ট ঠোকরানো চুমু খেল গালে।

জানলার কাচ তোলাই ছিল। হালকা করে এসি চালিয়ে দিলাম। তারপর পার্কিং লট থেকে গাড়ি তুলে নিয়ে এলাম বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায়।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল।

বৃষ্টির জন্যে রাস্তা দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে ওয়াইপার চালিয়ে দিলাম। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে চোখ গেল। আটটা ঊনচল্লিশ।

নাঃ, রাত বেশি হয়নি। ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে মৌ-কে বাড়িতে পৌঁছে দিলেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাইডরোডে ঢুকে পড়লাম। এ-রাস্তাটায় গাড়ি-টাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। দোকানপাটও চোখে পড়ছে না। আলো বলতে রাস্তার দুপাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর সোডিয়াম বাতি।

মৌমিতার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই দস্তানার ব্যাপারটা তোমার অনেকদিন ধরেই জানতে ইচ্ছে করছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। য়ু আর স্মার্ট, সোনু। তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই এটা আমার কাছে একটা বিশাল কিউরিয়োসিটি...। আজ কৌতূহল চাপতে না পেরে তোমাকে স্ট্রেটকাট জিগ্যেস করে ফেলেছি...।' হঠাৎ কী ভেবে ও বলল, 'তুমি কি মাইন্ড করলে, সোনু? তা হলে থাক...।'

'ওহ্-হো, কী যে বলো! হোয়াই শুড আই মাইন্ড?' কথা বলতে-বলতে ঝুঁকে পড়ে ওর মাথায় একটা চুমু খেলাম: 'তোমাকে সবকিছু খুলে বলতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, গল্পটা শুনলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না।'

উত্তরে মৌ আমার দস্তানা-পরা আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আই উইল বিলিভ এনিথিং য়ু সে।'

ভালোবাসা এমনই জিনিস, আজগুবি রূপকথাও বিশ্বাস করতে মন চায়।

রাস্তার একটা বাঁক পেরিয়ে ঝোপজঙ্গল ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করালাম। মৌমিতা তাতে অবাক হল না। কারণ, আগেও এরকম ফাঁকা স্পটে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়েছি। এবং মৌমিতা আর আমি গাড়ির মধ্যে খুশিমতন হুটোপাটি করেছি। ইংরেজিতে একেই বোধহয় 'হেভি পেটিং' বলে। আজও গল্পটা বলা হয়ে গেলে ওসবে মন দেওয়া যাবে।

গাড়ির চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। জানলার কাচ বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। ওয়াইপার দুটো প্রাণপণে উইন্ডশিল্ডের জল সরাচ্ছিল। ওদের চলার তালে-তালে মোটরের মিহি শব্দ হচ্ছিল।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই মেঘের ডাক শোনা গেল।

আমি গল্পটা বলতে শুরু করলাম।

মৌ তোমাকে কখনও বলা হয়নি...মানে, আমার বাবা দেড় বছর আগে

মারা গেছেন...মানে, খুন হয়েছিলেন। সেইসময় কলকাতায় একটা জঘন্য সিরিয়াল কিলিং চলছিল। একের পর এক খুন করে চলেছিল লোকটা। প্রথমে খুন করেছিল একটা এগারো বছরের বাচ্চা মেয়েকে। না—শুধুই খুন করেছিল—অন্য কিছু করেনি। মেয়েটাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছিল। খুনের পর মেয়েটার যা চেহারা হয়েছিল...মানে, কাগজে যেসব ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল...সেসব দেখলে তুমি শিউরে উঠতে। মেয়েটার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। ঠোঁটের কোণে ফেনা ছিল। আর জিভটা মরা ছাগলের জিভের মতো বাইরে বেরিয়ে ঝুলছিল।

মেয়েটার মারা যাওয়ার আগের ছবি আর পরের ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল কাগজে। দেখে মনে হচ্ছিল, দেবশিশু আর পিশাচ। খুনির হাত ওকে এমনই বদলে দিয়েছিল।

কাগজে দিনের পর দিন এই খুনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তাতেই পড়েছিলাম, খুনি এত জোরে মেয়েটার গলা টিপে ধরেছিল যে, থাইরয়েড বোন আর কার্টিলেজ বোন ভেঙে গিয়েছিল। এই যে...গলায়...এখানে। কণ্ঠমণি...মানে, ইংরেজিতে অ্যাডাম্‌স অ্যাপ্‌ল যাকে বলে। না, না, তোমার শিউরে ওঠার কোনও কারণ নেই। বললাম যে, ব্যাপারটা তিনবছরেরও বেশি পুরোনো।

মেয়েটার নখের ভেতরে আঁশমতন কিছু পাওয়া গিয়েছিল। ফোরেনসিক পরীক্ষায় জানা গেল, সেগুলো পুরোনো শুকনো কোনও চামড়ার আঁশ। অর্থাৎ, খুনি চামড়ার দস্তানা ব্যবহার করেছিল। নাঃ, কোনওরকম আঙুলের ছাপ-টাপ পাওয়া যায়নি। পুলিশ ফুল এন্‌থু নিয়ে ইনভেস্টিগেট করেও কিস্যু করতে পারল না। মেয়েটার খুনি ধরা পড়ল না।

দ্বিতীয় খুনটা হওয়ার পর পুলিশ নড়েচড়ে বসল।

এবারে খুন হল একজন মাঝবয়েসি পুরুষ। খুনের স্টাইল একই। মার্ডার বাই স্ট্র্যাংগুলেশান। এবারেও ভিকটিমের নখের নীচে চামড়ার ফাইবার পাওয়া গেল। অর্থাৎ, সেই দস্তানা। প্রথমবারে যেমন খুনের মোটিভের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, এবারেও তাই। সব মিলিয়ে পুলিশ বেকুব বনে গেল। খুনি রয়ে গেল সবার চোখের আড়ালে।

তিননম্বর খুনটা হওয়ার পর পুলিশ বুঝতে পারল ব্যাপারটা সিরিয়াল কিলিং। মিডিয়া খুনির নাম দিল 'দস্তানা-খুনি'। ইংরেজি চ্যানেল আর খবরের কাগজ নাম দিল 'গ্লাভ কিলার'। সারা শহর জুড়ে খুনির খোঁজ চলতে লাগল। সবাই জোট বেঁধে দস্তানা পরা লোক খুঁজে বেড়াতে লাগল। বুঝতেই পারছ, কলকাতা শহরে চামড়ার দস্তানা আর কোন কাজে লাগে! তাই দস্তানা

পরা লোক খোঁজার কাজটা বেশ সহজ। কিন্তু সেরকম কাউকেই পাওয়া গেল না।

এদিকে খুনের ব্যাপারটা চলতেই লাগল। তিননম্বরের পর চারনম্বর, চারনম্বরের পর পাঁচনম্বর, তারপর ছ'নম্বর। আর ছ'নম্বরের পর...সাতনম্বর আমার বাবা।

বাবা খুন হওয়ার পরই সিরিয়াল কিলিং-এর ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। খুনি যেন হঠাৎই চলে যায় বনবাসে। কেউ-কেউ বলল, সাতটা খুন করাটাই লোকটার টার্গেট ছিল। আবার কেউ-বা বলল, ভয় পেয়ে খুনি গা-ঢাকা দিয়েছে। কারণ, গোটা শহরের লোক সাবধান হয়ে গেছে। তা ছাড়া সবাই এমন হন্যে হয়ে দিন-রাত দস্তানা পরা লোকের খোঁজ করছে যে, নতুন খুনের ভিকটিম খুঁজে পাওয়াই মুশকিল—তাকে খুন করা তো অনেক পরের ব্যাপার।

বাবা খুন হওয়ার পর আমি অনাথ হয়ে গেলাম, কিন্তু সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কারণ, সাইকোপ্যাথ খুনির সিরিয়াল কিলিং বন্ধ হয়ে গেল।

এতে সমস্যা মিটলেও নতুন কিছু প্রশ্ন উঠে এল পুলিশের সামনে। আমার বাবা খুন হয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। মানে, এলাকার বাউন্ডারি ওয়ালের কাছাকাছি ঝোপের মধ্যে বাবার ডেডবডিটা পড়েছিল।

শুনলে তোমার অবাক লাগবে মৌ, বাবাকে কিন্তু গলা টিপে খুন করা হয়নি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাগলের মতো কোপানো হয়েছিল বাবাকে। ছত্রখান হওয়া ডেডবডিটা পড়ে ছিল ঘাসের ওপরে। মুখটা ধারালো ফলার কোপে শতচ্ছিন্ন। হাতের আঙুলগুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে এখানে-সেখানে পড়েছিল। বাঁ-হাতটা কাঁধের কাছ থেকে প্রায় খুলে এসেছিল। সে এক বীভৎস ব্যাপার!

বাবার পকেটে পাওয়া ক্রেডিট কার্ড থেকে পুলিশ পরিচয় আর ঠিকানার খোঁজ পায়। আমি বাবাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম হাতের একটা আংটি দেখে, আর ডানহাঁটুর নীচে একটা কাটা দাগ দেখে। আইডেন্টিফাই করার পরই আমি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম।

এবারে তোমাকে প্রশ্নগুলোর কথা বলি।

প্রথমত বাবাকে গলা টিপে খুন করা হয়নি। ফলে খুনের কায়দাটা সিরিয়াল কিলারের স্টাইলের সঙ্গে মিলছে না। কেন খুনি হঠাৎ স্টাইল বদলাতে গেল?

দ্বিতীয়ত, মার্ডার স্পটে একটা কালো চামড়ার দস্তানা পাওয়া যায়। রক্তমাখা দস্তানা—ছুরির কোপে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। দস্তানার রক্তের সঙ্গে বাবার

রক্ত মিলে গিয়েছিল। এই দস্তানাটি কি খুনির দস্তানা হতে পারে?

তৃতীয়ত, খুনের ধরনটা এমনই যে, পুলিশের মনে হয়েছে, খুনটা প্রতিহিংসা বা আক্রোশ থেকে করা হয়েছে। প্রচণ্ড আক্রোশ না থাকলে কেউ এভাবে খুন করে না। তা হলে সিরিয়াল কিলার হঠাৎ এই আক্রোশ দেখাল কেন?

পুলিশ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছিল। কিন্তু তাতে একটিমাত্র বাধা ছিল। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ কী সেই সিদ্ধান্ত, আর কী সেই বাধা?

যাকগে, আমিই বলছি।

পুলিশের সেই সিদ্ধান্ত হল: আমার বাবা-ই সেই সিরিয়াল কিলার। খুন হওয়া কোনও ভিকটিমের রিলেটিভ বা বন্ধুবান্ধব প্রতিহিংসায় আক্রোশে বাবাকে ওরকম বীভৎসভাবে খুন করেছে।

আর এই সিদ্ধান্তের পথে বাধা হল, খুঁজে-না-পাওয়া বাঁ-হাতের দস্তানা।

দস্তানাটা পুলিশ কেন খুঁজে পায়নি জানো? ওটা আমি নিয়ে এসেছিলাম।

প্রথমদিন অন্ধকারে পুলিশ ভালো করে জায়গাটা সার্চ করতে পারেনি। হয়তো বাবার সঙ্গে খুনি বা খুনিদের ধস্তাধস্তির সময় দস্তানাটা দূরে কোনও ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তাই ওরা সেটা দেখতে পায়নি।

খুনের পরদিন দুপুরে গোয়েন্দারা লোকজন নিয়ে এসে জায়গাটা তন্নতন্ন করে সার্চ করে। কিন্তু ওটার খোঁজ পায়নি। কারণ, সেদিন ভোরবেলা পাহারাদার কনস্টেবলদের চোখে ধুলো দিয়ে দস্তানাটা আমি খুঁজে বের করি। ঘন ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ওটা লুকিয়ে ছিল। ওটার গায়ে কোনও ছুরির কোপ ছিল না। শুধু দু-একজায়গায় শুকনো রক্ত লেগে ছিল।

দস্তানাটা বাড়ি নিয়ে এসে আমি লুকিয়ে রাখলাম। বাবার শোক ভুলতে আমার কয়েক মাস লেগে গিয়েছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, পুলিশের সন্দেহ ঠিক। আমার বাবা-ই সেই সিরিয়াল কিলার।

না, না—মৌ, তোমার আপসেট হওয়ার কিছু নেই। আসলে অল ট্রুথ ৬০ ট্রুথ। সিরিয়াল কিলার লোকটা যে আমার বাবা এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বহু সিরিয়াল কিলারই ফ্যামিলি ম্যান ছিল। মানে, ওরা কারও-না-কারও বাবা ছিল।

এবারে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আরও একটু বলি। আমার মা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন। তাই মা-কে আমার ভালো করে মনে নেই। কিন্তু মায়ের সম্পর্কে বাবা খুব বাজে-বাজে কথা বলতেন। প্রথম-প্রথম আমার খারাপ লাগত। কিন্তু পরে একই ধরনের কথা রোজ-রোজ শুনতে-শুনতে ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে এসেছিল। কে জানে, হয়তো বাবার অভিযোগগুলো বিশ্বাস করতেও শুরু করেছিলাম।

বাড়িতে মায়ের কোনও ফটো ছিল না। বাবা রাখেননি। তাই আমি আজও জানি না, আমার মা-কে কেমন দেখতে ছিল। এই শূন্যতা নিয়ে আমি বড় হয়েছি, মৌ।

আমার বাবা এমনিতে শান্ত মানুষ হলেও হঠাৎ-হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠতেন। ঘরের জিনিসপত্র পাগলের মতো ভাঙচুর করতেন। আমার মরা মা-কে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নোংরা গালিগালাজ করতেন।

বাবার একটা ব্রিফকেস ছিল। ব্রিফকেসটা খুলে আমি কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছিলাম। মেয়েদের মাথার ক্লিপ, ছেলেদের দুটো রিস্টওয়াচ, তিনটে আংটি, একটা চামড়ার বেল্ট, আর দুটো নাইলনের প্যান্টি।

জিনিসগুলো দেখে আমার মনে হল, ওগুলো ভিকটিমদের গা থেকে বাবা খুলে নিয়েছেন। মানে, জিনিসগুলো মার্ডার সুভেনির।

সিরিয়াল কিলিং-এর ব্যাপারটা অনেক নিউজপেপারেই বেশ বড় করে দিনের পর দিন বেরিয়েছিল। বাবার ওই ব্রিফকেসে তার কাটিংগুলো আমি পেয়েছিলাম। সেগুলো বারবার করে খুঁটিয়ে পড়ে ভিকটিমদের হারানো কয়েকটা জিনিসের কথা জানতে পারলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, হারানো জিনিসগুলো বাবার ব্রিফকেসেই রয়েছে। সুতরাং, সন্দেহের আর কোনও জায়গা রইল না।

এবারে তোমাকে দস্তানাটার কথা বলি।

মাস আস্টেক আগের কথা। তুমি তো জানো, আমি মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করি। একদিন রাতে বাড়িতে একা-একা বসে হুইস্কি খাচ্ছিলাম আর বাবার কথা ভাবছিলাম। ঘরে নাইটল্যাম্পের আবছা নীল আলো। সিডি প্লেয়ারে হালকা মিউজিক বাজছে। নেশা বেশ জমে উঠেছে।

সামনের টেবিলে বোতল আর গ্লাসের পাশে পড়ে ছিল বাবার দস্তানাটা। আমি ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এর ভেতরে একটা খুনি হাত বাস করত। আর সেই হাতটা আমার বাবার হাত।

গ্লাভটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে হঠাৎ কী-খেয়াল হল, আমি ওটা বাঁ-হাতে পরে ফেললাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কী যে হল, তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার বাঁ-হাতের আঙুলের ডগাগুলোয় যেন হাই ভোল্টেজের শক খেলাম। বাঁ-হাতের প্রতিটি শিরা চিনচিন করতে লাগল। অসহ্য জ্বালায় আমি ছটফট করতে লাগলাম। ছটফট করতে-করতে বেসামাল হয়ে ছিটকে পড়ে গেলাম চেয়ার থেকে। আমার পায়ের লাথিতে টেবিলটা উলটে গেল। তার সঙ্গে-সঙ্গে গ্লাস আর বোতলও।

হাতের অসহ্য জ্বালাটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। আমি মরিয়া হয়ে

দস্তানাটা টেনে খোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! ওটা কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না। ওটা সিমেন্টের ঢালাইয়ের মতো আমার হাতে একেবারে সেঁটে গেছে!

মেঝেতে পড়ে আমি হিস্টিরিয়ার রুগির মতো হাত-পা ছুড়ছিলাম আর গ্লাভটা খোলার চেষ্টা করছিলাম—কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। হাতের জ্বালা-পোড়াটা এত বাড়তে লাগল যে, একসময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, টের পেলাম, জ্বালাটা আর নেই। নেশাও পুরোপুরি কেটে গেছে।

কোনওরকমে উঠে ঘরের টিউবলাইট জ্বেলে দিলাম। তারপর তাকালাম আমার বাঁ-হাতের দিকে।

কবজি থেকে আমার হাতের পাঞ্জা, আঙুল সব কালো চামড়ায় ঢাকা। এমনকী হাতের তালুর রং-ও কালো হয়ে গেছে। তবে দস্তানাটাকে আর দস্তানা বলে চেনা যাচ্ছে না। ওটা যেন আমার হাতেরই চামড়া হয়ে গেছে। কারণ, কালো চামড়ার তালুতে হাতের রেখাগুলো আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। নখগুলোর আকার বোঝা গেলেও সেগুলোর রং আর চরিত্র বদলে গেছে।

কী আশ্চর্যভাবেই না আমি একটা 'কালো' হাতের মালিক হয়ে গেলাম!

হতভম্ব হয়ে হাতটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎই শুনলাম একটা কর্কশ স্বর: 'এইবার তুই উপযুক্ত হয়েছিস, সোনু। আমার অসম্পূর্ণ কাজ তুই শেষ করবি। যারা ঘোর পাপী, দুশ্চরিত্র, ব্যাভিচারী, তাদের সবাইকে তুই শাস্তি দিবি। আমার সব শক্তি আমি তোকে দিলাম। নে...।'

আবার একপ্রস্থ জ্বালা-যন্ত্রণা, ছটফটানি, চিনচিনে ব্যথা।

তারপর, কিছুটা সময় কেটে যেতেই, আমি চেতনা ফিরে পেলাম। টের পেলাম, অদ্ভুত এক আনন্দ আর তৃপ্তিতে আমার মনটা টগবগ করছে।

তবে সমস্যা একটা হল। আমার এই কালো রঙের বাঁ-হাতটা দেখে কৌতূহলী লোকজন স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত করে মারবে। কিন্তু সবাইকে তো আর এ-গল্প বলা যায় না। তাই আমি সবসময় বাঁ-হাতে সাদা দস্তানা পরে থাকি। লোকে আমাকে হয়তো রেস্তরাঁর বয়-বেয়ারা ভাবে। তা ভাবুক! অন্তত পাগল-করা কৌতূহলের হাত থেকে তো আমি রেহাই পাব। কী বলো?



আমার গল্প শেষ হতেই মৌমিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'সোনু, তুমি ফ্যানট্যাস্টিক! তোমার জবাব নেই। এই অন্ধকার...এই অল্প-

অল্প আলো...এই বৃষ্টি...মাঝে-মাঝে মেঘের গর্জন...বিদ্যুতের ঝলকানি—এর চেয়ে আইডিয়াল পরিবেশ আর কী হতে পারে, সোনু? তোমার দস্তানার গল্পটা বানিয়েছ দারুণ। এবারে প্লিজ, রিয়েল স্টোরিটা বলো—।'

কথা বলতে-বলতে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল মৌ। আমার গায়ে হাতও রেখেছিল। আর একইসঙ্গে ওর মিষ্টি গলায় খিলখিল করে হাসছিল।

আমি বারবার ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম...বলতে চাইলাম যে, আমি যা বলেছি সেটাই আসল ঘটনা—কিন্তু কে শোনে কার কথা!

বৃষ্টি কিছুটা কমে এলেও মেঘের ডাকাডাকি চলছিল। আমি উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকালাম।

আর ঠিক তখনই মৌ একটানে আমার হাত থেকে সাদা দস্তানাটা খুলে নিয়েছে।

আমি চমকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখের রং সাদাটে হয়ে গেছে। ও গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার কালো রঙের বাঁ-হাতটার দিকে, কালো রঙের পাঁচটা আঙুলের দিকে।

আমি নীচু গলায় বললাম, 'মৌ, প্রথম মেয়েটাও তোমারই মতন ছিল। ওর নাম ছিল জিনিয়া। সুন্দরী, ছটফটে, চঞ্চল, মুখে সবসময় খই ফুটছে। তার সঙ্গে উগ্র পোশাক। চটকদার মেকাপ। জিনিয়াও আমার গল্পটা বিশ্বাস করতে চায়নি। তখন বাবা ওকে শাস্তি দিতে বলল...।'

মৌমিতা আর কোনও বলতে পারছিল না—শুধু আমার কালো হাতটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

এমন সময় আমার কালো হাতের আঙুলগুলো মাকড়সার পায়ের মতো নড়ে উঠল। আর কর্কশ গলায় হাতটা বলে উঠল, 'সোনু, আর দেরি করা ঠিক হবে না। তোর গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। নে, চটপট কাজ সেরে নে...।'

পিতাশ্রীর আদেশ অমান্য করি কেমন করে!

আমার বাঁ-হাতের আঙুলগুলো যখন সাঁড়াশি হয়ে মৌমিতার গলায় চেপে বসল, তখনও ও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। ব্যাপারটা কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারছে না।

জিনিয়াও বিশ্বাস করতে পারেনি। মৌমিতাও পারল না।

আর পরের মেয়েটাও পারবে না।

# অন্ধকার রঙের কুকুর

বহু বছর আগের ঘটনা হলেও সেই সন্ধেটার কথা আমি ভুলিনি। আমার সামনে ছিল আঁকাবাঁকা শীর্ণ নদী। নদীর ওপারে জঙ্গলের গাছপালা। ঝাঁকড়া গাছের পাতার ফাঁকে আগুন রঙের সূর্য ঢলে যাচ্ছিল। আর শীতের ঘোলাটে সন্ধ্যা চুপিচুপি সূর্যকে চাদর মুড়ি দিতে আসছিল।

ঠিক সেই সময়েই আমি শিসের শব্দগুলো শুনতে পেয়েছিলাম। জঙ্গলের দিক থেকে ছুটে আসা তীক্ষ্ণ শব্দগুলো আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিল ওরা ছুটে আসছে।

তারপরই যা হয়েছিল সে-কথা মনে পড়লেই ভয়ে আমার শরীরটা ঠান্ডা বরফ হয়ে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায় সেই মুহূর্তেই।

কী করব এখন!

এত বছর পর যখন ছোটবেলার ওই ঘটনাটার কথা ভাবি তখনও যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। সেই সন্ধের দৃশ্যটা জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখের সামনে। হিংস্র পশুগুলোর গায়ের বুনো গন্ধ নাকে স্পষ্ট টের পাই।

তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। বয়েস কতই বা হবে! বারো আর তেরোর মাঝামাঝি। শীতের ছুটিতে বড়কদমগাছি বেড়াতে গিয়েছিলাম—আমার বড়মাসির কাছে।

বড়কদমগাছি জায়গাটা রানাঘাট থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে। সেখানে একটা স্কুলে আমার বড়মাসি বাংলার টিচার ছিলেন। আর বড়মেসো জমিজিরেত মাপজোখের কী একটা চাকরি করতেন যেন।

ক্লাস সিক্স থেকেই ডিসেম্বরের শেষে বড়কদমগাছি বেড়াতে যাওয়াটা নিয়মমাফিক শুরু হয়েছিল। বাপি আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতেন বড়মাসি আর মেসোর কাছে। বলতেন, 'শুধুই কি আর খেলাধুলোয় মেতে থাকবি? এই ক'দিনের ছুটিতে তোর মাসির কাছে বাংলাটাও একটু জোরদার করে নে—।'

তো বাংলা জোরদার কতটা করতাম কে জানে! তবে খেলাধুলোর ব্যাপারটায় মোটেও ফাঁকি দিতাম না। আর সেইসঙ্গে মাছ ধরা।

খেলাধুলোয় আমার সঙ্গী ছিল রাহুল আর পিংকি। বড়মাসির ছেলে আর মেয়ে।

রাহুল আমার চেয়ে মাসছয়েকের ছোট। আমরা তিনজনে মিলে কী

হুড়োহুড়িই না করতাম! আর মাছ ধরার নেশায় আমার মাস্টারমশাই ছিলেন বড়মেসো।

বড়কদমগাছি জায়গাটা গ্রাম হলে কী হবে, ছবির মতো সুন্দর। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। টালির চাল আর টিনের চালের মাটির বাড়িগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে এখানে-ওখানে কতরকমের ছোট-বড় গাছ।

আমরা তিনজনে ঘোর দুপুরে সেইসব গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলতাম, গাছের পেয়ারা, কুল, জামরুল পেড়ে ইচ্ছেমতো খেতাম। আর বিকেলে রাহুলের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দল বেঁধে ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠতাম।

সবমিলিয়ে দিনগুলো ছিল দারুণ।

বড়কদমগাছিতে একটিমাত্র নদী ছিল। নাম বউনি। বহুকাল আগে গ্রামের এক নতুন বউ বিয়ের সাজগোজসমেত ওই নদীতে ডুবে মারা যায়। তারপর থেকেই ওই নাম—বউনি। লোকজনের কাছেই শুনেছি, এই সরু নদীটা নাকি চুর্ণি নদীতে গিয়ে মিশেছে।

বউনি নদীর এপারে আছে শ্মশান। আর ওপারটায় ঘন জঙ্গল। তাই খুব একটা কেউ নদীর দিকে যায় না। আর যদি বা যায়, তা হলে সন্ধের আগেই ফিরে আসে।

বড়মেসোর ভীষণ মাছ ধরার শখ। ছুটির দিন হলেই মেসো টোপ-বঁড়শি নিয়ে বউনির পাড়ে গিয়ে হাজির। কাপড়ের সাদা টুপি মাথায় দিয়ে নদীর পাড়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর দিনের শেষে ছ'ইঞ্চি কি আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একপিস মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

কিন্তু তাতেই দেখেছি মেসোর কী আনন্দ! বঁড়শিতে ধরা মাছ নিয়ে হেঁড়ে গলায় গান গাইতে-গাইতে বাড়ি ফেরেন। তারপর সেই মাছ কী-কী পদ্ধতিতে রান্না করতে হবে তা নিয়ে বড়মাসিকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তখন মাসি আর মেসোয় তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। আর আমি, রাহুল, পিংকি সেই মজার 'আলোচনা'-র নীরব দর্শক।

মেসোর কাছেই শুনেছি ছিপের ইংরেজি 'অ্যাংগল', আর যারা ছিপ দিয়ে মাছ ধরে তাদের বলে 'অ্যাংলার'।

মেসো আমাকে সবসময় বলতেন, 'বুঝলি, মাছ ধরায় যে কী আনন্দ সেটা নিজে হাতে মাছ না ধরলে কখনও বুঝবি না। এ একটা দারুণ পজিটিভ নেশা। এতে কনসেনট্রেশান বৃদ্ধি পায়।'

সে যাই হোক, মেসোর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি একদিন মেসোর সঙ্গে চলে গেলাম বউনি নদীর তীরে। জায়গাটা স্বপ্নের মতো, তবুও কেন

যেন গা-ছমছম করে।

বিশাল কয়েকটা চাষের খেত পেরিয়ে তারপর নদীটার দেখা মেলে। নদীর আঁকাবাঁকা পার ধরে আমি আর মেসো হেঁটে চললাম। এবড়োখেবড়ো জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। শীতের সময় নদীর জল কমে এসেছে। সূর্যের আলোয় বয়ে যাওয়া জলের স্রোত চিকচিক করছে। তারই মধ্যে কয়েক জায়গায় মাছ বুড়বুড়ি কাটছে বলে মনে হল।

নদীর ওপাশে বেশ ঘন জঙ্গল। সেখানে গাঁয়ের কেউ-কেউ কাঠ কাটতে যায়। মেসো বললেন, ওই জঙ্গলে শেয়াল, ভাম, বুনো কুকুর আর ছোটখাটো জন্তুজানোয়ার আছে। ওরা সন্ধের পর বউনি নদীতে জল খেতে আসে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিশাল বটগাছের নীচে আমরা মাছ ধরতে বসলাম। মেসো আমাকে ছিপ, বঁড়শি আর টোপের ব্যাপারে নানান কথা বোঝাচ্ছিলেন। কীভাবে কেঁচোগুলো বঁড়শিতে গাঁথতে হয়, ময়ূরের লেজের পালকের সাদা 'কাঠি'টা দিয়ে কীভাবে ফাতনা তৈরি করতে হয়, কীভাবে ছিপ বাগিয়ে জলে ভেসে থাকা ফাতনার দিকে নজর রাখতে হয়—এইসব।

আমি হাঁ করে মেসোর কথা গিলছিলাম আর ফাতনার দিকে নজর রাখছিলাম।

হঠাৎই কানে এল 'বলো হরি, হরিবোল' ধ্বনি। মুখ ফিরিয়ে দেখি একদল লোক ওপরের মেঠো পথ ধরে খাটিয়া বয়ে নিয়ে আসছে। আমাদের কাছ দিয়ে ওরা চলে গেল।

মেসো কপালে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'ওইদিকে আরও খানিকটা এগিয়ে তারপর শ্মশান—' আঙুল তুলে সেদিকটা দেখালেন : 'ওই দিকটায় লোকজন কম যায়...।'

এরই মধ্যে কখন যেন ফাতনা নড়ে উঠেছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে 'অ্যাংলার' মেসো ছিপ ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছে।

তখন আমার আনন্দ আর দ্যাখে কে!

কারণ, মেসোর বঁড়শিতে তখন ছটফট করছে ফুটখানেক লম্বা একটা আস্ত রুইমাছ।

সেই মাছটাকে ঘিরে আমার কী উত্তেজনা! বেশ বুঝতে পারছিলাম, নিজের হাতে মাছ 'শিকার' করে বাড়ি ফেরার সময় মেসো কেন আনন্দে টগবগ করে ফুটতে থাকেন, কেন চেঁচিয়ে হেঁড়ে গলায় গান করেন।

এমনসময় জঙ্গলের মধ্যে থেকে হিংস্র গর্জন ভেসে এল।

ছটফট করা মাছটা তখন মেসো নাইলনের থলেতে ঢোকাচ্ছিলেন। থলের

মুখটা চেপে ধরে মুখ তুলে নদীর ওপারে নজর দিলেন।

আমিও গর্জনের ব্যাপারটা বোঝার জন্যে জঙ্গলের ওপরে চোখ বোলাতে লাগলাম।

হঠাৎই একপাল কুকুর বেরিয়ে এল গাছপালার আড়াল থেকে। গুনে দেখলাম পাঁচটা। ওরা একটা কুকুরকে তাড়া করে ঘিরে ফেলেছে। কুকুরটার রং হালকা বাদামি আর সাদা। তার ওপরে ছোপগুলো যে রক্তের দাগ সেটা নদীর এপার থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

আমি মেসোকে বললাম, 'ওই কুকুরটা নিশ্চয়ই অন্য এলাকার—তাই ওই কুকুরগুলো ওকে অ্যাটাক করেছে।'

বড়মেসো ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই ভয়ের গলায় বললেন, 'কুকুর নয় রে, বুনো কুকুর। এখানকার মানুষরা ঢোল বলে। দেখছিস না, সবক'টা একইরকম দেখতে—।'

সত্যিই তাই। পাঁচটা বুনো কুকুরই একইরকম দেখতে। গায়ের রং গাঢ় বাদামি। মুখটা ছুঁচলো। লেজটা সাধারণ কুকুরের চেয়ে বেশ মোটাসোটা। আর লেজের ডগায় কালো ছোপ।

এরপর চোখের সামনে যা হল তা দেখা যায় না।

নদীর পাড়ে পাঁচটা কুকুর বাদামি-সাদা কুকুরটাকে ঘিরে ফেলল। তারপর নানান দিক থেকে বেচারা কুকুরটাকে হিংস্র আক্রমণ করতে লাগল। একবার ছুটে গিয়ে এ কামড়ায় তো পরমুহূর্তেই ছুটে গিয়ে আর-একজন কামড় দেয়। একটা তো এক কামড়ে এক চাকা মাংস খুবলে নিল।

আমার চক্রব্যূহে অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে গেল।

বুনো কুকুরগুলোর ধারালো দাঁতের পাটি দেখা যাচ্ছে। শিকারের দিকে প্রখর চোখে তাকিয়ে ওরা অদ্ভুত স্বরে গর্জন করছে।

ওদের ফাঁদে পড়া কুকুরটা তখন মরিয়া। সে-ও হিংস্র গর্জন করে পালটা কামড় দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এরকম অসম লড়াই বেশিক্ষণ চলার কথা নয়—তাই চললও না। কামড়ে-কামড়ে বাদামি-সাদা কুকুরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। বুনো কুকুরগুলোর আক্রমণের বৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগল। তারপর একসময় পাঁচটা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপরে। ওদের শরীরে কোণঠাসা কুকুরটার শরীর ঢাকা পড়ে গেল। শুধু শোনা যেতে লাগল ওর মরণ আর্তনাদ।

ততক্ষণে পাঁচটা বুনো কুকুর ওদের হিংস্র মহাভোজ শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎই খেয়াল করে দেখি বড়মেসোর চোখে জল। মাছ ধরার সরঞ্জাম

গুছিয়ে নিয়ে তিনি বললে, 'শিগগির চল, ফিরে যাই। ওই কুকুরগুলো নদী পার হয়ে এপাশে এলেই বিপদ।'

'ওরা নদী পার হয়ে চলে আসে?' আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ, আসে। একে তো সরু নদী—তার ওপর শীতকাল। কতটুকুই বা জল থাকে! তা ছাড়া ওরা সাঁতারে ওস্তাদ। নদী পার হয়ে ওরা শ্মশানের বেওয়ারিশ মড়া খেতে যায়। তবে সাধারণত রাতে যায়—খুব খিদে না পেলে ওরা দিনের বেলা এপারে আসে না।'

আমরা নদীর পাড় ধরে ফিরে যাচ্ছিলাম। তবে আমি বারবার পেছন ফিরে বুনো কুকুরগুলোকে দেখছিলাম। ওরা তখন খিদে মেটাতে ব্যস্ত। একটা বুনো কুকুরকে দেখলাম জল খেতে নদীর কিনারায় নেমে এসেছে। ওর গায়ে এখানে-ওখানে রক্ত লেগে রয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর যখন আমরা একটা ধানখেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন আমি আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, 'মেসো, তুমি তখন কাঁদছিলে কেন?'

মেসো চোখের কোণ মুছে হেসে বললেন, 'কাঁদছিলাম? আমি? দূর!'

আমি মেসোর হাতে আবদারের ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ কাঁদছিলে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বলো—তোমাকে বলতেই হবে—।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মেসো নীচু গলায় বললেন, 'আসলে বিলটুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।'

'বিলটু? কে বিলটু?'

'আমার পোষা কুকুর। ও কুকুর নয় রে—আগের জন্মে আমার কেউ ছিল। ও আমাকে এত ভালোবাসত...।' মেসোর চোখের কোণ জলে ভরে গেল আবার।

সবুজ ধানখেতের ওপারে সূর্য ঢলে পড়েছে। টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে গেল ঘোলাটে আকাশে। একটু আগেই যে-দৃশ্যটা মন ভরিয়ে দিচ্ছিল এখন সেটাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। সূর্যের লাল রংটা ওই হতভাগ্য কুকুরটার কথা মনে পড়িয়ে দিল।

চোখ মুছে নিয়ে বড়মেসো আবার বলতে শুরু করলেন।

'শোন, বিলটুর কথা পিংকি আর রাহুলও জানে না। ওদের কখনও বলিনি। তা ছাড়া এসব ওদের জন্মের আগের ব্যাপার তখন তোর বড়মাসি সবে স্কুলের চাকরিতে ঢুকেছে।

'বিলটুকে আমি নিয়ে এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। তখন

ও এই এত্তটুকুন ছিল। কী সুন্দর দেখতে ছিল, জানিস? আর কী সাহস! ক্রস ব্রিডের কুকুরছানা। ভেলভেটের মতো লোম। ছাইরঙের ওপরে এলোমেলো ছোট-ছোট সাদা ছোপ। ওর কথা বলতে গেলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। মানে...।'

'থাক, তোমাকে তা হলে বলতে হবে না!'

বড়মেসো জেদের গলায় বললেন, 'না, বলব। তোকে বললে আমার ভেতরটা অনেক হালকা হবে। তা ছাড়া তুই তো নিজের চোখে ঢোলগুলোর কাণ্ড দেখলি। কীরকম নিষ্ঠুরভাবে ওই গোবেচারা কুকুরটাকে শেষ করে দিল। বিলটুকেও ওরা ঠিক এইভাবে খতম করে দিয়েছিল—তবে বিলটু এই কুকুরটার মতো ভিতু ছিল না। ও দলটার সঙ্গে বীরের মতো লড়াই করেছিল। কিন্তু...কিন্তু...শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি।' কথা বলতে-বলতে মেসোর গলা ধরে এল। একটু সামলে নিয়ে মেসো বললেন, 'ওর জন্যে আমি আর তোর বড়মাসি কত যে চোখের জল ফেলেছি...।'

আমরা বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। মেসো চোখ মুছে জোর করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'নাঃ, এখন আর না। আজ রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিলটুর ব্যাপারটা তোকে বলব। শুধু তোকে কেন, একইসঙ্গে পিংকি আর রাহুলকেও শোনাব। আমার যত কষ্ট হয় হোক। বিলটুর সাহসের গল্প ওদেরও শোনা দরকার।'

এরপর বড়মেসো অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। এগারো ইঞ্চি লম্বা রুইমাছটা কী-কী মশলাপাতি সহযোগে রান্না হবে তাই নিয়ে বড়মাসির সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দিলেন। পিংকি আর রাহুলকে আমি বললাম যে, আজ রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মেসো একটা সত্যি ঘটনা শোনাবেন।

ওরা হেসে আমার কথা উড়িয়ে দিল। বলল, ওদের বাপিকে ওরা ভালো করে চেনে। ওদের বাপি কখনও ওদের সত্যি ঘটনা কিংবা মিথ্যে ঘটনা—কিছুই নাকি শোনাননি।

কিন্তু সে-রাতে বড়মেসো বিলটুর গল্প আমাদের তিনজনকে শোনালেন।



মাছ ধরা আমার ছোটবেলাকার নেশা। বউনি নদীতে আমি মাছ ধরি প্রায় বিশ বছর ধরে। ছিপ, বঁড়শি, টোপ নিয়ে ওই নদীর পাড়ে ধৈর্য ধরে বসাটা আমার বরাবরের অভ্যেস। বিলটুও ধীরে-ধীরে এই অভ্যাসটা রপ্ত করে নিয়েছিল। ও আমার সঙ্গে বলতে গেলে পায়ে-পায়ে ছুটত। তারপর নদীর পাড়ে গিয়ে যখন আমি ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে চুপটি করে

বসে থাকতাম তখন ও এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করত। কোনও একটা মাছ ধরে ডাঙায় তুললেই ওর সে কী উত্তেজনা আর লাফালাফি! যেন মাছটা আমি নয়—ও-ই ধরেছে।

এইভাবে বছরখানেকের বেশি কেটে গেল। বিলটু চেহারায় বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। ওকে দেখে নেড়িকুকুররা বেশ সমীহ করে—আর লোকজন বেশ ভয়-টয় পায়।

আমাদের গ্রামে একবার চুরির হিড়িক শুরু হয়েছিল। তখন মাঝরাতে বিলটু হঠাৎই এক চোর ধরে ফেলল। তার পায়ে আর ঊরুতে ও এমন বাঘা কামড় বসাল যে, একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সে-কথা চাউর হতেই গ্রামে চুরি-টুরি সব বন্ধ।

একদিন সকালে বউনি নদীর তীরে ছিপ ফেলে বসে আছি, হঠাৎই ফাতনা নড়ে উঠল। দেখেশুনে মনে হল, বেশ বড় সাইজের মাছ টোপ গিলেছে। তো আমি সেদিকে মনোযোগ দিয়ে ছিপটাকে খেলাচ্ছি, হঠাৎই কানে এল অদ্ভুত শিসের শব্দ। তারপরই কয়েকটা চাপা গর্জন।

ছিপটা বাগিয়ে ধরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি কয়েকটা বুনো কুকুর ওপারে দাঁড়িয়ে। বিলটুকে লক্ষ করে ওরা চাপা গোঙানির শব্দ করছে।

আমি বিলটুকে সাবধান করার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। বিলটু ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঘেউঘেউ করতে লাগল। তারপর আমি কিছু করে ওঠার আগেই ভয়ংকর তেজে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে গেল ওপারে।

আমি ছিপ-বঁড়শি সব ছুড়ে দিয়ে বিলটুকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিলটু ওপারে পৌঁছে গেল। এবং শুরু হয়ে গেল দাঁত-নখের প্রচণ্ড লড়াই। বিলটু ঘুরে-ঘুরে ওঁদের আক্রমণ ঠেকাতে লাগল। শূন্যে বারবার লাফিয়ে শত্রুদের মরণকামড় বসাতে লাগল। কুকুরের লোম উড়তে লাগল শূন্যে।

আমি অসহায়ের মতো এপারে দাঁড়িয়ে বারবার বিলটুর নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আর কিছুক্ষণ লড়াই চললেই বিলটুকে ওরা শেষ করে দেবে।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বিলটু শেষ পর্যন্ত জিতে গেল। বুনো কুকুরগুলো হঠাৎই রণে ভঙ্গ দিল। বিলটুর দুরন্ত আক্রমণের মুখে পড়ে ওরা ভয়ের চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে।

বিলটু ওপার থেকে তাকাল আমার দিকে। ওর সারা গা ক্ষতবিক্ষত। কাঁধ আর গলার কাছ থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে বুনো কুকুরের দল। শরীরের নানা জায়গায় লেপটে আছে রক্তের দাগ। ও জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, ধুঁকছে।

ওই ক্লান্ত অবস্থাতেই আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বিলটু ঘেউঘেউ করে উঠল। মনে হল, ও যেন বলছে, 'দ্যাখো প্রভু, আমি ওদের হারিয়ে দিয়েছি।'

ওর দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি আকুল হয়ে ওকে এপারে আসার জন্যে ডাকতে লাগলাম।

আমার কথা বিলটু বোধহয় বুঝতে পারল। ও নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে এল এপারে। কিন্তু তারপর আমার কাছে না এসে ও চলে গেল বউনির কিনারায় এক কাদার গর্তে। সেখানে থকথকে কাদার ওপরে শুয়ে পড়ে প্রাণভরে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

গ্রামের বয়স্ক মানুষদের মুখে বহুবার শুনেছি এই কাদার নাকি এক অদ্ভুত গুণ আছে। এই কাদা গায়ে মেখে নিলে কাটাছেঁড়া, ঘা, এসব নাকি চট করে সেরে যায়। জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে যায় বা নদীতে যেসব জেলেরা মাছ ধরে তারা কেটে-ছড়ে গেলে এই কাদা গায়ে লেপে নেয়। পোষা গরু-মোষ-ছাগলের জন্যেও তারা এই 'ওষুধ' ব্যবহার করে।

কিন্তু বিলটু কী করে এই কাদার গুণের কথা জেনেছিল তা বলতে পারব না। তবে কাদায় লুটোপুটি খেয়ে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে যখন ও খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আমারা কাছে এসে দাঁড়াল, তখন ওর অদ্ভুত চেহারা দেখে আমি আঁতকে উঠলাম।

ওর কপাল থেকে গলা পর্যন্ত এক লম্বা গভীর ক্ষতচিহ্ন। বুনো কুকুরের নখের টানে বাঁ-দিকের চোখটা কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। নাকের পাশে মাংস ফাঁক হয়ে গেছে। চোয়ালের নীচে নরম মাংস ফালা-ফালা হয়ে ঝুলছে।

আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। হাঁটুগেড়ে বসে কাদা-মাখা বিলটুকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর চিৎকার করে লোকজনকে ডাকতে লাগলাম।

বিলটু আমার বুকে মুখ লুকিয়ে 'কুঁইকুঁই' করে চাপা আওয়াজ করতে লাগল।

তারপর আমার আর ভালো করে কিছু মনে নেই। পরে জেনেছি, আমার চিৎকার শুনে দু-চারজন চাষি ছুটে এসেছিল। ওরাই আমাকে আর বিলটুকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

না, ওই কাদা বিলটুকে বাঁচাতে পারেনি। আটদিন কষ্ট পাওয়ার পর বিলটু

মারা যায়। ওর গায়ের কাটা জায়গাগুলো পেকে ঘা হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছিল।

আমি আর তোদের মা—মানে, তোর বড়মাসি—বিলটুকে ওই বউনি নদীর পাড়েই কবর দিয়ে এসেছিলাম।

তারপর থেকে বউনির তীরে মাছ ধরতে গেলে আমার মনে কষ্ট হয়। কিন্তু একইসঙ্গে মনে হয়, এই বুঝি বিলটুকে দেখতে পাব। আমার ধরা ছটফটে মাছ দেখে ও লেজ নাড়তে-নাড়তে খুশিতে ছুটোছুটি করবে। একবার মাছটার কাছে ছুটে আসবে, আর একবার দূরে ছুটে যাবে।

ওর কথা ভাবি বলেই বউনিতে মাছ ধরার অভ্যেসটা ছাড়তে পারিনি।

বড়মেসোর গল্পটা শুনেছিলাম প্রথমবারে বড়কদমগাছিতে গিয়ে। শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাহুল আর পিংকিও খুব দুঃখ পেয়েছিল গল্পটা শুনে। ওরা বড়মেসোর কাছে আবদার করল সেই জায়গাটা দেখতে যাবে—যেখানে বিলটু শেষ লড়াই করেছিল। আর একইসঙ্গে ওই কাদার গর্ত আর বিলটুর কবর দেখবে।

বড়মেসো উদাস গলায় বললেন, 'চল, কালই চল। তবে সব কী আর আগের মতন আছে রে!'

পরদিন দুপুরে আমরা তিনজনে বড়মেসোর সঙ্গী হলাম। নদীর পাড় ধরে হেঁটে-হেঁটে মেসো জায়গাগুলো আমাদের দেখাতে লাগলেন। বিলটুর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আমি কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানালাম। যদিও মনে হল, এরকম একজন 'বীর'কে সেলাম জানালেই বোধহয় বেশি মানানসই হত।

কাদার গর্তটাও দেখলাম আমরা। মেসোর কাছেই শুনলাম, জোয়ারের সময় জল জমে গিয়ে এই গর্তটায় কাদা হয়। শীতকালে সেখানে নেমে গাঁয়ের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কাদা ঘেঁটে ল্যাটা মাছ, গেঁড়ি, গুগলি, শামুক—এসব খুঁজে বেড়ায়। এখনও নজরে পড়ল তিনটে ছেলে কাদা হাতড়ে-হাতড়ে সেই কাজ চালাচ্ছে। একজনের গায়ে তো বুক পর্যন্ত কাদার ছোপ। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয়, কাদা রঙের জামা-প্যান্ট পরেছে।

মেসোর সঙ্গে বেশ ক'দিন মাছ ধরতে গিয়ে আমার মধ্যে মাছ ধরার নেশাটা চারিয়ে গেল। মাছ ধরার প্রথমদিন ওরকম একটা বীভৎস দৃশ্যের সাক্ষী হলেও বিলটুর ব্যাপারটা আমাকে কী করে যেন বউনি নদীর দিকে টেনেছিল। তা ছাড়া মেসোর বলা কথাগুলো 'দারুণ পজিটিভ নেশা', 'কনসেনট্রেশান বৃদ্ধি পায়' আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল।

অনেকসময় মেসো না গেলেও আমি রাহুল কিংবা পিংকি—অথবা দুজনকেই সঙ্গী করে ছিপ-বঁড়শি নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে বসতাম।

মাছ ধরতে বসে ফাতনার দিকে নজর থাকলেও আমার চোখ মাঝে-মাঝেই ছিটকে যেত জঙ্গলের দিকে। যদি কখনও একটা বুনো কুকুরের ছায়াও দেখি তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ছিপ-টিপ নিয়ে ছুট লাগাব বাড়ির দিকে।

পিংকিটা ছিল রামভিতু। সবসময় রাহুল কিংবা আমার জামা খামচে ধরে বসে থাকত। তবে মাছ ধরার ব্যাপারটা দেখার লোভ ও কিছুতেই ছাড়তে পারত না।

রাহুল তুলনায় বেশ সাহসী। ও আত্মরক্ষার জন্যে একটা পেয়ারা কাঠের গুলতি আর পোড়ামাটির গুলি সবসময় পকেটে রাখত। আমি ছিপ নিয়ে বসলে ও গুলতি বাগিয়ে বসত। আর কখনও যদি ও ছিপ হাতে নিত তা হলে আমাকে পাহারাদারের ভূমিকায় বসাত।

ঘটনাটা ঘটেছিল পরের শীতে—তখন আমি ক্লাস সেভেনে।

দুপুরবেলা নদীতে ছিপ ফেলে বসে আছি। আমার একপাশে পিংকি, আর একপাশে রাহুল।

হঠাৎ ওপারের জঙ্গল থেকে শিসের শব্দ ভেসে এল। আমি চমকে মুখ তুলে তাকালাম। মেসোর কাছেই শুনেছি বুনো কুকুরগুলো শিস দেওয়ার মতন করে অদ্ভুতভাবে ডাকতে পারে। কিন্তু কোনও কুকুর আমার নজরে পড়ল না। তখন আবার ফাতনার দিকে মন দিলাম।

এমনসময় সমু নামে একটা ছেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে রাহুলকে ডাকতে এল। বলল, ভীষণ দরকার। কাল সকালের ট্রেনে পরেশদা নামে একজন কলকাতা যাবে। তার হাত দিয়ে ক্লাবের ক্রিকেট ব্যাটটা কলকাতার দোকান থেকে আনানো হবে। তার চাঁদা তোলার জন্যে সুবিন আর তোতন রাহুলকে এক্ষুনি ডাকছে। ওদের সঙ্গে কথা সারতে দশ-পনেরোমিনিটের বেশি লাগবে না।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে সমুর সঙ্গে রওনা হয়ে গেল।

আমাদের সশস্ত্র পাহারাদার চলে যাওয়াতে পিংকি বেশ ভয় পেয়ে গেল। ও আমার গা ঘেঁষে বসে জামা খামচে ধরল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'কোনও ভয় নেই...।'

কিন্তু আমার কথায় ও খুব একটা ভরসা পেল বলে মনে হল না।

একটু পরেই বেশ কয়েকবার শিসের শব্দ শোনা গেল আবার। ব্যস, তাতেই হয়ে গেল। হঠাৎই পিংকি আমার পাশ থেকে উঠে একেবারে দে ছুট।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে ওকে চিৎকার করে ডাকলাম, ফিরে আসার জন্যে বারবার বললাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না।

রাহুল এক্ষুনি ফিরে আসবে এই ভরসায় আমি ছিপ নিয়ে বসে রইলাম।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল কিন্তু রাহুল ফিরল না। ততক্ষণে আমি একটা চারাপোনা ধরেছি এবং প্রবল উৎসাহে আবার নদীতে ছিপ ফেলেছি।

মাছ ধরার দিকে মনোযোগ দিয়ে মনে-মনে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। চোখ ছিল ফাতনার দিকে, কিন্তু মন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। রাহুল বা পিংকি যে ফিরে আসেনি সেটা যেমন খেয়াল ছিল না, তেমনই সূর্য যে জঙ্গলের মাথায় হেলে পড়েছে সেটাও নজর করিনি।

জঙ্গল থেকে হিংস্র ডাকগুলো কানে আসতেই আমার ঘোর কাটল। ডাকগুলো বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। একটানে ছিপ তুলে নিলাম নদী থেকে। নাইলনের থলেটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাব, অমনি পাথর হয়ে গেলাম।

কখন যেন ছ'টা বুনো কুকুর পেছন থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। এতই চুপিসাড়ে ওরা কাজটা সেরেছে যে, আমি একটুও টের পাইনি। মনে হয়, ওরা আধপোড়া মড়ার খোঁজে নদী পেরিয়ে শ্মশানের দিকে এসে উঠেছিল। তারপর শিকারের খোঁজে নদীর পাড় ধরে হেঁটে এদিকটায় চলে এসেছে।

কয়েকটা ঢোল শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছিল। আর কয়েকটা হিসহিস শব্দ করছিল। আবার কখনও-বা চাপা গর্জন।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। কিন্তু শরীরটা পুরো অবশ হয়ে পড়েনি। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার জন্যে তৈরি হলাম। আমার হাতের অস্ত্র বলতে পলকা একটা ছিপ।

এগিয়ে আসা কুকুরটাকে ছিপের এক ঘা বসিয়ে দিলাম। ওটা 'কেঁউ' শব্দ করে দু-পা পিছিয়ে গেল বটে কিন্তু পাশ থেকে একটা কুকুর সাপের ছোবল মারার ঢঙে আমারা ডানপায়ে এক কামড় বসিয়ে দিল।

সেদিকে ঘুরে তাকাতেই বাঁ-দিকে কোমরের কাছটায় একটা কামড় টের পেলাম। প্যান্টের মোটা কাপড় ফুটো করে ধারালো দাঁত বসে গেল শরীরে। আমি যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলাম। ডান পা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। কোনদিক সামলাব আমি? আমাকে ঘিরে হিংস্র কুকুরগুলো যেন ব্যালে নাচছে। একবার ছুটে এসে এ কামড়ায় তো আর-একবার ও কামড় দেয়।

আমি ছিপটাকে এলোপাতাড়ি চালাতে লাগলাম, আর প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু শুকনো গলা দিয়ে যে-স্বর বেরিয়ে এল তা কারও কান পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব নয়।

বুনো কুকুরগুলো আঁচড়ে-কামড়ে আমাকে ঘায়েল করে চলল। নদীর পাড়ে রক্ত ছিটিয়ে পড়তে লাগল এখানে-ওখানে। আমার মাথা টলে গেল। নিজের

ভাঙা গলার চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল আমি নয়, অন্য কেউ চিৎকার করছে।

আর সহ্য করতে পারলাম না। অবশ হাত থেকে ছিপ খসে পড়ল। আমিও কাত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। একটা কুকুর আমার বাঁ-পায়ের ডিম থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিল। মনে হল, আমার শরীরে কেউ একটা গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে দিল।

ঠিক তখনই নদীর পাড় ধরে সে উঠে এল।

সর্বাঙ্গে কাদা-মাখা অন্ধকার রঙের এক বিশাল কুকুর। সে বিদ্যুতের মতো ছুটে এল শিকারি কুকুরগুলোর দিকে। হিংস্র চোয়াল আর ধারালো নখ দিয়ে ওদের শরীর ছিন্নভিন্ন করতে লাগল।

বাতাসে লোম উড়তে লাগল। দাঁতে দাঁত লাগার খটাখট শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে ছোট-বড় গর্জন।

ছ'জন শত্রুর সঙ্গে একাই লড়তে লাগল সেই অন্ধকার কুকুর। একবার এর ওপর লাফিয়ে পড়ে তো আর-একবার ওর ওপর।

আমি অসাড় শরীরে শুয়ে-শুয়ে সেই আশ্চর্য লড়াই দেখতে লাগলাম। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এসে গেল।

তিনটে বুনো কুকুর পড়ে গেল মাটিতে। আর উঠতে পারল না। বাকি তিনটে প্রাণভয়ে ঝাঁপ দিল নদীতে। তখন দেখি আরও তিনটে বুনো কুকুর নদীর ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় সঙ্গীদের অবস্থা দেখে ওরা আর লড়াইয়ে সামিল হয়নি।

লড়াই শেষ হলে জিভ বের করে বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল কাদা-মাখা কুকুরটা। আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল, অদ্ভুতভাবে তাকাল।

আমি যেন মনে-মনে শুনতে পেলাম, 'দ্যাখো প্রভু, আমি ওদের হারিয়ে দিয়েছি।'

আর তখনই দেখতে পেলাম, ওর কপাল থেকে গলা পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষত। বাঁ-দিকের চোখটা কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। নাকের পাশে মাংস ফাঁক হয়ে গেছে। চোয়ালের নীচে নরম মাংস ফালা-ফালা হয়ে ঝুলছে।

তারপরই কাদা-মাখা কুকুরটা নদীর পাড় বেয়ে নেমে গেল নীচে। আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই শুনতে পেলাম লোকজনের চিৎকার—আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে বড়মেসো আর রাহুলের গলা আমি চিনতে পারলাম।

বোধহয় আমার ভাঙা গলার চিৎকার কেউ শুনতে পেয়েছিল।

# চেইন রিয়্যাকশন

'ইয়োর বুকস' কোম্পানিতে আমি লাস্ট এপ্রিলে জয়েন করেছি—ওদের এডিটোরিয়াল গ্রুপে, অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে। সেখানেই রঙ্গিলা শর্মার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

লম্বা, ছিপছিপে, ঝকঝকে মেয়ে রঙ্গিলা। ওর উজ্জ্বল চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি। সে-চোখে নজর পড়লেই মনে হয়, ও সব গোপন কথা জানে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

রঙ্গিলার এমনই টান যে, ওকে দেখলেই সবাই বন্ধুত্ব পাতাতে চায়। কিন্তু অনেকেই ওর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কারণ, ওর ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধি।

পাবলিশিং ওয়ার্ল্ডে রঙ্গিলা শর্মার নাম সবাই জানে। ও এক অদ্ভুত জাদু জানে —অঙ্কের জাদু। আড়ালে অনেকে বলে, ও সুপারন্যাচারাল ম্যাথামেটিক্যাল জিনিয়াস। তবে ম্যাথ বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। রঙ্গিলার ব্যাপারটা সুপারম্যাথ। এই অঙ্কই বই বিক্রির জাদু ওর হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। সিম্প্লি ওর জন্যেই 'ইয়োর বুক্স' অন্য সব পাবলিশিং কোম্পানিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। পাবলিশিং-এর দুনিয়ায় রঙ্গিলা শর্মা এককথায় এক ইউনিক আইকন।

'ইয়োর বুক্স'-এ চাকরির সুযোগ পাওয়া মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। অন্তত আমার কাছে। এর আগে ছোটামোটা ফিলিম ম্যাগাজিনে সাব-এডিটরের কাজ করেছি। একটা ক্রাইম ম্যাগে সহ-সম্পাদকও ছিলাম। হঠাৎ করে কী খেয়ালে 'ইয়োর বুক্স'-এর ইন্টারভিউটা দিয়েছিলাম—লাক ফ্যাক্টর—চাকরিটা গেঁথে গেল। স্বপ্নের চাকরি। কারণ, কোম্পানিটা মাপে বাড়ছে—ওপরে ওঠার স্কোপ অনেক।

'ইয়োর বুক্স' লাস্ট দশবছরে যে-ক'টা পেপারব্যাক সিরিজ বের করেছে তার সবক'টাই সুপারহিট। কোনওটা ক্লাসিক, কোনওটা ছোটদের, কোনওটা ক্রাইম থ্রিলার, কোনওটা আবার সায়েন্স ফিকশন অ্যাডভেঞ্চার। এই সবক'টা সিরিজ সাকসেসফুল হওয়ার মূলে রঙ্গিলা—আর ওর সুপারম্যাথ। আর তার রেজাল্ট: 'ইয়োর বুক্স'-এর টার্নওভার অন্যান্য পাবলিশিং হাউসকে ঈর্ষায় নীল করে দেয়—গাঢ় নীল।

'ইয়োর বুক্স'-এ জয়েন করার পর তৃতীয় দিনেই রঙ্গিলার মুখোমুখি হলাম।

মাঝারি একটা কাচের ঘরে ওর অফিস। টেবিলে তিনটে টেলিফোন, একটা ল্যাপটপ, হাফডজন নানা রঙের পেন, আর দু-থাক ফাইল।

একতাড়া কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের ওপরে ঝুঁকে ছিল ও। ওপরের হেডিং দেখে বুঝলাম, ওগুলো সেল্‌স ফিগার। পরে জেনেছি, সেল্‌স ফিগারেই রঙ্গিলার একমাত্র ইন্টারেস্ট। কারণ, সেল্‌স ফিগারই ওর সুপারম্যাথ অ্যাপ্লিকেশানের র' ডেটা।

আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেছেন বিক্রম ভট্টাচার্য, কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। ক্ষম।স্বর দেখেই ও মুখ তুলে তাকাল। ছোট-ছোট লেন্সের শৌখিন চশমাটা চোখ থেকে নামাল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'আমাদের প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার—রঙ্গিলা শর্মা।' বিক্রম আলাপ করিয়ে দিলেন: 'মিস শর্মা, আমাদের নতুন অ্যাসোসিয়েট এডিটর প্রীতম চৌধুরী।'

চট করে ও হাত বাড়িয়ে দিল। আমরা হাত ঝাঁকালাম। আমি বললাম, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি....।'

'তাই?' ও হাসল—ছোট্ট চাপা হাসি। অনেকটা পিঠ চাপড়ানো গোছের।

আমি ওকে দেখছিলাম। চাউনি, শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর ঢং, গলার স্বর—সবকিছু থেকেই ক্ষমতার অদৃশ্য তরঙ্গ ঠিকরে বেরোচ্ছে। এই তিরিশ বছর বয়েসেই 'ইয়োর বুক্‌স'-এর প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার! হয়তো আর কয়েক বছরের মধ্যেই ও এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর হয়ে ভিপি-তে পৌঁছে যাবে।

বিক্রম তখন মুখে পেশাদার হাসি ফুটিয়ে বলে চলেছেন, 'রঙ্গিলা আমাদের কোম্পানির সুপারব্রেন। ওর ম্যাজিকে আমাদের সেল্‌স ফিগার এক্সপোনেন্‌শিয়ালি বেড়ে চলেছে...।'

কেন জানি না, বারবার 'সেল্‌স ফিগার' কথাটা শুনতে-শুনতে আমার রঙ্গিলার ফিগারের দিকে নজর গেল। সবুজ ছক-কাটা চুড়িদারে ওকে সুন্দর মানিয়েছে। গাঢ় সবুজ ওড়নাটা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই—অনেকটা পাশে সরে গেছে। তাই বোঝা গেল, ওর কাঠামো ছিপছিপে হলেও ও বেশ ফলন্ত গাছ। তবে ওর আকর্ষণের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাবধানী শাসন রয়েছে।

সবমিলিয়ে যেটা বুঝলাম, রঙ্গিলা শর্মা আর-পাঁচটা মেয়ের মতো নয়।

আমার ধারণা যে কতটা সত্যি সেটা বুঝলাম আরও মাস-দেড়েক পর। কারণ, এর মধ্যে রঙ্গিলার সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব হয়েছে। কাজের

ফাঁকে সময় পেলেই আমি ওর ঘরে গিয়ে হাজির হই। নতুন-নতুন বইয়ের পাবলিকেশান প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করি। ও চাবুকের মতো সব পরামর্শ দেয়, নানান বুদ্ধি দেয়, ইউনিক সব স্কিমের কথা বলে। তিরিশ বছরের একটা মেয়ের মুখ থেকে এসব শুনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে, ও এক অদ্ভুত টাইপের জিনিয়াস।

ওর এই রহস্য আমাকে টানতে থাকে। কিন্তু ওর ব্যবহার দেখে সেরকম কোনও টান আমি টের পেতাম না।

রঙ্গিলা কোম্পানির প্রোডাকশন আর ডিস্ট্রিবিউশান ছাড়াও সেল্‌স-এর অনেকটাই দেখাশোনা করে। কোন বই কত প্রিন্ট রান দেওয়া হবে, কোন-কোন বই দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু এইসব মেজর সিটির কোথায়-কোথায় কত কপি করে পাঠাতে হবে, কোন টাইটেল-এর অ্যানসোল্ড কপি রিটার্ন নেওয়া হবে—কোনটার হবে না—সবই রঙ্গিলা শর্মা ঠিক করে দেয়। বলতে গেলে কোম্পানিতে রঙ্গিলাই যেন শেষ কথা।

কানাঘুষোয় শুনলাম, এ নিয়ে বিক্রম ভট্টাচার্যের বেশ ক্ষোভ আছে। কিন্তু ভদ্রলোক কাজপাগল পেশাদার মানুষ। কোম্পানির জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। কোম্পানিকে বড় করে তোলার পেছনে ওঁর অনেক অবদান আছে। পনেরো বছর 'ইয়োর বুক্‌স'-এ আছেন। সেখানে রঙ্গিলা শর্মা মাত্র চারবছর।

কিন্তু মামুলি মেধার মানুষ আর জিনিয়াসের মধ্যে এটাই তো ফারাক!

রঙ্গিলা সারাটা দিন ওর কাচের দেওয়াল ঘেরা অফিসে বসে অঙ্ক কষে, ল্যাপটপে ঠকাঠক করে বোতাম টেপে, চোখের চশমাটাকে বারবার ঠেলে নাকের গোড়ায় তোলে। তারপর....সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাসিমুখে ঘরের বাইরে বেরোয়। সারকুলেশান ম্যানেজার আশুতোষ শিভালকরের কাছে গিয়ে বলে, ''হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান গোস্ট স্টোরিজ'' টাইটেলটা মুম্বাই আউটলেটে দু-হাজার কপি পাঠান। আর কবিতা ভার্গবের ''ফেমাস পিপ্‌ল, ফেমাস ড্রিমস্'' হায়দ্রাবাদে যত আনসোল্ড কপি আছে—আপনি বলছিলেন বারোশো মতন—ওটা ইমিডিয়েটলি ব্যাঙ্গালুরুতে পাঠিয়ে দিন। ও. কে.?'

'ও. কে.।' শিভালকরের মুখ দেখে বোঝা যায় যে, তিনি খুশি হননি। কিন্তু 'ইয়োর বুক্‌স'-এ এসব ব্যাপারে রঙ্গিলা শর্মাই শেষ কথা।

আর আমি এটাও জানি, শেষ পর্যন্ত রঙ্গিলাই জিতবে। খুব কম সময়ের মধ্যেই মুম্বই আর ব্যাঙ্গালুরুর পাঠকেরা ওই বই দুটোকে শুষে নেবে।

একদিন আমি শিভালকরের ঘরে ছিলাম। অমাদের নতুন তিনটে টাইটেল কেমন বাজার পাচ্ছে সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। কথা শেষ করে উঠতে

যাব হঠাৎই রঙ্গিলা ঘরে এসে ওর চমকে দেওয়া তিনটে সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেল।

শিভালকর ব্যাজার মুখে 'থ্যাংক য়ু' বলল।

রঙ্গিলা ঘরের বাইরে বেরোতেই আমিও বেরিয়ে এলাম। অফিসের করিডরে ওর পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বললাম, 'আপনি কি ম্যাজিক জানেন?'

ছোট্ট হেসে একঝলক তাকাল আমার দিকে : 'ম্যাজিক নয়। ম্যাথামেটিক্স। ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান।'

'ইভেন্ট স্পেকুলেশান?'

'হ্যাঁ। টাইম অ্যান্ড স্পেসে দুটো ইভেন্টকে একই কো-অর্ডিনেটে রাখতে পারলে আপনি যা চান তাই হবে। মানে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের দেখা হতে পারে। দুটো গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। একজন পাঠক একটা বই কিনে ফেলতে পারে...ব্যস...সিম্প্‌ল।'

'এর নাম সিম্প্‌ল?'

কথা বলতে-বলতে আমরা রঙ্গিলার চেম্বারে চলে এলাম।

ও চেয়ারে বসল। আমাকেও বসতে বলল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে সরাসরি তাকাল আমার দিকে: 'দেখুন, ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে সিম্প্‌ল নয়, তবে আমাকে লাস্ট পাঁচবছরে অনেক কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশান করতে হয়েছে—তারপর ব্যাপারটা আমার কাছে সিম্প্‌ল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অন্য কাউকে এক্সপ্লেইন করে বোঝানো বেশ কঠিন। তবে এর এসেন্স হল, ওই যে বললাম, ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান...।'

'এসব তো সায়েন্স ফিকশানের মতো শোনাচ্ছে।'

'মতো কেন? এটা সত্যি-সত্যিই সায়েন্স ফিকশান।' ও মুচকি হেসে বলল।

বুঝলাম, এর বেশি ও খুলে বলবে না। আর বলবেই বা কেন? এটা তো ওর স্পেশাল সিক্রেট।

কিন্তু আমার কৌতূহল বেড়েই চলল। রঙ্গিলার মন্ত্রগুপ্তিটা কী? এমন নয় যে, সেটা জেনে আমি আমার প্রমোশানের কাজে লাগাব। তাব কৌতূহলটা সবসময় আমাকে খোঁচাতে লাগল।

কিছুদিন পর আবার একটা ঘটনা ঘটল। রঙ্গিলার সেই সুপারম্যাথের ম্যাজিক। ঠিক জায়গায় ঠিক বইটা ঠিক সময়ে পাঠানো। আমরা প্রায় চারহাজার কপির বোনাস সেল পেলাম। 'ইয়োর বুকস'-এর সি অ্যান্ড এম-ডি আমেরিকা থেকে রঙ্গিলাকে স্পেশাল 'কনগ্র্যাচুলেশানস' নোট পাঠালেন। আমরাও ওকে অভিনন্দন জানালাম। ওর ছোট্ট হাসি দেখে বুঝলাম, এসব সাবাশি নেওয়া ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমাদের অফিসে একটা কফি শপ আছে। কাজের ফাঁকে কিছুটা বাড়তি সময় হাতে পেলে আমি ওখানে গিয়ে বসি। সেদিন রঙ্গিলাকে 'কফি খাওয়াব' বলে কফি শপে নিয়ে গেলাম।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে এ-কথা সে-কথা বলতে-বলতে আমি সেই চারহাজার কপির বোনাস সেলের প্রসঙ্গে গেলাম।

রঙ্গিলা তেরছা চোখে আমার দিকে তাকাল, ঠোঁটে একটুকরো হাসি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিছুই না—সিম্পলি ম্যাথামেটিক্স। আমি জানতাম ওখানে সাতদিনের একটা ন্যাশনাল স্পোর্টস ইভেন্ট আছে। সেটা দেখতে প্রচুর লোক জড়ো হবে—তারা বিন্দাস মুডে থাকবে। যদি সেই সাতটা দিন স্টেডিয়ামের নিয়ারেস্ট বুকশপগুলোতে আমাদের স্পোর্টস টাইটেলগুলো রাখতে পারি তা হলে একটা স্ট্যাগারিং সেল পাওয়া যেতে পারে। তো তাই করলাম। সিম্প্‌ল।'

এরপর আরও কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলাম বটে কিন্তু আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। ওর সুপারম্যাথ আরও কী-কী করতে পারে ভেবে আমার অবাক লাগছিল।

কয়েকমাসের মধ্যেই অন্যান্যদের মতো রঙ্গিলার ম্যাজিক আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ওর সঙ্গে গল্প-টল্প করলেও এ-নিয়ে আর কোনও কথা জিগ্যেস করতাম না। বরং মন দিয়ে নিজের কাজটা করতাম। কোন বই ছাপতে হবে, কোন বই রিপ্রিন্টে পাঠাতে হবে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। 'ইয়োর বুক্‌স' দিনকেদিন আরও ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল।

চাকরিটা আমার ভালোই চলতে লাগল—শুধু বিক্রম ভট্টাচার্যের খবরদারি ছাড়া। আমাদের কোম্পানির মালিক বলবিন্দার নারুলা সারাটা বছর বলতে গেলে আমেরিকাতেই থাকেন। লোকটা যে ঠিক কত টাকার মালিক তা ও নিজেও জানে না। ওর অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে 'ইয়োর বুক্‌স'-এর তুলনা করলে হাতির পাশে মাছিকে রাখতে হবে। তো এই মাছির খবরদারি করার দায়িত্বে রয়েছেন বিগ বস বিক্রম ভট্টাচার্য।

আমাদের অফিসটা পার্ক স্ট্রিটের একটা পুরোনো বিল্ডিং-এর ফোর্থ ফ্লোরে। প্রায় পাঁচহাজার স্কোয়ার ফুট জায়গা নিয়ে মোটামুটিভাবে সাজানো। রিসেপশানের এনক্লেভটা বড়, আমাদের পাবলিকেশানের নানান বইয়ের কভার দিয়ে সাজানো। তারপর রয়েছে অ্যাকাউন্টস্‌ ডিপার্টমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশান সেল, এডিটোরিয়াল গ্রুপ, স্টোর এইসব। এ ছাড়া কোম্পানির কয়েকজন হোমরাচোমরা—যেমন, এডিটর মনোজ বর্মন, সারকুলেশান ম্যানেজার আশুতোষ

শিভালকর, রঙ্গিলা শর্মা, এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর কৃপাল সিং আর ভি পি বিক্রম ভট্টাচার্য—যাঁর-যাঁর ঘরে বসেন।

বিক্রম ভট্টাচার্য লোকটা কেমন যেন। চেহারায় বেঁটেখাটো। ময়লা রং। কপালে সবসময় ভাঁজ পড়েই আছে। সুট-টাই পরে অফিসে আসেন। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হয় সুট-টাই ওঁকে একদম মানায় না।

বিক্রমের সঙ্গে কারও তেমন সদ্ভাব নেই। কিন্তু তিনি সবসময় গা-জোয়ারি ব্যক্তিত্ব ফলাতে চেষ্টা করেন। লোকে ভয়ে বা ভক্তিতে ওঁর কথা শোনে। রঙ্গিলার সঙ্গে বিক্রমের প্রায়ই খটাখটি লাগে। কিন্তু রঙ্গিলা কোম্পানির কাছে যতই ইমপরট্যান্ট হোক বিক্রম ভট্টাচার্য বলবিন্দারের 'ব্লু আইড বয়'। কারণ, কোম্পানির ছোট অবস্থা থেকে অনেক কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে বিক্রম 'ইয়োর বুক্স'-কে ন্যাশনাল ম্যাপে এস্টাবলিশ করেছেন। অ্যানুয়াল অ্যাড্রেসে মিস্টার নারুলা সবসময় বিক্রমের স্যাক্রিফাইসের কথা বলেন। বলেন যে, 'মিস্টার ভট্টাচার্য ছাড়া "ইয়োর বুক্স"-কে ভাবা যায় না। হি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ দিস ফ্লোটিং ভেসেল—মাই ডিয়ারেস্ট ভেসেল ফর দ্যাট ম্যাটার।'

এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর কৃপাল সিং-এর বয়েস প্রায় সাতষট্টি। প্রায়ই ওঁর অসুখবিসুখ লেগে আছে। মাঝে-মাঝেই ওঁর রিটায়ারমেন্টের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সবাই জানে, কৃপাল সিং-এর জায়গায় রঙ্গিলা যখন-তখন যেতে পারে। তারপরই আর বাকি থাকবে মাত্র একটা ধাপ। বিক্রম ভট্টাচার্যের ভিপি-র চেয়ার। সেই চেয়ারের জন্যে রঙ্গিলার যে আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা ওর কথায় মাঝে-মাঝে টের পেতাম। আর বিক্রম ভট্টাচার্য যে বুক পাবলিশিং-এর ব্যাপারটা ভালো বোঝে না সেটা নিয়েও ও কমেন্ট করত। বলত, 'মিস্টার ভট্টাচার্য হলেন এসটিডি এমপ্লয়ি।'

'তার মানে?'

'মানে হল, সার্ভিস টিল ডেথ।' হেসে বলত রঙ্গিলা, 'কবে কে কোম্পানির জন্যে কী স্যাক্রিফাইস করেছে সেটা ভাঙিয়ে দশ-পনেরো বছর চালিয়ে যাওয়াটা বড্ড বাড়াবাড়ি।'

আমি তখন রঙ্গিলাকে লক্ষ করতাম। ওর চোখ ছোট হয়ে এসেছে। দু-ভুরুর মাঝে দু-একটা সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে। ঠোঁটের কোণে অপছন্দের ছাপ।

দু-সপ্তাহ পরপরই বিক্রম স্ট্র্যাটেজি মিটিং ডাকতেন। তখন আমরা সবাই ওঁর চেম্বারে গিয়ে হাজির হতাম। ভিজিটরদের জন্যে সাজানো চারটে চেয়ারে মনোজ বর্মন, আশুতোষ শিভালকর, কৃপাল সিং আর রঙ্গিলা বসে। আর আমরা—স্মল ফ্রাইরা—ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকি।

বিক্রম ওঁর মতো করে পাবলিশিং প্ল্যান, কোম্পানি পলিসি, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এসব নিয়ে কথা বলেন। আমরা বাধ্য ছাত্রের মতো শুনি। তারই মধ্যে খেয়াল করি, রঙ্গিলা ওর চেয়ারে বসে উসখুস করছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কখনও-বা হাই তুলছে।

বিক্রম ভট্টাচার্য কথা বলতে-বলতে এই সিমটগুলো লক্ষ করতেন। বুঝতেন, রঙ্গিলা ওঁর গুরুগম্ভীর কথাবার্তাগুলোকে একফোঁটাও আমল দিচ্ছে না। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে রাগ হলেও বিক্রম সে-রাগ চেপে রাখতেন। কারণ, তিনি জানেন, তিনি কোম্পানির যতই ব্লু আইড বয় হোন না কেন, রঙ্গিলার চোখের মণিও কম নীল নয়। রঙ্গিলাকে তাড়ানোর ক্ষমতা বিক্রমের নেই। কারণ, কোম্পানিতে রঙ্গিলার যে-কোনও কথাই বেদবাক্য। ওর কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা কারও নেই।

আমরা সবাই জানতাম, বিক্রম রঙ্গিলার কোনও একটা ভুলের জন্যে তক্কে-তক্কে আছেন। ছোট বা বড়—যে-কোনও একটা ভুল। তা হলেই বিক্রম ওকে ছেঁটে ফেলতে পারবেন। কিন্তু ওঁর কপাল খারাপ। কোম্পানির সেল্স ফিগার দিন-দিন বেড়েই চলেছে আর রঙ্গিলাও কাগজ-পেন নিয়ে আর ল্যাপটপে খটাখট বোতাম টিপে ওর 'ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান'-এর ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আমাদের কোনও টাইটেল দশহাজার কপি বিক্রি হওয়ার মানে হল আমাদের চোখে সেটা 'অ্যাভারেজ সেল'।

রঙ্গিলা আচমকা তিনটে কি চারটে হার্ড কভার বই সিলেক্ট করে কৃপাল সিং আর বিক্রম ভট্টাচার্যকে বলত সেই বইগুলোর পেপারব্যাক এডিশান বের করতে। আমরা এডিটোরিয়াল গ্রুপ থেকে স্টাডি করে দেখতাম যে, বইগুলোর তেমন পোটেনশিয়াল নেই। কিন্তু রঙ্গিলা সেগুলো ছাপার জন্যে ঝুলোঝুলি করত। বিক্রম ভট্টাচার্য যখন ওকে বোঝাতেন যে, বইগুলো হার্ড কভারে খুব কম বিক্রি হয়েছে তখন রঙ্গিলা বলত, 'তার মানেই তো, স্যার, বইগুলো বেশি লোক পড়েনি। পেপারব্যাক এডিশান বেরোলে পড়বে। এগুলোর পেপারব্যাক এডিশান রাইট আমাদের ইমিডিয়েটলি কেনা উচিত। আই হোপ নাউ য়ু এগ্রি, স্যার...।'

আমরা পেপারব্যাক এডিশান বের করার পর বইগুলো মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হত। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত রঙ্গিলার সুপারম্যাথই জিতত।

চাকরির স্তরবিচারে আমার আর রঙ্গিলার মধ্যে দূরত্ব থাকলেও আমরা একবছরের মধ্যেই ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। আর কৃপাল সিং-ও বয়েস আর

অসুখের চাপে রিটায়ার করলেন। আমরা সবাই ভাবলাম, এইবার রঙ্গিলা শর্মাকে নিশ্চয়ই এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর করা হবে। কিন্তু আমাদের হিসেব মিলল না। কৃপাল সিং-এর স্লটটা বলবিন্দার নারুলা খালিই রেখে দিলেন। তখন নতুন একটা কানাঘুষো শুরু হল। নিজেদের মধ্যে অনেকে বলাবলি করতে লাগল যে, বিক্রম ভট্টাচার্যের চেয়ারটা খালি হলেই রঙ্গিলা এ-কোম্পানির ভিপি হয়ে বসবে। কিন্তু বিক্রম ভট্টাচার্যের চেয়ারটা কীভাবে খালি হবে সেটা কেউ বলতে পারল না।

একদিন সন্ধের পর অফিসের কফি শপে বসে আমি আর রঙ্গিলা স্যান্ডউইচ আর কফি খাচ্ছিলাম। কথায়-কথায় আবার ওর সুপারম্যাথের কথা উঠল।

এখন রঙ্গিলার সঙ্গে আমার রিলেশানটা এমনই যে, 'আপনি-আপনি'-র বদলে আমরা 'তুমি-তুমি' করে কথা বলি। তা ছাড়া 'ইয়োর বুক্স'-এ আমার চাকরিও বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। তাই পুরোনো কৌতূহলটা আবার মাথাচাড়া দিল। ফস্ করে বলে ফেললাম, 'রঙ্গিলা, একটা সত্যি কথা বলব?'

'কী, বলো?' কফির কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে ও চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

'তোমার সিক্রেটটা আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।'

ও হাসল। বলল, 'প্রীতম, এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছে, আমাদের অফিসে শকুন বেশি, মুনিয়া কম। যু আর ডিফরেন্ট—তাই আজ তোমাকে বলছি। বাট য়ু শুড কিপ ইট আ সিক্রেট।'

'প্রমিস—।'

'ওয়েল, অঙ্কটা হচ্ছে নানান ইভেন্টের পারসেন্টেজের খেলা। লাস্ট পাঁচবছর ধরে এই অঙ্কটা নিয়েই আমি লড়ে গেছি। স্রেফ অঙ্ক কষে দুটো জিনিসকে এক জায়গায় মিট করানো যায়। মানে, একটা পারটিকুলার টাইমে একটা পারটিকুলার জায়গায় দুটো অবজেক্ট এসে মিট করবে। এটা করতে হলে সেই অবজেক্ট দুটো সম্পর্কে প্রচুর ডেটা থাকতে হবে—আর যে-কোনও একটার ওপর তোমার ইনাফ কন্ট্রোল থাকতে হবে। আই মিন, টু সাম এক্সটেন্ট তুমি তার মুভমেন্ট, অ্যাক্টিভিটি—এসব কন্ট্রোল করতে পারবে। অঙ্ক কষে আমি যেটা করি, ইভেন্ট স্পেকুলেশান। দুটো সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট্সকে দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে স্টাডি করে একই জায়গায় নিয়ে এসে স্রেফ মিট করিয়ে দেওয়া। ব্যস—।'

ব্যাপারটা আমার ম্যাজিকের চেয়েও বেশি কিছু বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ওকে কিছু বললাম না।

ও বলে চলল, 'আর বই বিক্রির ব্যাপারে আমি যেটা করি সেটা হল, সাপ্লাই আর ডিমান্ডকে মিট করিয়ে দেওয়া। ঠিক যে-জায়গায় ডিমান্ড ডেভেলাপ করেছে আমি ঠিক সেই স্পটে বই পাঠিয়ে দিই। ব্যস—লোকে বই কেনে। ইট্‌স দ্যাট সিম্প্‌ল'।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'ধুস, আরও গুলিয়ে গেল'। তারপর শব্দ করে কফির কাপে চুমুক দিলাম। স্যান্ডউইচে একটা কামড় বসালাম।

রঙ্গিলা আমাকে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল ঃ 'লুক, সাপোজ মুম্বইতে আমাদের হরার সিরিজের তিনটে টাইটেল নেক্সট থার্সডেতে তিনশোজন পাঠক কিনতে চাইবে। তখন আমি সেই বইটা মঙ্গলবারের মধ্যে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। তখন সাপ্লাই আর ডিমান্ড মিট করে যায়। আমার ইকুয়েশানগুলো সল্‌ভ করেই সব উত্তর আমি পেয়ে যাই। যখন কোনও খদ্দেরের একটা বই কেনার ইচ্ছে চাগিয়ে ওঠে ঠিক তখনই সেই পারটিকুলার বইটা আমি তার হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।'

স্যান্ডউইচ চিবোতে-চিবোতে ও কফি শপের কাচের জানলার দিকে তাকাল। একটু আনমনা গলায় বলল, 'শুধু বই কেন, যে-কোনও দুটো অবজেক্ট নিয়ে আমি এরকম করতে পারি—অবশ্য, তাদের প্রচুর ডেটা আমার হাতে থাকা দরকার।'

'তো তুমি হঠাৎ বইয়ের লাইনে এলে কেন? পাবলিশিং ইজ নট দ্যাট অ্যাট্রাকটিভ।'

'টু মি, ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যাট্রাকটিভ।' হেসে বলল রঙ্গিলা, 'আমি পাবলিশিং ট্রেডকে ইনডাস্ট্রিতে কনভার্ট করতে চাই। এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। পাবলিশিং বিজনেসের মেইন ড্রব্যাকটা কোথায় জানো? যখন একজন পাঠকের একটা বই কেনার ঝোঁক চাপছে তখন সেই বইটা সে হাতের কাছে পায় না। পরে যখন বইটা সে হাতের নাগালে পাচ্ছে তখন কিন্তু বইটা কেনার ঝোঁক কমে গেছে। অ্যাজ আ রেজাল্ট বইটা সে আর কিনছে না। সো য়ু গেট নো সেল। কিন্তু...।' আমার দিকে তাকিয়ে কয়েকসেকেন্ড সময় নিল রঙ্গিলা। কফিতে ঠোঁট ছোঁয়াল। তারপর বলল, 'কিন্তু যদি সেই পাঠকের বই কিনতে চাওয়ার ইমপাল্‌সের মোমেন্টে তুমি বইটা তার হাতের কাছে পৌঁছে দিতে পারো তো কেল্লা ফতে। য়ু গেট আ সেল।'

'বই ছাড়াও অন্য ইভেন্ট নিয়ে এরকম অঙ্ক তুমি করতে পারো?'

আমি ভীষণ অবাক হচ্ছিলাম। রঙ্গিলা এসব বলছে কী! আজ ও খুব ক্যান্ডিড মুডে আছে। ওর সিক্রেট রুমের দরজা খুলে দিচ্ছে ধীরে-ধীরে। আর

আমিও অন্ধকার ঘরটার ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছি।

কফি শেষ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। তারপর নীচু গলায় বলল, 'অন্য ইভেন্ট নিয়ে এরকম করতে পারি কিনা? হ্যাঁ, পারি। কখনও ভেবে দেখেছ, যখন কোনও লোক গাড়িতে ধাক্কা খায় তখন একই জায়গায় ঠিক একই সময়ে দুটো অবজেক্ট এসে মিট করে? এই অবজেক্ট দুটো কিন্তু নানান চেইন অফ ইভেন্ট্‌স-এর মধ্যে দিয়ে এসে ওই পারটিকুলার মোমেন্টে মিট করেছে—যাকে আমরা বলি অ্যাক্সিডেন্ট। তা হলে ভেবে দ্যাখো, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ঘটনা—যাদের একটার সঙ্গে আর-একটার কোনও কানেক্‌শান নেই—কীভাবে এসে মিট করে! একটা ইভেন্ট চেইন কীভাবে আর-একটা ইভেন্ট চেইনকে ইন্টারসেক্ট করে!'

'এরকম কোনও ইভেন্ট চেইনকে তুমি কি সত্যিই কন্ট্রোল করতে পারো?'

'কিছু-কিছু পারি।' ঠোঁট টিপে হাসল রঙ্গিলা: 'আমি ক্যালকুলেট করতে পারি। ইভেন্ট স্পেকুলেশানের ম্যাথ অ্যাপ্লাই করতে পারি। সেসব করে ইভেন্ট চেইনের কয়েকটা টুকরোকে ম্যানিপুলেট করতে পারি। একজন পাঠক আর একটা বইকে একজায়গায় নিয়ে আসতে পারি। একটা গাড়ি আর একজন রাস্তা-পার-হওয়া মানুষকে ধাক্কা লাগাতে পারি। ইয়েস আই ক্যান।'

ওর মুখের সিরিয়াস ভাব দেখে আমি হেসে ফেললাম : 'রঙ্গিলা, এবার ব্যাপারটা সায়েন্স ফিকশানকে ছাপিয়ে যাচ্ছে কিন্তু! তার মানে, তুমি বলছ বহু ঘটনার ভবিতব্য তোমার হাতে?'

'ভবিতব্য মানে?' রঙ্গিলা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল।

'ডেস্‌টিনি। আই মিন, য়ু থিংক য়ু ক্যান কন্ট্রোল ডেস্‌টিনি?'

আমার প্রশ্নটায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকলেও রঙ্গিলা সেটাকে আমল দিল না। ও সিরিয়াস মুখে বলল, 'হ্যাঁ, প্রীতম, ডেস্‌টিনি আমি কন্ট্রোল করতে পারি—খানিকটা অন্তত পারি।'

এ নিয়ে কথাবার্তা সেখানেই শেষ হয়েছিল। তারপর কাজের চাপে ব্যাপারটা মন থেকে সরে গেল। নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ লঞ্চ করার প্ল্যানিং নিয়ে আমাদের এডিটোরিয়াল গ্রুপ মেতে উঠল। আমি আর মনোজ বর্মন ঘনঘন মিটিং করতে লাগলাম। কলকাতা বুক ফেয়ার কাছাকাছি এসে গেল। প্রতি বছরের মতো 'ইয়োর বুক্‌স'-এ সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

সেইসময় একদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রঙ্গিলা আর বিক্রম ভট্টাচার্যের তুমুল খটাখটি লাগল। রঙ্গিলা চারটে আউট অফ প্রিন্ট পেপারব্যাক রিপ্রিন্টের জন্যে প্রোডাকশনের পাইপলাইনে দিয়েছিল, কিন্তু বিক্রম সেগুলো

নাকচ করে দিয়েছেন।

রঙ্গিলা বেশ জোরালো গলায় বলল, 'আমার সিক্স্থ সেন্স বলছে বুক ফেয়ারে এই বইগুলোর এক-একটা দু-হাজার করে বিক্রি হবে। সেইজন্যেই আমি পাইপলাইনে ওগুলো দিয়েছি।'

'সরি, রঙ্গিলা। দিস টাইম আই উড গো বাই মাই সিক্স্থ সেন্স। বইমেলায় নতুন টাইটেল হল টপ প্রায়োরিটি। অন্তত আমার কাছে। সো—।'

'এই চারটে টাইটেল হল হাই পোটেনশিয়াল মেটিরিয়াল—নতুন টাইটেলের চেয়ে কিছু কম নয়।'

'সো য়ু থিঙ্ক।' বিক্রম ভট্টাচার্যের গলা সামান্য উঁচু হল।

ওঁর ঘরের বাইরে তখন আমাদের কয়েকজনের ভিড়। আমরা ভাবছি, জল কোনদিকে গড়ায়।

'আমি তা হলে সি অ্যান্ড এম-ডি-কে ব্যাপারটা জানাচ্ছি।' থমথমে গলায় বলল রঙ্গিলা।

'অফ কোর্স জানান। আই উড লাভ দ্যাট। অ্যাজ পার দ্য রুল্স অফ দ্য কোম্পানি এক্সক্লুডিং সি অ্যান্ড এম-ডি দ্য ভিপি অলওয়েজ হ্যাজ দ্য ফাইনাল সে। এক্সক্লুডিং সি অ্যান্ড এম-ডি অ্যান্ড আই অ্যাম স্টিল দ্য ভিপি হিয়ার। য়ু হ্যাভ্ন্ট গট মাই জব ইয়েট। আমি আটমোস্ট ট্রাই করব যাতে এই কোম্পানিতে আপনি সবসময় ভিপি-র চেয়ারের নীচেই থাকেন। ও. কে., নাউ য়ু ক্যান বেগ ইয়োর লিভ, ম্যাম।' এই কথা বলে বিক্রম ওঁর চেম্বারের কাচের দরজা খুলে ধরলেন।

গলা ধাক্কা দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

রঙ্গিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভাব। দেখে বোঝাই যায় না, একটু আগেই বিক্রম ভট্টাচার্য ওর ইগোতে হিংস্র কামড় বসিয়েছেন।

আমি ভাবলাম, এইবার বোধহয় কোম্পানিতে উথালপাথাল শুরু হবে, কলকাতা বইমেলার আগে একটা বোম-টোম কিছু ফাটবে।

কিন্তু কিছুই হল না।

এতে আমি যেমন অবাক হলাম, অফিসের আরও অনেকে অবাক হল। রঙ্গিলার বন্ধু হিসেবে অনেকে আমার কাছে 'গোপন খবর' শুনতে চাইল। কিন্তু আমি ছাই কিছু জানলে তো জানাব!

বিক্রম ভট্টাচার্যের সঙ্গে ক্ল্যাশের দশ-বারোদিন পর একদিন অফিসের কাজে রঙ্গিলার চেম্বারে ঢুকেছি, দেখি ও ঘরের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের

রাস্তার দিকে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ওর হাতে একটা ছোট নোটবই আর পেন। মাঝে-মাঝে কীসব লিখছে।

'কী করছ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

রঙ্গিলা ওর কাজে এতই বিভোর যে, কোনও উত্তর দিল না।

কিন্তু ততক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি, ও কী করছে।

রঙ্গিলা পার্ক স্ট্রিট আর মিড্‌লটন স্ট্রিটের ক্রসিং-এর ট্র্যাফিক খুঁটিয়ে দেখছে। ক'টা গাড়ি যাতায়াত করছে তার হিসেব টুকে নিচ্ছে।

এরপর আরও কয়েকদিন ওকে একই অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। জানলা দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের গাড়ি চলাচল দেখছে, নোট নিচ্ছে, আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। তারপর সেই নোটবই থেকে প্রচুর ডেটা নিয়ে ল্যাপটপে যে বোতাম টিপে ঢোকাচ্ছে সেটাও লক্ষ করলাম।

রঙ্গিলা বিক্রমের ওপরেও নজর রাখতে লাগল। কখন তিনি অফিসে আসেন, কখন বেরোন, কখন লাঞ্চ সারেন, সবই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

বিক্রম ভট্টাচার্য এমনিতে খুব ডিসিপ্লিন্‌ড আর পাংচুয়াল মানুষ। রোজ ঠিক পাঁচটায় তিনি অফিস থেকে বেরোন। এলিভেটরের জন্য লাইনে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান। তারপর অফিস-বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট ক্রস করেন। তারপর মিড্‌লটন স্ট্রিটে বাঁক নিয়ে নিজের লাল রঙের ইন্ডিকা গাড়িতে ওঠেন। গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়ি যান।

আমার মাথার মধ্যে 'ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান'-এর গল্প ঘোরাফেরা করতে লাগল। আমি জোর করে ওইসব আজগুবি রাবিশকে মাথা থেকে তাড়ালাম। ধুস, যতসব ফালতু ব্যাপার!

একদিন—সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার—পাঁচটা বাজতে পাঁচমিনিট নাগাদ বিক্রম যখন ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে চটপটে পা ফেলে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন রঙ্গিলা ওঁকে ডাকল।

'স্যার—।'

বিক্রম থমকে দাঁড়ালেন। চোখে প্রশ্ন।

রঙ্গিলা তড়িঘড়ি ওঁর কাছে এগিয়ে গেল। তারপর নর্থ ইন্ডিয়া রিজিয়ানে আমাদের হোলসেল বিজনেস নিয়ে এলোমেলো কথা বলতে লাগল।

বিক্রম ভুরু কুঁচকে একবার নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন। তারপর শুধুমাত্র রঙ্গিলা শর্মা বলেই ওর কথা শুনতে লাগলেন।

আমি অফিসের ওয়াল ক্লকের দিকে নজর দিলাম। ওঁরা তখনও কথা বলছে। লক্ষ করলাম, রঙ্গিলাও আড়চোখে ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পার হওয়ামাত্রই রঙ্গিলা হঠাৎ করে 'থ্যাংক য়ু, স্যার' বলে কথাবার্তায় আচমকা ইতি টানল। তারপর অনেকটা অশোভনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের চেম্বারের দিকে রওনা দিল।

বিক্রম ভট্টাচার্যও তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

আমি কী ভেবে রাস্তার দিকের একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীচে ব্যস্ত পার্ক স্ট্রিট।

একটা ঠান্ডা চোরা স্রোত আমার শরীরের ভেতরে বইতে শুরু করল। ভাবলাম, বিক্রমকে ডেকে সাবধান করি। কিন্তু কীসের জন্যে সাবধান করব? আমাকে পালটা ওঁর ধমক খেতে হবে।

দেখলাম, বিক্রম ভট্টাচার্য অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর প্রথম সুযোগেই রাস্তা পার হতে শুরু করলেন।

রাস্তার মাঝবরাবর আসতেই একটা ট্যাক্সি পাগলের মতো ছুটে এসে বিক্রমকে ধাক্কা মারল। ওঁর শরীরটা শূন্যে ছিটকে গেল। তারপর...।

এরপর একমাস কেটে গেলেও আমার মন থেকে চোরা অস্বস্তিটা গেল না। বিক্রম অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর রঙ্গিলা শর্মা এখন আমাদের কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভিপির চেয়ারে গেলেও আমার সঙ্গে ও 'তুমি-তুমি'-র বন্ধুত্বই বজায় রেখেছে। ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দেখে অনেক সহকর্মীই আমাকে এখন পিঠ চাপড়ায়, আওয়াজ দেয়। আমিও বুঝতে পারি, রঙ্গিলার সঙ্গে আমার রিলেশানটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। এরপর যদি একদিন আমাদের বিয়ে হয়, তারপর...।

তারপর আমাকে এই ভেবে সারাটা জীবন কাটাতে হবে যে, কবে ও আমাকে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে আমার সঙ্গে ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কথা বলবে, দেরি করিয়ে দেবে। তারপর...।

ওই পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের ভয়েই আমি 'ইয়োর বুকস'-এর চাকরি ছেড়ে দিলাম।

# নীল রঙের মশারি

এ ঘটনা কাউকে কখনও বলিনি। কিন্তু এই পাঁচবছর ধরে ব্যাপারটা বুকে চেপে রেখে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। যদি যাই, তা হলে এ ঘটনা আর কেউ কখনও জানতে পারবে না। আর আমিও আপনাদের কাছে বিচার চাইতে পারব না। বলতে পারব না, 'সব তো শুনলেন। এবারে আপনারাই বলুন, আমি কোনও অন্যায় করেছি কি না। আমার বন্ধু রোহনকে আমি সত্যি-সত্যিই খুন করেছি কি না। ওকে আমি...।'

নাঃ, আর পারছি না। কেন যেন মনে হচ্ছে, এটাই আমার শেষ সুযোগ। এখন এ কাহিনি না শোনালে পরে আর কখনও—।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল একটা নীল রঙের মশারি দিয়ে। সস্তায় এই মশারিটা আমি কিনতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাও আমার জন্যে নয়—রোহনের জন্যে। রোহনের চামড়া নাকি প্রজাপতির মতো নরম-সরম। আর আমারটা নাকি গন্ডারের। তাই মশার কামড় আমি গায়ে না মাখলেও রোহন সেটা একেবারে সহ্য করতে পারে না।

চিড়িয়ামোড়ের কাছাকাছি একটা পুরোনো বাড়িতে দুটো ছোট-ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে আমি থাকি। ভাড়া নিয়েছিলাম সেই ছাত্রজীবনে—আর এখন চাকরিজীবনে পৌঁছে গেছি। তাই আজকের আগুন বাজারেও ভাড়াটা বেশ কমসমই রয়ে গেছে।

আমার ঘর দুটো পাশাপাশি, দোতলায়। বহুদিন ধরে ওদের দেওয়ালে রং পড়েনি। জায়গায়-জায়গায় নোনা ধরে পলেস্তারা ফেঁপে গেছে।

দুটো ঘরেরই পেছনদিকের দেওয়ালে লোহার গরাদ বসানো একজোড়া ছোট-ছোট জানলা। জানলা দিয়ে তাকালে ফ্রি-তে প্রকৃতি দেখা যায়।

প্রকৃতি বলতে একটা বিশাল পুকুর—তার বেশিরভাগটাই শ্যাওলার সবুজ গুঁড়োয় ঢাকা। তার পাড়ে বড়-বড় নারকোল গাছ—সবসময়েই বাতাসে মাথা নাড়ছে। এ ছাড়া আমার ঘরের খুব কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড আমগাছ। গরমের সময়ে ছেলেছোকরারা তার ডালে-ডালে হনুমানের মতো দাপাদাপি করে।

গাছগুলোর আশপাশ দিয়ে তাকালে আকাশ দেখতে পাই। আর বেশ কয়েকটা রঙিন পাখি রোজ ফ্রি-তে দেখা দেয়।

আমার ঘরজোড়ায় মশা আছে বটে তবে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তা

ছাড়া ওরা তো ওই ফ্রি প্রকৃতিরই একটা পার্ট!

আমার বাপি মাঝে-মাঝে কলকাতায় কাজে এলে আমার কাছেই থাকে। মশার কামড় খেয়ে দু-চারবার আমার কাছে কমপ্লেইন করেছে বটে, কিন্তু আমি তেমন গা করিনি। আবার দেড়শো-দুশো টাকা খরচ করব! বাপিকে বুঝিয়েছি, 'এক-দুটো রাতের তো ব্যাপার! কয়েল জ্বেলে চাদর মুড়ি দিয়ে ম্যানেজ করে নাও।'

কিন্তু রোহন অন্য জিনিস। ও ম্যানেজ করতে নারাজ। ও শিলিগুড়ির কোন একটা ফার্মে ঢুকেছে। সেখান থেকে অডিটের কাজে প্রায়ই ওকে কলকাতায় পাঠায়। আর এসে ও আমার আস্তানাতেই ওঠে। তারপর কাজ মিটে গেলে কেটে পড়ে।

আমার দু-ঘরে দুটো সস্তার তক্তপোশ আছে। তার ওপরে বিছানা-বিছানা ভাবওয়ালা যে-লেয়ার দুটি পাতা আছে তাকে টোস্টে মাখানো মাখনের লেয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে থিকনেস ওই মাখনের মতো হলেও সফ্‌টনেস তার মতো নয়। এ নিয়েও রোহনের কাছে আমাকে কথা শুনতে হয়। সত্যিই, ও খলিফা জিনিস!

তো ওর উৎপাতেই মশারিটা কিনেছিলাম এবং দামটা শেয়ার করার জন্যে ও জোর করে একশোটা টাকাও আমার হাতে আগাম গুঁজে দিয়েছিল।

মশারিটা শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের একটা দোকান থেকে কিনেছিলাম। দোকানে অনেক মশারি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বিরক্ত এবং ক্লান্ত দোকানদার তার কানও গুপ্ত কোটর থেকে এই নীল রঙের মশারিটা বের করে নিয়ে আসেন।

মশারিটার রং বেশ উজ্জ্বল নীল। সাধারণত এই রঙের মশারি চোখে পড়ে না। আর তার কাপড়টাও দারুণ—রেশম-রেশম ভাব।

ভাবছিলাম দাম বোধহয় অনেক হবে। কিন্তু দোকানদারটি ভদ্রলোক, কী জানি কেন, মাত্র একশো পঁচিশ টাকায় ওটা আমাকে গছিয়ে দিলেন। বললেন, 'এরকম জিনিস আর পাবেন না। কম দামে কেনা, তাই মিনিমাম লাভে ছেড়ে দিলাম—।'

তো ওই মিনিমাম লাভে কেনা মশারিটা থেকেই ম্যাক্সিমাম গোলমালের শুরু।

প্রথম রাতে কোনও প্রবলেম হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে ব্যাপারস্যাপার দাঁড়াল অন্যরকম।

রাতে কোনও একসময় ঘুম ভেঙে গেল। বাথরুম যেতে হবে। আমাদের

এজমালি বাথরুম একতলায়। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে সরু করিডর ধরে ঘুমচোখে পা ফেলে এগোচ্ছি, নজরে পড়ল আমার পাশের ঘরটার দরজার একটা পাল্লা খোলা।

ঘুম চটকে গেল পলকে। রাতে আমি ঘরটায় তালা দিই না, তবে বাইরে থেকে দরজা টেনে হাঁসকল লাগিয়ে দিই। কিন্তু সেটা তো নিজে থেকে আর খুলতে পারে না!

তা হলে কি চোর ঢুকল ঘরে?

কিন্তু ঘরে তো চুরি করার মতো বিশেষ কিছু নেই। তা ছাড়া এই বাড়িটার দোতলায় আমি একা থাকলেও একতলায় চারঘর ভাড়াটে রয়েছে। দোতলায় কাউকে আসতে হলে সেই ঘরগুলো পেরিয়ে আসতে হবে। সেটা চোরছ্যাঁচোড়ের পক্ষে যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার। তাই আমার দোতলাটা সবসময়েই নিরিবিলি এবং নিরাপদ।

এ বাড়ির করিডর বা সিঁড়িতে কোনও আলো নেই। কিন্তু তাতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। রাস্তার লাইট বা অন্যান্য ঘর থেকে ছিটকে আসা আলোয় দিব্যি কাজ চলে যায়। আর আকাশে চাঁদ থাকলে খানিকটা বাড়তি সুবিধে পাওয়া যায়। তা ছাড়া এতবছর এ বাড়িতে থেকে এর করিডর বা সিঁড়ির প্রতিটি ভাঁজ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তাই রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় কোনওকালেই আমি টর্চ ব্যবহার করি না।

প্রথমে ভাবলাম, চিৎকার করে লোক জড়ো করি। কিন্তু তার পরই মনে হল, এ পাড়ায় চুরি-টুরির সেরকম ট্রাডিশান নেই। শেষে যদি দেখা যায় চোর-টোর কিছু নয়, তা হলে ব্যাপারটা বিতিকিচ্ছিরি হাস্যকর এপিসোড হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং একটিবার দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখি।

পা টিপে-টিপে দরজার খুব কাছে এগিয়ে গেলাম। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খোলা পাল্লা দিয়ে উঁকি মারলাম ঘরের ভেতরে। এবং যা দেখলাম তাতে ব্যাপার স্যাপার আমার পছন্দ হল না।

প্রথম কথা, সিলিংফ্যান ঘোরার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। আর দেখলাম, ঘরের জানলা দুটো খোলা। খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার গাছের ডালপালা আর খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাইরের বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

অথচ রোজ রাতে আমি ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে জানলা দুটো নিজের হাতে ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করি। কাল রাতেও করেছি।

জানলা দুটো এমন হাট করে খুলল কে? আশ্চর্য! কোনও চোর নিশ্চয়ই এ কাজ করবে না!

মশারিটা কে যেন দড়ি দিয়ে তক্তপোশের ওপরে দিব্যি টাঙিয়ে দিয়েছে। আর মশারির ধারগুলো পরিপাটি করে পাতলা তোশকের নীচে গুঁজে দিয়েছে। জানলা দিয়ে ছুটে আসা বাতাস আর সিলিংফ্যানের হাওয়ায় মশারির নীল কাপড়ে তিরতিরে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

মশারিটা আমি মোটেই টাঙাইনি। ওটা ভাঁজ করে ঘরের একপাশে দাঁড় করানো একটা ছোট টেবিলে রেখেছিলাম। তা হলে...।

খুব দ্রুত চিন্তা করছিলাম। যুক্তি দিয়ে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলাম। তাতে যেটা মনে হল, নিশ্চয়ই বাপি কিংবা রোহন কাল গভীর রাতে আচমকা এ-বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। নীচের ভাড়াটেরা ওদের চেনে—তাই দোতলায় উঠে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তারপর আমাকে অযথা ডেকে ঘুম না ভাঙিয়ে চুপচাপ তক্তপোশে শুয়ে পড়েছে। এবং টেবিলের ওপরে নতুন মশারিটা দেখে বিনা দ্বিধায় সেটা কাজে লাগিয়েছে।

কিন্তু কে এই রাতের কুটুম্ব? বাপি, না রোহন?

এবার ঘরের ভেতরে পা রাখলাম আমি। সুইচ টিপে আলো জ্বালালাম। একইসঙ্গে ডেকে উঠলাম, 'কে, বাপি?'

কোনও সাড়া নেই।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েই মশারির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আলো জ্বালার ফলে মশারির নীল রঙের ঘন বুনট পেরিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। তবে আবছা একটা আভাস মতন পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন মশারির ভেতরে কেউ শুয়ে আছে।

আমি আবার ডেকে উঠলাম, 'কে, রোহন?'

এবারে আগের চেয়ে জোরে ডেকেছি, কিন্তু তাও কেউ উত্তর দিল না। কিংবা ঘুমের ঘোরে ডাক শুনতে পেল না।

ভৌতিক কিংবা অলৌকিকে আমার ছিটেফোঁটাও বিশ্বাস নেই। অন্তত কোনওকালে ছিল না। কিন্তু এখন যে একটু গা-ছমছম করছিল না তা নয়।

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

খোলা জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছিল। আমগাছের পাতা খসখস শব্দ তুলছিল। আমার মনে হচ্ছিল, মশারিটা যেন একটা প্রাণী—থম মেরে কীসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।

আমি আবার বাপি আর রোহনের নাম ধরে ডাকলাম। তারপর আর-একবার।

মশারি তবুও চুপচাপ। মশার পিনপিন শব্দ কানে এল। আমি একদৃষ্টে

মশারিটার দিকে তাকিয়ে। মশারিটাও মনে হল ওর অদৃশ্য চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে।

কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর টের পাচ্ছিলাম, আমার কপাল, গলা, ঘাড় ঘেমে উঠেছে।

আমি টেনশানে আর থাকতে পারলাম না। হঠাৎই দুঃসাহসের একটা ঝটকা খেলে গেল আমার মাথায়। সেই ঝটকায় ক্ষিপ্ত পাগলের মতো ছুটে গেলাম মশারিটার দিকে। হ্যাঁচকা টানে মশারিটা তুলে ধরলাম শূন্যে। টানাহ্যাঁচড়ায় একটা দড়ি পট করে ছিঁড়ে গেল। আর দলাপাকানো মশারিটা খামচে ধরে আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

কারণ, মশারির ভেতরে কেউ নেই। বিছানা শূন্য!

অবাক চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে যখন এই মাঝরাতের হেঁয়ালির উত্তর ভাবছি, তখন হঠাৎই নাকে একটা গন্ধ পেলাম।

গন্ধটা অনেকটা যেন হালকা ঘামের গন্ধ।

একইসঙ্গে বিছানায় হাত দিয়ে সামান্য উষ্ণতা টের পেলাম। যেন বিছানায় এতক্ষণ ধরে কেউ শুয়ে ছিল—এইমাত্র উঠে চলে গেছে।

মাথার বালিশের দিকে তাকিয়েও যেন মাথার গোল ছাপের একটা আদল চোখে পড়ল। বালিশের কাছে ঝুঁকে পড়ে জোরে শ্বাস টানলাম। নারকোল তেলের গন্ধ নাকে ভেসে এল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালে গলায় হাত বুলিয়ে ঘাম মুছলাম।

ভূত-প্রেত কিছুই দেখিনি অথচ তাও আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? হতে তো পারে, রোহন কিংবা বাপি সত্যিই হয়তো এসেছে—তারপর উঠে বাথরুমে গেছে।

নিজেকে ভুল বোঝানোর চেষ্টায় আমার ভেতরে একটা লড়াই চলছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, যুক্তি ক্রমশ হেরে যাচ্ছে কুসংস্কারের কাছে।

একটু পরে আমি মশারিটা ফেলে দিলাম বিছানায়। মনে সাহস জড়ো করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। করিডর ধরে এগোলাম বাথরুমের দিকে।

কিন্তু যা আন্দাজ করছিলাম তাই।

বাথরুমে কেউ নেই—না বাপি, না রোহন।

সুতরাং বাথরুম সেরে আবার উঠে এলাম দোতলায়। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম।

ঘরের অবস্থা একইরকম : টিউবলাইট একইভাবে জ্বলছে, সিলিংফ্যান চলছে, মশারিটাও পড়ে আছে বিছানায়।

বিরক্তির একটা শব্দ করে ঘরের আলো-পাখা নিভিয়ে দিলাম। দরজার পাল্লা টেনে দিয়ে হাঁসকল লাগিয়ে দিলাম আবার।

নিজের ঘরে ফিরে এসে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মশারিটার কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই একটা সহজ-স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারলাম না।

পরপর তিনদিন—কিংবা বলা ভালো তিনরাত্তির—বেশ নিশ্চিন্তে কাটল। মাঝরাতে উঠে পাশের ঘরের হাঁসকল খুলে দেখেছি কোনও 'অলৌকিক' ব্যাপার নেই। জানলা দুটো দিব্যি বন্ধ। এবং মশারিটা 'ভালো ছেলে'-র মতো টেবিলের ওপরে ভাঁজ করা অবস্থায় 'শুয়ে' আছে।

তখন মনে হল, সেদিন রাতে যা দেখেছি সেটা আমার মনের ভুল নয় তো? হয়তো ভাবছিলাম, রোহন কিংবা বাপি হঠাৎ করে কলকাতায় চলে আসতে পারে। মশারিটা টাঙিয়ে দিলে আর ওদের মশার কামড় খেতে হবে না। হয়তো আধোঘুমে এসব নিয়েই স্বপ্ন দেখছিলাম। তারপর স্বপ্নের ঘোরে পাশের ঘরের দরজা খুলে ওসব ভুলভাল জিনিস দেখেছি। হয়তো আমি সে-রাতে ঘোরতর ভাবে 'ঘুমিয়ে চলা'-র অসুখে পড়েছিলাম।

এসব ভেবে-ভেবে শেষ পর্যন্ত মেনে নিলাম যে, আমি সে-রাতে ভুলই দেখেছি। তাই চারনম্বর রাত্তিরে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

কিন্তু সেদিন রাতে যা দেখলাম সেটা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন।

বাথরুমে যাওয়ার জন্যে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। করিডরে এসে পাশের ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। কান পেতে ঠাহর করার চেষ্টা করলাম।

হ্যাঁ—সিলিংফ্যানটা ঘুরছে। পুরোনো পাখার কিচকিচ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি হাঁসকল খুলে দরজার পাল্লা ঠেলে দিলাম ভেতরে।

নীল মশারিটা তক্তপোশে পরিপাটি করে টাঙানো রয়েছে। মশারির ওপাশে জানলা দুটো খোলা। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া বাতাসে এবং সিলিংফ্যানের হাওয়ায় মশারির কাপড় নড়ছে, দুলছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্রই আমি সেদিনের মতো হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিলাম। দুবার ঝিলিক মেরে টিউবলাইট জ্বলে উঠল।

আর তখনই মনে হল, দরজার হাঁসকল তো বাইরে থেকে বন্ধ ছিল! তা হলে কেউ ভেতরে ঢুকে মশারিই-বা টাঙাল কী করে, আর পাখাই-বা চালাল কী করে?

একটা ঠান্ডা ভয় আমাকে জাপটে ধরল। মনে হল, ঘরের বাতাস কমে গেছে—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আলো জ্বালার জন্যে মশারির ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল না। তা ছাড়া বাতাসে মশারির কাপড়ে ঢেউ খেলছিল বলে দেখতে আরও অসুবিধে হচ্ছিল।

হঠাৎই আমার মনে হল, মশারির ভেতরে কেউ যেন নড়ছে। কারণ, কোনও শব্দ-টব্দ না হলেও মশারিটা জায়গায়-জায়গায় ফুলে উঠছিল। মানে, কারও মাথা কিংবা হাত-টাতের আদল বোঝা যাচ্ছিল। যেন মশারির ভেতর থেকে কেউ আমাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে, অথবা মশারির দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমি একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। অবাক ভয়ের চোখে সেই অপার্থিব দৃশ্যের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। আমার কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা যে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সেটা অনুভবে টের পেলাম।

হঠাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস শব্দ কানে এল। শব্দটা এমন, যেন কেউ হাঁপাচ্ছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, শব্দটা আসছে মশারির ভেতর থেকেই।

কিন্তু কে রয়েছে মশারির ভেতরে? মশারির ভেতর থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না কেন?

জানি, অবাস্তব চিন্তা, কিন্তু তবুও—অকূলপাথারে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো—আমি রোহন আর বাপির নাম ধরে ডেকে উঠলাম। কিন্তু যে-কণ্ঠস্বর আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল সেটা আমার কাছেই অচেনা ঠেকল।

'রোহন!...বাপি!'

কোনও সাড়া নেই। তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

'রোহন! রোহন!' এবারে বেশ জোরে ডেকেছি : 'বাপি! বাপি!....বাপি!'

কিন্তু এবারেও কোনও সাড়া নেই। শুধু ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস।

গলা পর্যন্ত ভয়ে টইটম্বুর অবস্থাতেও আমার মধ্যে কী করে যেন একটা মরিয়া ঝোঁক ঝলসে উঠল। মনে হল, মশারিটাই আমার চিরশত্রু। ওটাই বড়-বড় নিশ্বাস ফেলছে।

সঙ্গে-সঙ্গে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মশারিটার ওপরে। পটপট করে মশারি টাঙানোর দুটো দড়ি ছিঁড়ে গেল। আর আমি শূন্য মশারি বুকে নিয়ে তক্তপোশে আছড়ে পড়লাম।

তারপর পাগলের মতো মশারিটাকে হাতড়াতে লাগলাম। কারও অস্তিত্বের খোঁজে চাপড় মেরে থাপড়ে-থাপড়ে দেখতে লাগলাম ওটার নানান জায়গায়।

কিন্তু কোনও লাভ হল না। কেউ নেই।

এক প্রবল আক্রোশে মশারিটা টান মেরে বিছানা থেকে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর দলাপাকানো মশারিটা হাতে নিয়ে শূন্য বিছানার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

কেউ কোথাও নেই।

শুধু আগের দিনের মতো বালিশে কারও মাথার ছাঁচ চোখে পড়ল। নাকে এল ঘামের গন্ধ। আর বিছানায় হাত রেখে মনে হল যেন বাড়তি উষ্ণতা টের পেলাম।

ভয়ে স্পঞ্জের মতো ফোঁপরা হয়ে গেলাম এবং তার ফাঁকফোকরে ঠান্ডা ভয়ের স্রোত ঢুকে গেল।

আমি বিছানায় বসে পড়লাম। বারবার খোলা জানলা আর দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, কেউ বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোনওরকমে ওই জানলা কিংবা দরজা দিয়ে সটকে পড়েছে—আবার এক্ষুনি হয়তো আচমকা ফিরে আসবে ঘরে।

যদি সত্যিই আসে?

ভয়ে ঘামতে শুরু করলাম।

মশারিটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে বিছানা ছেড়ে আচমকা ছুট লাগালাম দরজার দিকে। চটপট আলো-পাখার সুইচ অফ করে দরজা টেনে বন্ধ করে দিলাম। তারপর হাঁসকল লাগিয়ে দিয়ে সোজা নিজের ঘরে। ঘরের আলো জ্বেলে সেই অবস্থাতেই শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

ভয়ে সারা রাত একফোঁটাও ঘুম এল না। মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণায় দপদপ করতে লাগল। কানে তখনও ভেসে আসছে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

মনে-মনে ঠিক করলাম, কালই মশারিটাকে আগুনে পুড়িয়ে 'খতম' করব। এবং এই 'অন্ত্যেষ্টি'-র কাজটা রাতের অন্ধকারে তিনতলার ছাদে কিংবা পুকুরপাড়ে গিয়েই সারতে হবে।

তখনও জানি না, আগামীকাল আমার কী কাল হবে!



সকাল ন'টা নাগাদ রোহন হইহই করে এসে আমার ঘরে ঢুকল। কিন্তু তার অনেক আগেই মশারিটার এককোণে শুকনো রক্তের দাগটা আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি।

আজ সকালে কষ্ট করে আর ঘুম থেকে উঠতে হয়নি—যেহেতু সারাটা রাত বলতে গেলে জেগেই ছিলাম।

সকালে হাত-মুখ ধুয়ে নমো-নমো করে চা-বিস্কুট খেয়ে সোজা চলে গেছি পাশের ঘরে।

মশারিটা অগোছালোভাবে মেঝেতে পড়ে ছিল। ওটা তুলে নিয়ে বিছানায় বসলাম। এই বস্তুটার মধ্যে কোন অলৌকিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে সেটা আমি আজ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে চাই।

জানলা দুটো খোলাই ছিল। সেদিকে তাকালে চোখে পড়ছে সকালের রোদ, গাছের সবুজ পাতা, পুকুরের জল, দু-চারটে পাখি। এসব দেখে মনেই হয় না পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছু থাকতে পারে। কাল রাতে এ-ঘরে ঢুকে যেসব কাণ্ডকারখানা দেখেছি সেগুলোও আর সত্যি বলে মানতে মন চায় না।

সুতরাং বেশ হালকা মন নিয়েই মশারি পরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলাম, এবং মনে-মনে যেন ধরেই নিয়েছিলাম শত পরীক্ষা করেও তেমন কিছু পাওয়া যাবে না।

কিন্তু পেলাম।

মশারিটার এক কোণে ভাঁজের আড়ালে একটা দাগ দেখতে পেলাম। দাগটা মাপে একটাকার কয়েনের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়। রং কালচে লাল।

দাগটার ওপরে আলতো করে আঙুল বোলাতেই আমার গোটা শরীর শিরশির করে উঠল। মনে হল যেন জ্যান্ত সাপের গায়ে হাত দিয়েছি।

চট করে আঙুল সরিয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মনে সাহস এনে দাগটা ধীরে-ধীরে নিয়ে এলাম নাকের কাছে। মাথা ঝুঁকিয়ে গন্ধ শুঁকলাম।

মনে হল যেন আবছা আঁশটে গন্ধ পেলাম।

তখন সবমিলিয়ে উত্তর বেরোল একটাই—দাগটা রক্তের দাগ।

কিন্তু এখানে রক্ত এল কোথা থেকে? এ কী মশার পেটের রক্ত?

প্রশ্নটা মনে জেগে উঠতেই হাসি পেয়ে গেল আমার। অন্তত কয়েকশো রক্তচোষা মশা মারলে পর এরকম মাপের একটা রক্তের দাগ তৈরি হতে পারে। সুতরাং, আমি যা ভাবছি তাই। দাগটা রক্তের—তবে মশার নয়।

দোকান থেকে মশারিটা কেনার সময় এই দাগটা আমার চোখে পড়েনি। পড়লে বোধহয় ভালোই হত। মশারিটা কিনে এভাবে হেনস্থা হতে হত না।

এরপর রোজকার কাজ শুরু করলাম বটে কিন্তু রক্তের দাগের ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে গেল না। তখনও জানি না, রোহন হুট করে এসে হাজির হবে।

ন'টার কাছাকাছি বাইরে থেকে রোহনের ডাক শুনতে পেলাম।

'পেরো! পেরো—!' বলে ডাকতে-ডাকতে রোহন দোতলায় উঠে এল। তারপর সটান ঢুকে পড়ল আমার ঘরে।

ঢুকেই একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল রোহন। লম্বা হাঁপ ছেড়ে বলল, 'পেরো, শোন, এই খেপে তিনদিন থাকব। শালা, এই চাকরিটা করে লাইফ হেল হয়ে গেল। আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

কথা শেষ করেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে, দে, আগুন দে—।'

রোহন এইরকমই। ভীষণ মুডি। আমার নাম পরিমল—ডাকনাম পরি। কিন্তু রোহন সেই ছোটবেলা থেকেই আমাকে 'পেরো' বলে ডাকে। আমার এতে আপত্তি ছিল, কিন্তু রোহন পাত্তা দেয়নি। এক তুড়িতে সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে ওই পেরোর গেরো আমার কপালে গেঁথে গেছে।

একটা ড্রয়ার থেকে লাইটার বের করে রোহনকে দিলাম। ও ফস করে আগুন জ্বেলে সিগারেট ধরাল। সিগারেটে টান মারতে-মারতে লাইটারটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিল।

কয়েকসেকেন্ড পরই ও হুকুমের ঢঙে বলল, 'এক গ্লাস জল খাওয়া। তারপর তোর হাতের তৈরি ফার্স্টক্লাস চা—।'

আমি ঘরের এককোণে গিয়ে প্লাস্টিকের বোতল থেকে একটা গ্লাসে জল ঢালতে লাগলাম। রোহন আবার সরাসরি বোতল থেকে জল খেতে পারে না। ওর কিছু খুচরো বাবুয়ানি আছে।

রোহন আমার ছোটবেলার বন্ধু হলেও ওর সঙ্গে আমার কোনও তুলনা হয় না। কোথায় ও, আর কোথায় আমি!

রোহন পড়াশোনায় বরাবর একনম্বর। আর আমি যে কত নম্বর সেটা স্রেফ ভুলেই গেছি।

ও দেখতে সুন্দর। ফরসা। মাথায় কোঁকড়া চুল। চিবুকের ডানদিকে ছোট্ট তিল—বিউটি স্পট। শক্তপোক্ত চেহারা। মাথায় বেশ লম্বা। তা ছাড়া দারুণ চাকরি করে।

আর আমি? রোগা, কালো। হাইট মাঝারি। বুদ্ধিও তাই। সেইসঙ্গে চাকরিটাও।

সত্যি, মাঝে-মাঝে রোহনকে আমার হিংসে হয়। ওকে দেখলেই আমি কেমন একটা কমপ্লেক্সে ভুগি। বন্ধু হলেও ওর সামনে আমি যেন ঠিক সহজ হতে পারি না। ও আমাকে যখনই কিছু বলে, তার মধ্যে সবসময় একটা চাপা

অর্ডারের ভাব থাকে। যেমন এখন।

চা-টা খেয়ে পায়ের ওপরে পা তুলে বসল রোহন। আবার জুত করে সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'পেরো, আজ আর তোর অফিস গিয়ে কাজ নেই। আমি বাজার থেকে মুরগি নিয়ে আসছি—তুই কষে রান্না কর। আমি খেয়ে-দেয়ে দুটোর সময় কাজে বেরোব। তারপর সাতটা সাড়ে সাতটায় ফিরলে দুজনে মিলে পুকুরপাড়ে বসে আড্ডা মারব। রিয়েলি, ও-জায়গাটা ফ্যানট্যাস্টিক।'

সত্যিই, আমার বাড়ির পেছনে যে-পুকুর আছে তার পাড়ে সন্ধেবেলা বসে থাকতে বেশ লাগে। রোহন যখনই আমার আস্তানায় এসে ওঠে তখনই পুকুরপাড়ে বসে আড্ডা মারার সুযোগ খোঁজে। এক-একদিন আমি আর ও রাত এগারোটা পর্যন্তও আড্ডা মেরেছি। তা ছাড়া রোহন আড্ডা জমাতেও পারে। কত বিষয়ে যে ও কতকিছু জানে! আর অনর্গল সুন্দর করে কথা বলতে পারে।

কথার মাঝে সামান্য ফাঁক পেতেই আমি ওকে জানালাম যে, আমি একটা বিউটিফুল মশারি কিনেছি।

শুনেই রোহন একেবারে হইহই করে উঠল। বলল, 'পেরো, অ্যাদ্দিনে তুই একটা কাজের কাজ করেছিস। আজ রাতে মাইনাস মশা ঘুমোনো যাবে...।'

রোহন আমাকে মশারির দামের বাকি পঁচিশটা টাকা দিয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু আমি নিলাম না। বললাম, 'খানিকটা কনট্রিবিউশান আমারও থাক। সবসময় তো ওটা আমিই ব্যবহার করব...তুই আর ক'দিন ইউজ করবি...।'

মশারিটার বাকি ইতিহাস রোহনকে কিছুই জানালাম না। কারণ, ও সেসব বিশ্বাস তো করবেই না—উলটে আমাকে প্যাঁক দিয়ে-দিয়ে জান কাহিল করে ছাড়বে।

সারাটা দিন আমাদের সুন্দরভাবে কাটল। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে দু-ঘরে শুয়ে পড়লাম।

সন্ধে থেকেই আমার মধ্যে একটা টেনশান কাজ করছিল। বারেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। রোহন সেটা টের পেয়ে বেশ কয়েকবার আমাকে ধাতানি দিয়েছে : 'পেরো, কোনদিকে তোর মন পড়ে আছে বল তো—!'

যাই হোক, রাতে যখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম, তখন টেনশানটা যেন আরও জাঁকিয়ে বসল। অন্ধকারে জেগে রইলাম। কিছুতেই ঘুম এল না। আমি যেন কীসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পাশের ঘর থেকে রোহনের চিৎকার শুনতে পাব : 'পেরো! পেরো, কুইক!

বাঁচা আমাকে...।'

অনেক রাতে—রাত তখন কত হবে জানি না—পাশের ঘর থেকে মনে হল যেন একটা শব্দ পেলাম। আর তার ঠিক পরেই কথাবার্তার শব্দ। চাপা গলায় দুজন লোক কথা' বলছে।

কিন্তু পাশের ঘরে রোহন তো একা! এত রাতে কার সঙ্গে ও কথা বলবে?

তা হলে কি নীচে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলছে—আর সেই কথাবার্তা আমি দোতলার ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছি?

কিন্তু এত রাতে কারা কথা বলবে?

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। জানলার কাছে গিয়ে পুকুরপাড়ের দিকে তাকালাম। চাঁদের আলোয় আবছাভাবে সব দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও মানুষজন আমার নজরে পড়ল না।

অথচ চাপা কথাবার্তার শব্দ তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হল, পাশের ঘর থেকেই আওয়াজটা আসছে।

আর দেরি করলাম না। অন্ধকারেই দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে পড়লাম।

রোহনের ঘরের কাছে এসে দরজায় কান পাতলাম। সিলিংফ্যানের শব্দ ছাড়াও কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কথাগুলো বোঝা না গেলেও ব্যাপারটা যে অনেকটা বচসা মতন, সেটা আঁচ করা যাচ্ছে।

দরজায় দুবার টোকা দিয়ে চাপা গলায় ডেকে উঠলাম, 'রোহন! রোহন!'

সঙ্গে-সঙ্গে সব কথাবার্তা থেমে গেল। শুধু সিলিংফ্যানের কিচমিচ শব্দ।

এ-ঘরের দরজার ছিটকিনিটা বেশ গোলমেলে—ঠিকমতো আটকাতে চায় না। বাইরে থেকে দরজার পাল্লায় একটু ঠোকাঠুকি করলেই খুলে যায়। তা ছাড়া রোহন অনেকসময় ছিটকিনি না এঁটেই শুয়ে পড়ে। কারণ, ও ভালো করে জানে, এ-ঘরে চুরি করার মতো কিছু নেই।

রোহন কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে আমি আবার ওর নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু তিনবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে দরজায় বেশ জোরে দুবার ধাক্কা দিলাম।

ঠং করে ছিটকিনিটা পড়ে গেল। নাকি রোহনই ছিটকিনিটা ওরকম আওয়াজ করে খুলল কি না কে জানে!

এবারে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। নাকে এল সিগারেটের গন্ধ। আমার সিগারেট-বিড়ির অভ্যেস নেই বলে গন্ধটা বেশ চড়া লাগল।

'রোহন—!'

কেউ সাড়া দিল না। অথচ তক্তপোশের দিক থেকে সামান্য নড়াচড়ার

শব্দ পাচ্ছিলাম।

চাপা টেনশানে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। তাই আর দেরি না করে ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। তারপর স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম নীল রঙের মশারিটার দিকে।

মশারির ভেতরে কিছু একটা নড়ছে। কারণ, মাঝে-মাঝেই মশারিটা জায়গায়-জায়গায় ফুলে উঠছে। ওটার নীল রঙের কাপড় ভেদ করে ভেতরটা কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকারহীন একটা কালচে ছায়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আমি আবার রোহনের নাম ধরে ডাকলাম, 'রোহন! রোহন!'

মশারির ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না। তবে এলোমেলো নড়াচড়াটা চলতেই লাগল।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। মনের ভেতরে ভয় আর কৌতূহলের টানাপোড়েন চলছিল। মনে হল, রোহন আমাকে নিয়ে এ কী রসিকতা করছে!

তাই 'রোহন' বলে ডেকে উঠে ছুটে চলে গেলাম মশারির কাছে। এক হ্যাঁচকায় মশারিটা টান মেরে খুলে দিলাম।

মশারির ভেতরে কেউ নেই! সব শূন্য!

পাগলের মতো টানহ্যাঁচড়া করে দড়ি-টরি ছিঁড়ে মশারিটা দু-হাতে খামচে ধরলাম বুকে। উত্তেজনায় বড়-বড় শ্বাস দিতে লাগলাম।

কোথায় গেল রোহন?

ওই তো, মেঝেতে ওর হাওয়াই চটিজোড়া পড়ে আছে। ওই যে, দেওয়ালের কাছে দাঁড় করানো রয়েছে ওর সবুজ রঙের ভি. আই. পি. সুটকেস। এগুলো ফেলে রেখে কোথায় উধাও হল ও? তা ছাড়া গেলই-বা কোথা দিয়ে? ওর ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল!

আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলাম। রক্তের দাগে লাগা এই ভয়ংকর মশারিটা নিশ্চয়ই রোহনকে...।

না, না—এ অসম্ভব!

আর ভাবতে পারলাম না। এই হতচ্ছাড়া মশারিটাকে আগে আমি পুড়িয়ে ছাই করব। তারপর রোহনকে খুঁজব। থানা-পুলিশ করব। কাগজে আর টিভি-তে বিজ্ঞাপন দেব। যে-করে হোক রোহনকে আমি খুঁজে বের করবই।

কিন্তু আগে মশারিটার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষুনি।

মশারিটাকে প্রাণপণে জাপটে ধরে ছুটে চলে এলাম আমার ঘরে। ড্রয়ার থেকে লাইটার বের করে নিয়ে রওনা দিলাম তেতলার ছাদের দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হল, মশারিটা সাপের মতো নড়ছে, আমার

হাতের বাঁধন ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

আমি আরও জোরে ওটাকে আঁকড়ে ধরলাম। প্রচণ্ড ভয় থেকে এক অদ্ভুত মরিয়া শক্তি আমার ভেতরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই শক্তির জোরেই ছাদে এসে পড়লাম।

মশারিটাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে সঙ্গে-সঙ্গে লাইটার জ্বেলে ধরলাম ওটার গায়ে।

মশারিটা জ্বলতে শুরু করল।

আমি একটু দূরে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। দেখতে লাগলাম, একটা অশুভ অলৌকিক'শক্তি জ্বলছে, পুড়ছে। কালো ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

আকাশের চাঁদ-তারা আর রাতের বাতাস এই অন্ত্যেষ্টির সাক্ষী হয়ে রইল।

হঠাৎই এক অদ্ভুত ক্লান্তি আমাকে জড়িয়ে ধরল। তন্দ্রার টানে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে চাইল।

আর ঠিক তখনই আমাকে চমকে দিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল কেউ।

'উঃ! জ্বলে যাচ্ছি...পুড়ে যাচ্ছি...। পেরো, আমাকে বাঁচা! পেরো, প্লিজ, বাঁচা আমাকে...।'

রোহনের গলা আমার কানে গরম সীসে হয়ে ঢুকে পড়ল। আমি দু-কানে আঙুল গুঁজে দিলাম। আতঙ্কে চোখ বুজে ফেললাম।

কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই!

মশারিটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে যাক।

# চ্যানেল এক্স

রাত আটটা নাগাদ বাড়ি ফেরামাত্রই শাশুড়িমা বললেন, বাবাজীবন, আজ পঞ্চাশটাকা উপার্জন করিয়াছি। টিভি হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

আমি গা থেকে ঘামে ভেজা শার্টটা খুলতে যাচ্ছিলাম—ওঁর কথা শুনে স্ট্যাচু হয়ে গেলাম।

না, শাশুড়িমার সাধুভাষা শুনে আমি অবাক হইনি। কারণ তাপসীর সঙ্গে আমার বিয়ের পর থেকেই এই পিকিউলিয়ার সাধুভাষার চচ্চড়ি শুনে আসছি। আমি অবাক হয়েছি ওই পঞ্চাশটাকা উপার্জনের কেসটা শুনে।

টিভি হইতে টাকা খসিয়া পড়িয়াছে? এ তো বড় রঙ্গ জাদু!

আমার শাশুড়িমা রোগাপাতলা ছোটখাটো মানুষ। টকটকে ফরসা গায়ের রং। তবে বয়েসের জন্যে চামড়ায় অনেক ভাঁজ। ওঁর যখন চোদ্দো বছর বয়েস তখন ওঁর গা ঘেঁষে বাজ পড়েছিল। ঘোর বর্ষার রাতে দেশের বাড়িতে কুয়োতলায় জল তুলতে গিয়েছিলেন। তখনই ওই বাজ পড়ে। উনি ছিটকে গিয়ে পড়েছিলেন পাশের কলাগাছের ওপর। এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

একঘণ্টা পর যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি দিব্যি সুস্থ মানুষ। গায়ে সেরকম কোনও কাটাছেঁড়া নেই। শুধু কথাবার্তা বলতে শুরু করেন সাধুভাষায়। আর মাথায় একটু মাটো হয়ে যান।

অনেক ডাক্তার-বদ্যি করেও এই সমস্যা সল্‌ভ করা যায়নি। সেকালের একজন নামকরা ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, কুয়োতলায় যাওয়ার আগে পেশেন্ট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়ছিল। তারই একটা পারমানেন্ট সিগনেচার পেশেন্টের ব্রেনের ওপরে পড়ে গেছে।

বয়েসকালে আমার শাশুড়িমা দেখতে নাকি ব্যাপক সুন্দরী ছিলেন। এ-কথা তাপসীর মুখে শুনে-শুনে আমার কান পচে গেছে। একদিন আমি রাগের মাথায় বলেই বসেছি, তোমাকে দেখে সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না।

তবে তাপসীকে যা-ই বলি, শাশুড়িমা সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। নইলে আঠেরো বছর বয়েসে ওই সাধুভাষার প্রবলেম থাকা সত্ত্বেও ওঁর সঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের বিয়ে হয়েছিল কেমন করে!

আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন অনেক আগে। মানে, তাপসীর সঙ্গে আমার বিয়ের অন্তত দশ বছর আগে। তিনি বেশ জাঁদরেল উকিল ছিলেন। সেটা

তাপসীকে দেখে বেশ বোঝা যায়। ওর মধ্যে ওকালতির অনেক গুণ আছে। শুধু আমরা দারিদ্র্যরেখার কাছাকাছি লোক বলে ওর গুণগুলো তেমন জ্বালাময়ী স্টাইলে প্রকাশিত হতে পারেনি।

আমি, তাপসী, আর আমার শাশুড়িমা—আমরা একসঙ্গে থাকি। একটা পুরোনো বাড়ির নোনাধরা আড়াইখানা ঘরে। ইংরেজিতে এরই নাম 'ফ্ল্যাট'। বহুকাল ধরে এই আস্তানায় আছি বলে আজকের আগুন বাজারেও বাড়িভাড়াটা প্রতিমাসে ম্যানেজ করতে পারছি।

তাপসী খুব স্বপ্ন দ্যাখে যে, আমরা ভালো জায়গায় থাকছি, ভালো-মন্দ খাচ্ছি, এদিক-ওদিক উড়ে-ঘুরে বেড়াচ্ছি। এভাবে দুঃখে-কষ্টে চিরকাল যাবে না। দিন বদলাবেই।

আমি একসময় স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু এখন আর দেখি না। এখন মুখের ভেতরটা সবসময় টক-টক হয়ে থাকে। আর মেজাজটা তেতো।

শাশুড়িমার কথায় প্রথম অবাক হলাম, তারপর মাথার ভেতরটা চড়াং করে উঠল। টাকার টানাটানি নিয়ে তাপসীর সঙ্গে দিন-রাত খচরমচর করি বটে, কিন্তু তাই বলে এরকম হ্যাটা দেওয়া রসিকতা! তাও আবার শাশুড়ির কাছ থেকে!

ভেতরের খ্যাপা রাগটাকে কোঁত করে গিলে ফেললাম। তারপর মুখ এবং গলার স্বর যথেষ্ট মোলায়েম করে অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, বলেন কী, মা! পঞ্চাশ টাকা...টিভি থেকে খসে পড়েছে?

চোখ গোল-গোল করলেন আমার রোগা তুলতুলে শাশুড়ি। তারপর সাধুভাষায় যা মেসেজ দিলেন তা ডিকোড করলে এইরকম দাঁড়ায় :

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার শাশুড়ি ঘণ্টাদুয়েক দিবানিদ্রা দেন। ওঁর একটু দুঃস্বপ্ন দেখার রোগ আছে। প্রায়ই ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠেন, ধড়ফড় করে উঠে বসেন। আজ দুপুরে কী একটা বাজে স্বপ্ন দেখে উনি সাড়ে তিনটে নাগাদ জেগে ওঠেন। তারপর একচিলতে খাওয়ার ঘরে বসে ঘুমচোখে টিভি দেখার মহান কাজ শুরু করেন। তাপসী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

টিভিতে কী একটা সিনেমা দেখাচ্ছিল। ভূতের কী যেন। শাশুড়ি বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখছিলেন। হঠাৎই পর্দায় বাজ পড়ার মতো শব্দ আর আলোর ঝলক দেখা গেল। চোদ্দো বছর বয়েসের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় শাশুড়ি এক প্রবল চিৎকার করে উঠেছিলেন। সেই চিৎকারে পাশের ঘরে তাপসীর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙেই ও 'চোর! চোর!' বলে চেঁচাতে শুরু করে। কারণ, ওর মনে হয়েছিল, নির্জন দুপুরে বাড়িতে চোর ঢুকেছে।

এদিকে শাশুড়ি টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, ওই বার দু-তিনেক আলোর ঝলকের পরই টিভির চ্যানেলগুলো কীরকম যেন ওলটপালট হয়ে যায়। সিনেমাটা বদলে গিয়ে অন্য কী একটা ছবি শুরু হয়ে যায়। তখন শাশুড়িমা খেয়াল করেছিলেন যে, পরদার এককোণে লেখা রয়েছে 'চ্যানেল এক্স'। অথচ এই নামে কোনও চ্যানেল আছে বলে তিনি কখনও শোনেননি বা দেখেননি।

এই নতুন সিনেমাটায় একজন মোটা কালোমতন লোক অনেকগুলো টাকা গুনছিল। সব পঞ্চাশটাকার নোট। তখনই একটা নোট সেখান থেকে খসে পড়ে যায়। সেই খসে-পড়া নোটটা হাওয়ায় লাট খেতে-খেতে টিভির পরদা ভেদ করে ঘরের মধ্যে এসে পড়ে। শাশুড়িমা সেটা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নেন। তখনই আবার বাজ পড়ার শব্দ হয় এবং টিভিতে চোখ ঝলসানো আলোর ঝিলিক দেখা যায়। একইসঙ্গে আগের সিনেমাটা আবার ফিরে আসে। সবকিছু আবার শান্তশিষ্ট এবং নরমাল হয়ে যায়।

তাপসী পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দ্যাখে ওর মায়ের হাতে পঞ্চাশটাকার একটা কড়কড়ে নোট। ওর মা ফ্যালফ্যাল করে টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন।

এরপর মা ও মেয়ে অনেক আশা নিয়ে টিভির সামনে হা-পিত্যেশ করে বসে থেকেছে কিন্তু শিকে ছেঁড়েনি। সব চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখেছে, চুলচেরা সূক্ষ্ম নানান পরীক্ষা করেছে, কিন্তু চ্যানেল এক্স আর দেখা দেয়নি।

সব কাজ ফেলে রেখে আমি একটা লজঝড়ে মোড়া টেনে নিয়ে শাশুড়িমার কাছে বসলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার খ্যাপা মনটাকে শান্ত করতে চাইলাম। তারপর বললাম, তপু কোথায়?

শাশুড়িমা বললেন, মম কন্যা নিকটেই এক সুহৃদের বাড়িতে গিয়াছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলিয়া আসিবে।

হুম। তা পঞ্চাশটাকার নোটটা কোথায়?

এই যে, বাবাজীবন—মম অঞ্চলে।—এ-কথা বলে শাশুড়ি শাড়ির আঁচলের গেঁট খুলতে শুরু করলেন। তখনই খেয়াল হল, অঞ্চল মানে আঁচল।

ছত্তিরিশ ভাঁজ করা পঞ্চাশটাকার নোটটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলাম। আলোর দিকে উঁচিয়ে ধরে চোখ ছোট-বড় করে ব্যাপক পরীক্ষা চালালাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। মালটা স্রেফ একটা অর্ডিনারি পঞ্চাশটাকার নোট। কোনও স্পেশাল ব্যাপার নেই।

এটা আমার কাছে থাক, বলে নোটটা প্যান্টের পকেটে চালান করে দিলাম। তারপর নড়েচড়ে বসে শাশুড়িমা-কে প্রাণপণ জেরা শুরু করলাম।

কোনও লাভ হল না।

আমার শাশুড়ি একই বক্তব্যে অচল-অনড় রইলেন। মিনমিনে কাহিল গলায় একই কথা বারবার বলে চললেন। শেষে একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, যতই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করো, বাবাজীবন—টিভি হইতে টাকা খসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্র-সূর্য যেরূপ সত্য, ইহাও তদ্রূপ—চূড়ান্ত সত্য।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি শাশুড়িকে ছেড়ে টিভি নিয়ে পড়লাম। ওটা নানানভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম। টিভির পেছনটা ভালো করে চেক করলাম। নাঃ, কিচ্ছু নেই।

সুতরাং এবার টিভিটা অন করে চ্যানেল সার্ফ করতে লাগলাম। একবার সামনে গেলাম, একবার পেছনে গেলাম।

না, চ্যানেল এক্স নামে কোনও চ্যানেল নেই।

তা হলে এই আজব কেসটার মানে কী?

ভেবে-ভেবে কোনও কূলকিনারা না পেয়ে লাস্টে মনে হল, শালা পঞ্চাশটাকার নোটটাতো রিয়েল! যদি এইভাবে মাঝে-মধ্যে টিভি থেকে নোটপানি পড়ে তা হলে খারাপ কী! দেখতে-দেখতে টিভির দামই উঠে যাবে।

আপনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে জামা-প্যান্ট ছাড়তে শোওয়ার ঘরে গেলাম।

পাশের ঘর থেকে শাশুড়িমা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি কি চা পান করিবে?

আমি বললাম, না, আপনার মেয়ে আসুক...তারপর।

জামা-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে নিলাম। চোখে-মুখে জল দিয়ে বিছানার একপাশে বসে নোনা ধরা দেওয়ালে হেলান দিলাম। চোখ বুজে গোটা ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করলাম।

পাশের ঘরে টিভি চলছে। শাশুড়িমা ওঁর পুরোনো কাজে ফিরে গেছেন। তাপসী ওর আড্ডা সেরে কখন আসবে কে জানে!

কে যেন ডাকল, গায়ে ঠোকা দিল।

তন্দ্রায় চোখ লেগে গিয়েছিল। চোখ খুলেই দেখি তাপসী।

শুনেছ, আজ কী হয়েছে?

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, সব শুনেছি। মা বলেছে।

এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।—হাতজোড় করে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকাল তাপসী। সেখানে কড়ি-বরগার মাঝে একটা বড়সড় টিকটিকি

চুপচাপ সেঁটে আছে।

ওটার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম, কখন যে তিনি কী রূপে থাকেন!

তাপসী বাচ্চা মেয়ের মতো একগাল হেসে বলল, আমরা খুব লাকি, তাই না? এত লোকের বাড়িতে টিভি—কই কারও টিভি থেকে কখনও টাকা পড়েছে বলে তো শুনিনি। আমি সেই কথাটাই ছোটনের মা-কে বলছিলাম।

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, কেন বলতে গেলে? ওরা যদি পুলিশ-টুলিশে খবর দেয় তা হলে কেলো হয়ে যাবে। ওরা এসে হয়তো টিভিটা-ই নিয়ে চলে যাবে—।

তাপসী ব্যাপারটা বুঝল। চোখ বড়-বড় করে বলল, ঠিকই বলেছ তো! আমি একটু কাঁচা কাজ করে ফেলেছি।—একটু ভেবে আরও বলল, যাকগে, কাল গিয়ে বলে দেব যে, আমি স্রেফ মজা করার জন্যে ও-কথা বলেছিলাম। আর মা-কেও বারণ করে দেব।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। তারপর চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, কিন্তু কেসটা কী বলো তো? এত লোকের টিভি থাকতে শেষকালে আমাদের টিভিতেই...।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।—কপালে আঙুল ঠেকাল তাপসী।

আমি ওকে বললাম, আমাকে একটু চা খাওয়াও। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।

চা খেতে-খেতে আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা চালালাম, কিন্তু কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, টিভিটা যথাসম্ভব চালু রাখতে হবে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, ইলেকট্রিক বিলটা তো অনেক বেড়ে যাবে!

কারণ, এমনিতেই আমি ঘন-ঘন সবুজ রঙের বিলে অভ্যস্ত। তার ওপর চ্যানেল এক্স...।

তাপসী পালটা জবাব দিল, দু-তিনদিন দেখি না! যদি টাকাপয়সা কিছু না পাই তা হলে একটানা আর চালাব না।

ভেতরে-ভেতরে লোভের সুড়সুড়িটা আমিও টের পাচ্ছিলাম। সুতরাং রাজি হয়ে গেলাম। যদি কপাল ভালো থাকে তাহলে শুধু টিভির দাম কেন, ইলেকট্রিক বিলের পয়সাও এই চ্যানেল এক্স থেকে উশুল হয়ে যাবে।

কিন্তু হল না।

তবে তার বদলে যা হল সেটা অসভ্যরকমের মারাত্মক।

সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে না দিতেই শাশুড়িমার অভিযোগ : শোনো, বাবাজীবন—টিভি হইতে এক বেআক্কেলে যুবক আমাকে চক্ষু মারিয়াছে।

সঙ্গে-সঙ্গে বিষম খেলাম আমি। হাত থেকে চা-সমেত কাপ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। আর কাশতে-কাশতে আমার দম বেরোনোর জোগাড়।

আমার বৃদ্ধা শাশুড়িমা-কে চোখ মেরেছে এক বেআক্কেলে যুবক!

তাপসী চায়ে চিনি মেশাতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। তাই ও মায়ের কথাটা ভালো করে শুনতে পায়নি। রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কী করেছে, মা—কী করেছে?

কী আর করিবে! চক্ষু মারিয়াছে।

শুনে তাপসী থ। আর আমার অবস্থা 'ধরণী দ্বিধা হও' টাইপের।

কী লজ্জা, কী লজ্জা!

আমি কোনওরকমের শোওয়ার ঘরে পালালাম। সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছি, তাপসী ওর বৃদ্ধা মা-কে জেরা শুরু করেছে।

আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। চ্যানেল এক্স-এর জ্বালাতন নিয়ে এখন কী করি! দু-দিন একটানা টিভি চালিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও ফায়দা হয়নি। তখন নরমাল স্টাইলে চলে এসেছি বটে কিন্তু টিভির দিকে কড়া নজর রেখে চলেছি। আমার বা তাপসীর চোখে সেরকম কিছু পড়েনি। কিন্তু পড়ল তো পড়ল গিয়ে ওর মায়ের চোখে!

তা হলে চ্যানেল এক্স-এর ভূত কি শুধু আমার বৃদ্ধা শাশুড়িমা-কে টার্গেট করেছে?

আমি যে ভুল ভেবেছি সেটা বোঝা গেল তিনদিনের মধ্যেই।

চ্যানেল এক্স-এর কীর্তি প্রথম দেখল তাপসী। আর তারপরে আমি।

সেদিনটা ছিল রবিবার। আমি সন্ধেবেলা এই সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ মুদিখানা থেকে গুঁড়ো সাবান, আটা, বিস্কুট, ছোলা এইসব কয়েকটা টুকিটাকি কিনে ঘরে ঢুকেছি। তাপসী টিভিতে কী একটা সিরিয়াল দেখছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, রান্নাঘরে রাখো—আমি একটু পরেই উঠছি—সব গুছিয়ে রাখব।

আমি ওর কথামতো জিনিসগুলো রান্নাঘরের এককোণে মেঝেতে নামিয়ে রেখে কলতলায় হাত-মুখ ধুতে গেলাম। দেখলাম বাথরুমে আলো জ্বলছে,

দরজা বন্ধ। মানে, শাশুড়িমা ওখানে।

হঠাৎই তাপসীর চিৎকার শুনতে পেলাম : শিগগির এদিকে এসো—।

প্রায় ছুটে খাওয়ার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

আমাকে দেখেই তাপসী টিভির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখো! ওই দ্যাখো!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে টিভির দিকে তাকালাম। সেখানে তখন গানের সঙ্গে উদ্দাম নাচ চলছে। রঙিন আঁটোসাঁটো পোশাক পরে বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ে 'খাই-খাই' স্টাইলে নেচে চলেছে।

আজকাল এসব নাচ-গান মুড়িমুড়কি হয়ে গেছে। তাই ভুরু কুঁচকে তাপসীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম, চেঁচালে কেন? কী হয়েছে?

তাপসী অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল : চেঁচালাম কেন মানে?. চ্যানেলের নামটা দেখেছ? আমার কানে...।

ওর কথায় কান না দিয়ে টিভির দিকে আবার ভালো করে তাকালাম।

সত্যিই তো! ওপরে বাঁ-দিকের কোণে সুন্দর ঢঙে ইংরেজিতে লেখা 'চ্যানেল এক্স'।

আমি জিগ্যেস করলাম, শুধু চ্যানেলের নামটা দেখেই চেঁচালে?

তাপসী চোখ বড়-বড় করে বলল, না, না। নামটা তো পরে দেখলাম। এই যে সিরিয়ালটা এখন চলছে...।—টিভির দিকে আঙুল দেখিয়ে ও বলল, ওটা থেকে একটা লোক...ওই যে, বুড়োমতন কালো, মাথায় টাক...ওই লোকটা হঠাৎ আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, গোলাপি শাড়িটা আপনাকে হেভি মানিয়েছে। কিন্তু এককানের দুল কোথায় গেল?—ডানকানে দুল পরতে ভুলে গেছেন?—তক্ষুনি কানে হাত দিয়ে দেখি, সত্যিই তো! এককানে দুল পরতে ভুলে গেছি। আর গোলাপি শাড়িটা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ।

আমি হতভম্ব হয়ে তাপসীর পাশে বসে পড়লাম। ওর কথাগুলো যে সত্যি সেটা বুঝতেই পারছি, কিন্তু এখন কী করা?

টিভির দিকে তাকিয়ে চ্যানেল এক্স-এর প্রোগ্রাম দেখতে লাগলাম।

হঠাৎই বিজ্ঞাপনের ব্রেক শুরু হল। বিজ্ঞাপনে এমন সব প্রোডাক্টের কথা বলতে লাগল যেগুলোর নাম আমি কখনও শুনিনি। তারই মাঝে চ্যানেল এক্স-এর প্রচার শুরু হল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে চ্যানেলের গুণগান শুরু করল। ওরা বলতে লাগল : এরকম ইন্টারঅ্যাক্টিভ চ্যানেল এই প্রথম। আপনাদের সামনে যেসব প্রোগ্রাম আমরা সবসময় পেশ করব সেগুলো ইউনিক এবং হাইলি ইন্টাররঅ্যাক্টিভ। আপনি সবসময় আমাদের প্রোগ্রামের একটা

পার্ট। ইন ফ্যাক্ট, য়ু আর চ্যানেল এক্স। সো কিপ ওয়াচিং...।

এর পাঁচ-দশ সেকেন্ড পরেই আলোর ঝলকানি দিয়ে চ্যানেল এক্স উধাও।

সেদিন রাতে আমার কী যে মনে হল; খাওয়া-দাওয়ার পর টিভি দেখতে বসে গেলাম।

কতক্ষণ যে ঠায় টিভির সামনে বসেছিলাম জানি না। বোধহয় একটু তন্দ্রামতন এসে গিয়েছিল। হঠাৎই মনে হল কে যেন আমাকে ডাকছে : ও কাকু, শুনছেন? এই যে—।

চমকে উঠে চোখ খুললাম।

দেখি টিভির পরদায় বছরদশেকের একটা বাচ্চা ছেলে আমাকে ডাকছে।

আমাকে সজাগ হয়ে উঠতে দেখেই ছেলেটা বলল, কাকু, খেলতে-খেলতে বলটা পড়ে গেছে—একটু দিন না...আমার হাত যাচ্ছে না...।

ও মা! ছেলেটা টিভির পরদা থেকে হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। ওর ফরসা রোগা হাতটা আমার চোখের সামনে বেরিয়ে এল টিভির বাইরে। বলের সন্ধানে হাতড়াতে লাগল আমার ঘরের মেঝেতে।

তখন খেয়াল করলাম, সত্যি-সত্যিই একটা নীল রঙের বল মেঝেতে পড়ে আছে। কিন্তু বহু চেষ্টায় কাঁধ ঝুঁকিয়েও ছেলেটার হাতের আঙুল বল পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না।

আমি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম। বলটার কাছে গিয়ে ওটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলাম। তারপর আলতো করে টিভির পরদার দিকে ছুড়ে দিলাম। ছেলেটা চট করে বলটা লুফে নিল। হেসে বলল, থ্যাংক য়ু, আঙ্কল—।

টিভির পরদায় ছেলেটা বল নিয়ে লোফালুফির নানান কসরত দেখাতে লাগল। সেটাই তখনকার প্রোগ্রাম। দেখাচ্ছে চ্যানেল এক্স।

আমি কিন্তু মোটেই অবাক হলাম না কিংবা ভয়ও পেলাম না। মনে হল, ইন্টারঅ্যাক্টিভ চ্যানেল এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক।

তখনই টিভি থেকে আমার নাম ধরে কে যেন ডাকল।

ঘুরে তাকিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার ফণীবাবু—ফণীভূষণ পাত্র। আমার বাড়ি থেকে চারটে বাড়ি এগিয়ে বাঁদিকটায় ওঁর প্রেস ছিল। গতবছর ভদ্রলোক মিনিবাসের ধাক্কায় মারা গেছেন।

আমি এবার অবাক হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি তখনও আমাকে

নাম ধরে ডাকছেন। বলছেন, চলে এসো। এসো—এসো...।

তখনই দেখি ফণীবাবুর পাশে আমার মধুজ্যাঠা এসে দাঁড়িয়েছেন। মধুজ্যাঠা আমার দূরসম্পর্কের জ্যাঠামশাই ছিলেন। বসিরহাটে থাকতেন। তিনবছর আগে গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করেছেন।

মধুজ্যাঠাও আমাকে হাতছানি দিয়ে ফিসফিসে গলায় ডাকতে লাগলেন। বললেন, আয়, আয়—এখানে চলে আয়।

আমি এবার ভয় পেলাম। টিভির কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সরে এলাম।

দেখি কোথা থেকে যেন আরও অনেক পুরুষ-মহিলা মধুজ্যাঠা আর ফণীবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা সবাই ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ফণীবাবু বললেন, জানো, এরা সবাই অপঘাতে মারা গেছে—সবাই। কী কষ্ট ওদের!

মধুজ্যাঠা হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, আয়, চলে আয়। এদিকটাও খারাপ না...।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকারটা ঠিকঠাক বেরোল না। কেমন যেন ভাঙাচোরা কর্কশ—সাপ ব্যাং গিলে খাওয়ার সময় ব্যাং যেরকম ডাকে সেইরকম।

হঠাৎ চার-পাঁচটা হাত টিভির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। হাতগুলো অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে পৌঁছে গেল আমার কাছে। সাঁড়াশির মতো আমার হাত আঁকড়ে ধরল। এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক প্রচণ্ড টানে আমাকে নিয়ে গেল টিভির ভেতরে।

আমার কানে তখন ভেসে আসছিল চ্যানেল এক্স-এর প্রেজেন্টারের কথা : ...বিশ্বাস করুন, এরকম সুপার-ডুপার ইন্টারঅ্যাক্টিভ চ্যানেল আপনি আগে কখনও দেখেননি...।

# অনির্বাণ ছাই

আমাকে নামিয়ে দিয়ে লজ্‌ঝড়ে বাসটা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। ধুলোর কুয়াশা ফিকে হলে চোখের সামনে যা দেখলাম তা যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই টিয়াপাখি-রঙের ধানখেত। বিকেলের রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও বড়-বড় গাছ। দু-একটা পাকা বাড়ি।

পিচের রাস্তা থেকে একটা চওড়া মোরাম বিছানো পথ ডানদিকে চলে গেছে। সেই পথের পাশে একটা বড় জামগাছ। অনির্বাণ এই গাছটার কথা বলেছিল। বলেছিল, ওই গাছের নীচে ও দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু এতবছর পর ওকে কি আমি চিনতে পারব? ও-ও বোধহয় আমাকে চিনতে পারবে না। স্কুলে আমরা একসঙ্গে অনেক বছর পড়েছি বটে, কিন্তু স্কুল ছেড়েছি প্রায় বারো বছর হয়ে গেল। আমাদের দুজনের চেহারাই নিশ্চয়ই অনেক পালটে গেছে।

দেখলাম, গাছতলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা রোগা, কালো, মাথার চুল উড়ছে, হাতে ভাঁজ করা একটা কালো ছাতা। এছাড়া ধু-ধু রাস্তায় আর কেউ নেই। দুটো গাঙশালিক পথের ধারে ঘাসঝোপের মধ্যে খেলা করছিল।

আমি হাঁটতে-হাঁটতে পকেট থেকে সেলফোন বের করলাম। অনির্বাণের নম্বর দেখে ডায়াল করলাম।

দেখলাম, গাছতলার লোকটা পকেট থেকে ওর সেল বের করে কানে দিল।

আমি কথা বললাম, 'অনির্বাণ?'

'হ্যাঁ। তুই অনির্বাণ?'

'অফ কোর্স—অনির্বাণ নাম্বার ওয়ান।'

'আমি তোর জন্যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি। তুই কোথায়?'

'তোর দিকেই এগোচ্ছি—পায়ে হেঁটে।'

এ-কথা যখন বললাম তখন আমাদের মধ্যে মাত্র হাতপাঁচেকের তফাত।

গাছের ছায়ার ভেতরে ঢুকে পড়ে আমি লোকটার একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। সেলফোন অফ করে পকেটে ঢুকিয়ে অবাক সুরে চেঁচিয়ে বললাম, 'তুই অনির্বাণ দুই?'

লোকটা হেসে আমাকে বুকে জাপটে ধরে : 'ঠিক বলেছিস। আজ কতবছর পরে একের সঙ্গে দুইয়ের দেখা হল বল্ তো! ভীষণ ভালো লাগছে রে—নতুন করে আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

প্রথম আবেগের ঝাপটা কেটে গেলে হারানো বন্ধুর দিকে ভালো করে তাকালাম। ও-ও আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

স্কুলে আমাদের ক্লাসে একটা বিরল ঘটনা ছিলাম আমরা দুজন। কারণ, আমাদের দুজনেরই নাম অনির্বাণ সরকার। তাই গুলিয়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে স্কুলের স্যাররা কখন যেন আমাকে অনির্বাণ ওয়ান, আর ওকে অনির্বাণ টু করে দিয়েছিলেন। আমি মাথায় একটু বেশি লম্বা ছিলাম। হয়তো সেইজন্যেই 'ওয়ান' উপাধি পেয়েছিলাম। ক্লাসের বন্ধুরা সংক্ষেপে আমাদের বলত 'ওয়ান' আর 'টু'।

টু আমার চেয়ে মাথায় খাটো হলে কী হবে ওর মাথা—মানে, ব্রেন—ছিল নাম্বার ওয়ান। তা ছাড়া ওর রং ছিল টকটকে ফরসা, আর আমি তার ঠিক উলটো—একেবারে কেষ্ট ঠাকুর।

ক্লাসে আমাদের বন্ধুত্বটা কী করে যেন বেশ আঠালো হয়ে গিয়েছিল। মনের সব কথা আমি ওকে খুলে বলতাম। আর ও-ও আমাকে সব কথা খুলে বলত।

নীচু ক্লাস থেকে ওপরে উঠতে-উঠতে আমরা একইসঙ্গে বড় হচ্ছিলাম। সুখ-দুঃখগুলোকে নতুন করে চিনতে পারছিলাম, আর সেগুলো দুজনে মিলে ভাগ করে নিচ্ছিলাম। সবমিলিয়ে দিনগুলো বেশ কাটছিল।

তারপর স্কুল একদিন ফুরোল। চলে এল এক আর দুইয়ের ছাড়াছাড়ির দিন। বেশ মনে আছে, সেদিন স্কুল ছুটির পরে আমরা দুজনে বোসদের পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসেছিলাম। অনেক গল্প করেছিলাম। কেঁদেও ছিলাম।

আজও সব মনে আছে আমার।

তারপর কত মাস কত বছর যে কেটে গেছে! দুইয়ের কথা না ভুললেও স্মৃতির পাতা অনেকটা আবছা হয়ে এসেছিল। মনে-প্রাণে শুধু চাইতাম ও যেখানেই থাক খুশিতে থাক, আনন্দের ধুলো মাখা থাক ওর কপালে। কারণ, অনির্বাণ বেশিরভাগ সময়েই খুব মনমরা হয়ে থাকত। আর একটু যেন চাপা স্বভাবের ছিল।

কলেজের পাট শেষ করে আমি যখন চাকরি করছি তখন আমাদেরই এক স্কুলের বন্ধু কমলেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ও বলল, টু, ওয়ান তোকে ফোন করবে। কোত্থেকে যেন আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমাকে

ফোন করেছিল। নেক্সট উইকে শনিবার ওর বিয়ে। আমাকে যেতে বলেছে। তোকে বলবে। তবে আমার বোধহয় যাওয়া হবে না। কোন ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর—মানে, আসনপুর না কেশবপুর—কোথায় যেন থাকে। যাকগে, তোকে ও ফোন করবে।'

অনির্বাণ আমাকে ফোন করেছিল। বিয়েতে নেমন্তন্নও করেছিল। কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি। অফিসের কাজের চাপ আর কেশবপুরের দূরত্ব—এই দুটো ফ্যাক্টরই বাদ সেধেছিল।

বিয়েতে যাইনি বলে অনির্বাণ টু অভিমান করে আমাকে আর কখনও ফোন-টোন করেনি। আমিও সংকোচে ওকে ফোন করে উঠতে পারিনি।

এরপর বছর ছয়েক কেটে গেছে। ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কেমন একটা 'কিন্তু-কিন্তু' পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সময়টা কেটে গেছে। তারপর হঠাৎই ওর ফোন এল। মাত্র তিনদিন আগে।

'ওয়ান?'

'হ্যাঁ—।'

'টু বলছি।'

'অনির্বাণ। কেমন আছিস? শোন, আমি এক্সট্রিম্‌লি সরি। তোর বিয়েতে যেতে পারিনি রে। এমন কাজের প্রেশার পড়ল যে, কী আর বলব। আমি...।'

'ওসব ফালতু কথা ছাড়, ওয়ান।' আমাকে রুক্ষভাবে থামিয়ে দিল অনির্বাণ : 'ওসব তো হাফডজন বছরের পুরোনো কথা। আজ খুব জরুরি দরকারে তোকে ফোন করেছি। তোকে আমার বাড়িতে একবার আসতেই হবে। ভীষণ দরকার। কবে আসবি বল?

আমি ওকে আশস্ত করার জন্যে বললাম, 'যাব, যাব। কিন্তু তোর কী হয়েছে বল তো? তোর কথা শুনে তোকে ভীষণ আপসেট বলে মনে হচ্ছে...।'

'তুই এলে সব বলব। তোর কাছে তো আমার গোপন কিছুই নেই! বল, কবে আসবি?'

একটু চিন্তা করে আমি বললাম, 'পরশু যাব। তো তোর ফ্যামিলি লাইফ কেমন চলছে বল। ওয়াইফ কেমন আছে? ছেলেমেয়ে ক'টা?'

অনির্বাণ টু চুপ করে গেল। কয়েকসেকেন্ড পর একটু যেন বিষণ্ণ গলায় বলল, 'ওদের নিয়েই তো প্রবলেম। ওয়াইফ...আর আমার চার বছরের ফুটফুটে মেয়েটা। তুই পরশু আয়, ওয়ান। আমাকে ঝোলাস না যেন! তুই এলে সব বলব। তোর হেল্‌প না পেলে আমার সর্বনাশ হবে...।'

আরও কয়েকটা কথার পর আমি শপথ করে বলেছিলাম, '...পরশু বিকেলে

তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রমিস।'

'থ্যাংক য়ু, ভাই। আমি তোর জন্যে কেশবপুর মোড়ে জামগাছতলায় ওয়েট করব...।'

এখন জামগাছতলায় দাঁড়ানো লোকটাকে আমি খুঁটিয়ে দেখছিলাম। নাঃ, অনির্বাণ টু আগের চেয়ে অনেক কালো হয়ে গেছে। চেহারাও অনেক শুকিয়ে গেছে। এই বয়েসেই গাল বসে গেছে। ঠোঁট খসখসে। চোখগুলো বড় বেশি সাদাটে।

ও আমাকে বাড়ির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমি বারবার বারণ করা সত্ত্বেও ছাতাটা খুলে মাথার ওপরে ধরে রইল।

চওড়া রাস্তা ছেড়ে আমরা সরু পথে ঢুকে পড়লাম। দুপাশে বাঁশগাছ, জবাফুলের গাছ, ভেরেন্ডার বেড়া। কয়েকটা ছোট-ছোট ডোবা। সেখানে লুকোনো চুনোমাছ বুড়বুড়ি কাটছে।

পথে বেশ কয়েকটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল। বাখারির কাঠামোয় গোবর আর মাটির চাপান দেওয়া দেওয়াল। কোথাও-কোথাও মাটির চাঙড় খসে পড়েছে। সেই কুঁড়েঘরের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল।

উঁচু-নীচু কাঁচা পথ পেরিয়ে একটা সমতল মাটির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। আরও একটু এগোতেই একটা মামুলি দোতলা বাড়ি। তার একটা অংশ পুড়ে কালচে হয়ে ধসে পড়েছে।

সেই বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অনির্বাণ টু বলল, 'আয়, এটাই আমার বাড়ি। দেখেছিস, কীরকম ড্যামেজ হয়ে গেছে!'

পথে আসার সময় অনির্বাণ ওর স্ত্রী আর মেয়ের কথা বলছিল। কাঞ্চন আর কাঞ্চি। ওদের নিয়ে একসঙ্গে বেঁচে থাকাটাই একটা স্বপ্নের মতো। কী দারুণ জীবন! অনেক ভাগ্য করে মানুষ এরকম জীবন পায়। আরও কত ভালো-ভালো কথা।

ওর কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল এবার বাবা-মায়ের কথা মেনে নিয়ে বিয়েটা করে নিলেই হয়! স্বপ্নের মতো দারুণ জীবন তো সবাই চায়!

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই কেমন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ পেলাম। দুধ উথলে উনুনে পড়লে যেমন পোড়া গন্ধ বেরোয়।

আমি নাক টেনে গন্ধটা কোনদিক থেকে আসছে সেটা ঠাওর করতে চেষ্টা করছিলাম। অনির্বাণকে জিগ্যেস করলাম, 'কী পুড়ছে রে?'

ও নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'আমার বাড়ি। বাড়িটা পুড়ছে।'

আমি ওর ঠাট্টার মানে বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

মনে হল মুখটা যেন বিষণ্ণ মনে হল মুখটা যেন বিষণ্ণ পাথর দিয়ে তৈরি।

বাড়িতে ঢুকে অনির্বাণ দোতলার সিঁড়ি দিকে এগোল। আমি বাধ্য অতিথির মতো ওর পিছু নিলাম। আমাদের পায়ের শব্দ কেমন যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

আমি কান পেতে কাঞ্চন বা কাঞ্চির গলার আওয়াজ শুনতে চাইলাম, কিন্তু পেলাম না। লক্ষ করলাম, যে-অনির্বাণ এতক্ষণ ধরে এত কথা বলছিল সে বাড়িতে ঢোকার পর থেকে কীরকম যেন চুপচাপ হয়ে গেছে।

আমরা দোতলায় উঠে এলাম।

সামনেই চওড়া বারান্দা। চকচকে লাল মেঝে। রেলিঙের ওপরে গ্রিল দেওয়া।

বারান্দার ডানদিকে একটা পোড়া দরজা। সেটা পেরিয়ে একটা ঘর। তার দেওয়ালগুলো কালো, ফাটল ধরা, কোথাও-কোথাও ধসে পড়েছে।

পোড়া গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে নাকে ধাক্কা মারল।

সেই ঘরটার মধ্যে আমাকে নিয়ে ঢুকল অনির্বাণ। সঙ্গে-সঙ্গে পোড়া গন্ধটা শ্মশানের গন্ধ হয়ে গেল।

আমার চারপাশে পোড়া ক্যালেন্ডার, পোড়া দেওয়াল-ঘড়ি, পোড়া খাট-বিছানা, পোড়া জানলা, পোড়া আলনার জামাকাপড়, পোড়া ড্রেসিংটেবিল, আর পোড়া ফটোগ্রাফ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

অনেকক্ষণ পর প্রায় ফিসফিস করে ওকে জিগ্যেস করলাম, 'কবে হল?'

ও বলল, 'হয়েছে। দাঁড়া, তোকে একটা জিনিস দেখাই। যে জন্যে তোকে এতদূর ডেকে এনেছি...।'

কথাগুলো বলতে-বলতেই ঘরটার আর-একটা পোড়া দরজা দিয়ে অনির্বাণ টু চট করে কোথায় চলে গেল।

আমার কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগছিল। লোকের বাড়িতে এলে আগে লোকে একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করে, চা-টা দেয়—তারপর...। তার বদলে ও এসব কী করছে!

বাড়িটায় কোনও লোকজনের আওয়াজ নেই। চারপাশে পোড়া গন্ধ। ওর আচরণও কেমন অদ্ভুত। তা ছাড়া...।

একটা টিনের বাক্স হাতে ফিরে এল অনির্বাণ। বাক্সটা কালচে, তোবড়ানো। জুতোর বাক্সের চেয়ে মাপে খানিকটা বড়। দেখেই বোঝা যায় বাক্সটা অনেকে

পুরোনো।

অনির্বাণ বিষণ্ণ গলায় বলল, 'ওয়ান, তোকে এটা দেব বলে এতদিন ওয়েট করেছি। স্কুলে তুই আর আমি ছিলাম যাকে বলে হরিহর আত্মা। তাই এটা আমি তোর জন্যে রেখেছি। তুই এটার একটা গতি না করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। প্লিজ, ওয়ান, তুই আমাকে এইটুকু হেল্‌প কর...।'

বাক্সটা ও আমার হাতে দিল। আমি ওর কথা শুনতে-শুনতে যেন হিপনোটাইজড্‌ হয়ে গিয়েছিলাম। রোবটের মতো হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিলাম।

বাক্সটা বেশ হালকা কিন্তু হাতে গরম ঠেকল। হাত পুড়ে যাওয়ার মতো নয়, কিন্তু বেশ গরম।

কী আছে বাক্সের ভেতরে?

সেই প্রশ্নটাই করলাম ওকে, 'এর ভেতরে কী আছে রে?'

অনির্বাণ প্রশ্ন শুনে উসখুস করে উঠল। বারকয়েক মেঝের দিকে তাকাল। আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে নখের ডগা খুঁটতে লাগল।

'কী আছে বলবি তো!'

একটু ইতস্তত করে ও বিড়বিড় করে বলল, 'ওয়ান, কিছুদিন আগে আমার ফ্যামিলিতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। আচমকা এই ঘরটায় আগুন লেগে যায়। আমি বাড়িতে ছিলাম না। তারকেশ্বরে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ফিরে দেখি সব শেষ। কাঞ্চন...আর কাঞ্চি...আমার পুতুলের মতো ফুটফুটে মেয়েটা...ওরা আর নেই। আগুন...আগুন ওদের খেয়ে ফেলেছে...খেয়ে চেটেপুটে সব শেষ। শেষ!' কথা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল অনির্বাণ।

'সে কী রে! বলিস কী! আশপাশের কেউ কিছু করতে পারল না?'

মাথা নাড়ল অনির্বাণ : 'নাঃ। কিছু করে ওঠার আগেই সব শেষ। সব জ্বলে-পুড়ে খাক।'

হঠাৎই ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে এল। একইসঙ্গে মেঘের ডাক কানে এল।

অবাক হয়ে একটা জানলার দিকে তাকালাম।

আশ্চর্য! একটু আগেই খোলা জানলা দিয়ে একটা নারকেল গাছ আর বিকেলের রোদ দেখা যাচ্ছিল—এখন নারকেল গাছটা আছে, তবে রোদ লুকিয়ে পড়েছে। আর গাছটাও অস্পষ্ট, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

অনির্বাণ দেওয়ালের পোড়া সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে বোধহয় একটা সুইচ টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাল্‌ব হলদেটে আলো ছড়িয়ে দিল ঘরে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। পোড়া ঘর, বাইরের আঁধার, বাল্‌বের আলোয়

তৈরি হওয়া কালো-কালো ছায়া, আর সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা অন্যরকম অনির্বাণ আমাকে কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিল।

'কী আছে এই বাক্সের ভেতরে?' ফাঁপা গলায় ওকে প্রশ্ন করলাম।

'বাক্স খুলে দেখ...।'

আমার ভেতরে একটা জেদ তৈরি হচ্ছিল। ভয় পেলেও সেই জেদের জোরেই একটানে বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেললাম।

বাক্স ভরতি কালো ছাই।

'ওগুলো কাঞ্চন আর কাঞ্চির ছাই...।' অনির্বাণ টু বলল।

আমি সম্মোহিতের মতো ছাইগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'এগুলো তুই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিস...।' ঠোঁট টিপে ও কান্না চাপতে চাইল। তারপর আর্ত সুরে বলল, 'দিবি তো?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ—দেব।' তবে একইসঙ্গে ভাবছিলাম, ওর বউ আর মেয়ে কবে আগুনে পুড়ে মারা গেছে? ও বলছিল, 'কিছুদিন আগে।' তা হলে ছাইগুলো এখনও গরম থাকে কেমন করে?

আমার অবাক ভাবটা অনির্বাণের চোখে পড়ল। ও বলল, 'ভাবছিস ছাইগুলো এখনও গরম আছে কেমন করে, তাই না? তা হলে শোন, ওই ছাইয়ের আগুন এখনও নেভেনি। এখনও আমি জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তোর যদি এমন হত তুই কী করতিস? যদি তোর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ দুজন এরকম আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যেত তা হলে তোর মনের অবস্থাটা কী হত? বল, সত্যি করে বল। একটিবার বল...।'

ওর প্রত্যাশা ভরা সজল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল। কে যেন আমাকে দিয়ে আচমকা বলিয়ে নিল, 'কিছু মনে করিস না। ওরকম হলে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করত না....।'

'ঠিক বলেছিস।' তর্জনী তুলে উত্তেজিতভাবে সায় দিল অনির্বাণ। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে ওর জিভ জড়িয়ে গেল: 'তাই কী করেছিলাম জানিস?' কথাটা বলেই ও একছুটে ভেতরের দরজা পেরিয়ে কোথায় চলে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা প্লাস্টিকের জেরিক্যান হাতে আবার ঘরে ফিরে এল। ক্যানের ছিপি খুলতে-খুলতে বলল, 'কেরোসিন নিয়ে নিজের গায়ে-মাথায় ঢালতে শুরু করেছিলাম.....' জেরিক্যান উলটে পাগলের মতো নিজের শরীরে কেরোসিন ঢালতে লাগল ও। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলতে লাগল, 'এই যে—এইভাবে। এইভাবে......ঢালছিলাম....।'

কেরোসিনে ওর মাথার চুল ভিজে গেল। ভিজে গেল সারা শরীর, গায়ের

জামাকাপড়। ঘরের মেঝেতে কেরোসিনের বন্যা বয়ে গেল। তীব্র গন্ধে চারদিক ভেসে গেল।

'অনির্বাণ! অনির্বাণ! কী করছিস তুই?' আমি ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলাম।

আমার চিৎকার অনির্বাণ টু শুনতে পেল বলে মনে হল না। কেরোসিনের ক্যানটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে তরলের শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত নিজের গায়ে ঢেলে দিচ্ছিল।

'...তারপর ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে দেশলাইটা নিয়ে এলাম...' কথা বলতে-বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল ও। এবং কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে ফিরে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'তারপর...তারপর...।'

ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল। তার সঙ্গে জ্বলে উঠল অনির্বাণ। দাউদাউ আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাক হতে লাগল।

হঠাৎই এক দমকা বাতাস কোথা থেকে যেন ছুটে এল। ঘরের ভেতরে পাগল করা ঝড় তুলল। সেই ঝড়ে আমার হাতে ধরা বাক্সের ছাই উড়তে লাগল। ছাইয়ের গুঁড়োয় তৈরি কালো মেঘখ্যাপা মোষের মতো ঘরের বাতাসে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

উড়ে বেড়ানো ছাইয়ের কালো কুয়াশা ভেদ করে জ্বলন্ত অনির্বাণকে দেখা যাচ্ছিল। ওর উজ্জ্বল শরীরটা শূন্যে ভেসে উঠে এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল। ওর যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠা স্বর শোনা গেল: 'ওদের ছেড়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম রে। তাই...তাই... তোর হাতের ওই বাক্সের ভেতরে আমিও আছি। কাঞ্চন আর কাঞ্চির সঙ্গে মিশে আছি...মিশে আছি...। আর আজও জ্বলে-পুড়ে মরছি। ওই ছাইয়ের আগুন আজও নেভেনি রে...।'

# আলো জ্বেলো না, কেউ শব্দ কোরো না...

কারণ, ঘরের আলো যদি জ্বেলে রাখো, যদি শব্দ করো, তাহলে যাঁর আবির্ভাবের জন্যে এত আয়োজন, এত ডাকাডকি, তিনি আর দেখা দেবেন না।

এ যেন এক অন্যরকম পুজো! তাই এর জন্যে প্রয়োজন অন্যরকম উপচার। দেবতার আরাধনা একা-একা তুমি করতে পারো, কিন্তু এঁকে আহ্বান জানানোর সময় একা হলে চলবে না—অন্তত তিনজন একসঙ্গে বসা চাই। 'প্ল্যানচেট' অথবা প্রেতচক্রের নিয়মই তাই।

কীভাবে বসবে সেটা এবারে বলি শোনো।

একটা ছোট্ট গোল টেবিলকে ঘিরে থাকবে কয়েকটা চেয়ার। ধরো, চারটে চেয়ার। সেই চেয়ারে তিনজন বসবে, তারপর তুমিও বসবে। তোমরা টান-টান হয়ে বসে একে অপরের হাত ধরে থাকবে—তবে দেখবে কারও হাঁটুর সঙ্গে যেন কারও হাঁটুর ছোঁয়া না লাগে।

একটা কথা মনে রেখো—ঘরটা যেন পুরোপুরি অন্ধকার না হয়। ঘরের কোথাও একটা ছোট মোমবাতি জ্বেলে রাখতে পারো। সেই অল্প আলোয় তোমাদের মুখগুলো অস্পষ্টভাবে হলেও যেন দেখা যায়।

তোমরা সবাই শান্ত হয়ে বসবে। চুপ করে শুধু তাঁর কথাই চিন্তা করবে যাঁকে আজ আহ্বানের আয়োজন করেছ তোমরা। ইচ্ছে করলে হালকা কোনও মোলায়েম সুর বাজাতে পারো টেপরেকর্ডারে। তবে বেশিক্ষণ নয়—দশ কি পনেরো মিনিটের জন্যে। তারপর....তারপর তোমাদের মধ্যে যে মিডিয়াম—মানে, যাকে অবলম্বন করে তিনি দেখা দেবেন—যে সবাইকে ফিসফিস করে জানাবে, কেন তোমরা আলো-আঁধারিতে একটা গোল টেবিলটাকে ঘিরে হাতে হাত ধরে বসেছ। কার কথা তোমরা সবাই ভাববে, কার স্মৃতিকথা তোমরা কল্পনার চোখে জীবন্তভাবে 'দেখতে' চেষ্টা করবে। শুধু ভাববে তাঁর কথা, শুধু ভাববে, শুধু ভাববে। আর একইসঙ্গে ফিসফিস করে তাঁর নাম ধরে ডাকবে: 'এসো...তুমি এসো...।'

হঠাৎই একসময় তোমরা টেবিলের পায়ার একটা শব্দ শুনতে পাবে, শুনতে পাবে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। তখন হয়তো তুমি প্রশ্ন করবে, 'কেউ কি এসেছেন?'

কোনও উত্তর তুমি পাবে না। তবে তার বদলে টেবিলের পায়া নড়ে

উঠে একবার শব্দ করবে: খুট। যার মানে, হ্যাঁ—এসেছি।

তোমরা প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারবে না। তোমরা ভয় পাবে, ভীষণ অবাক হবে। কিছুক্ষণ তোমরা কেউই কথা বলতে পারবে না। তারপর...তারপর তোমাদের মধ্যেই কেউ হয়তো জিগ্যেস করবে, 'আপনি কি এ-ঘরে আগে থেকেই ছিলেন?'

টেবিলের পায়া নড়ে উঠবে অন্ধকারে। শব্দ হবে 'খট-খট'—দুবার। যার মানে, না—এ-ঘরে আগে ছিলাম না।

এবার তোমার শীত করবে। মনে হবে, ঘরের বাতাস হঠাৎই যেন হিম ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবহাওয়া জেলির মতো ভারী হয়ে গেছে।

এরপর মিডিয়াম তোমাদের হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করবে—আর তিনি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' এই ঢঙে প্রশ্নের উত্তর দেবেন। অর্থাৎ, গোল টেবিলটা শব্দ করে নড়ে উঠবে—হয় একবার, নয় দুবার।

ছায়া-অন্ধকারে ঘটনাক্রম যত এগোবে ততই তুমি টের পাবে যে, তোমার হাতে ধরা হাত দুটো বেশ কাঠ-কাঠ হয়ে উঠেছে, অল্প-অল্প কাঁপছে। তোমাদের কেউ-কেউ—হয়তো তুমি নও—উসখুস করছে, মুখে চাপা 'উঃ...আঃ' শব্দ করছে।

এর মানে কী জানো?

ওরা ভয় পাচ্ছে। এই প্রেতচক্র ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। কিন্তু কী এক অলৌকিক টানে পারছে না। ভয়ে সিঁটিয়ে চেয়ারে বসে আছে। না, না, তোমাকে বলছি না। তুমি নিশ্চয়ই ওদের মতো ভয় পাওনি—কারণ, তোমার সাহস হয়তো অনেক বেশি।

এবার তোমরা একটা কুয়াশা দেখতে পেলে। শূন্যে, টেবিলের ঠিক ওপরে, ধীরে-ধীরে গাঢ় হচ্ছে, জমাট বাঁধছে। অন্ধকার ঘরে ছাইরঙা মেঘ। কী অদ্ভুত! আর একইসঙ্গে একটা অচেনা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

তোমাদের মিডিয়াম ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি কে? আপনার নাম কী?'

মেঘের সঙ্গে মেঘ ঘষা লাগলে শব্দ হয় কি না জানি না, কিন্তু একটা খসখস শব্দ শোনা গেল। মনে হল যেন ওই মেঘটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে, কাঁপছে।

একই প্রশ্ন আবার করল মিডিয়াম। তারপর আবার। তারপর আরও একবার।

তখন অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। ফিসফিস করে কেউ যেন বলল, 'আমি...কেউ...না। আগে...ছিলাম। এখন...আমি...নেই। আমি এখন কেউ না...।'

তুমি একটা ঝাঁকুনি খেলে। কে কথা বলল? এতগুলো কথা! ভুল শোনার তো কোনও প্রশ্ন নেই! তা হলে কথাগুলো বলল কে?

তোমার গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু তুমি চেয়ারে বসেই রইলে। বেশ টের পাচ্ছ, হাতে হাত ধরা অবস্থাতেও তোমার হাতের পাতা কাঁপছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্রেফ মনের জোরে তুমি বসে আছ। গোল টেবিল ঘিরে হাতে হাত ধরে তৈরি করা 'চক্র' ভাঙছ না।

তুমি মনে-মনে যুক্তি তৈরি করতে চাইলে। অকালের শীত যে তোমার গায়ে কাঁটা ফুটিয়ে তুলেছে সেটার অন্য ব্যাখ্যা তুমি খুঁজলে। মিডিয়াম চুপ করে আছে—হয়তো ভয় পেয়েছে। কিন্তু তুমি তো সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র নও। তাই তুমি মিডিয়ামকে ডিঙিয়ে প্রশ্ন করলে, 'টেবিলটা কি আপনি নাড়াচ্ছিলেন?'

এর উত্তরে ঘরের কুয়াশায় আবার কাঁপন ধরল। মোমের আলো তার মধ্যে দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে ছোট মাপের এক অদ্ভুত রামধনু তৈরি করে ফেলল। তারপর সেই রামধনু তিরতির করে কাঁপতে লাগল। সেইসঙ্গে ঘরের জমাট বাতাসেও কাঁপন ধরল।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে তুমি ফিসফিসে হাসির শব্দ পেলে যেন। শব্দ না করে কেউ হাসছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে হাসছে।

তোমার চোখ এবার বড় হল, মুখটা হাঁ হল। তোমার তিনসঙ্গীরও তখন একই অবস্থা। অবশ্য তুমি ওদের স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছ না।

হঠাৎ কেমন একটা গোঙানির শব্দ পাওয়া গেল! যন্ত্রণার গোঙানি।

তুমি তখনও ভয় পেলে না। বরং তোমার মনের ভেতরে লড়াইয়ের একটা জেদ তৈরি করলে। অন্য তিনজনকে নিজের সাহস দেখানোর জন্যে একটু উঁচু গলায় একই প্রশ্ন করলে, 'টেবিলটা কি আপনি নাড়াচ্ছিলেন?'

এবার উত্তর পাওয়া গেল সরাসরি। টেবিলের পায়াটা যেন মেঝেতে 'পা ঠুকল'। একবার। যার মানে 'হ্যাঁ।'

হঠাৎই তোমার মনে সন্দেহ তৈরি হল। টেবিলের এইসব ব্যাপারস্যাপারগুলো বাকি তিনজনের কারও কীর্তি নয়তো! হয়তো প্রেতচক্রে বসে-বসেই কেউ অন্ধকারে লুকিয়ে নড়বড়ে টেবিলকে নাড়াচ্ছে। মেঝেতে তার পায়া ঠুকে দিচ্ছে। দরকার মতো একবার কিংবা দুবার।

কিন্তু ওই কুয়াশা? যেটা এখনও তোমার চোখের সামনে শূন্যে নিরালম্ব হয়ে ভেসে রয়েছে।? সুগন্ধটা সামান্য ফিকে হয়ে এসেছে বটে কিন্তু এখনও অস্তিমান। এই কুয়াশা কি কারও পক্ষে তৈরি করা সম্ভব? কিংবা ওই মিনিয়েচার রামধনু?

কেন নয়?

তুমি নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝালে। হয়তো তোমার তিন সঙ্গীর কেউ সবাইকে লুকিয়ে একটা বোতলে বন্দি করে খানিকটা ধূপের ধোঁয়া নিয়ে এসেছে। তারপর...।

কিন্তু সেই ধূপের ধোঁয়া সে ইচ্ছেমতো বোতলের বাইরে বের করবে কেমন করে?

এই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজে পেলে তুমি। গ্যাসের প্রসারণের সূত্র। বোতলের মুখ খুলে দু-হাতের তালু বোতলের গায়ে ভালো করে চেপে ধরে রাখলেই কাজ হাসিল করা যাবে। তালুর উত্তাপ বোতলের কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে পৌঁছে যাবে ধোঁয়ায়—মানে, গ্যাসে। গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বাড়বে। তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসবে বোতলের মুখ দিয়ে। সুতরাং...।

তোমার মনে নতুন প্রশ্ন জেগে উঠল। ধোঁয়াটা বোতল থেকে বেরিয়ে শূন্যে একই জায়গায় ভেসে আছে কেমন করে? কেমন করে তৈরি হল ওই রামধনু?

এবার তোমার যুক্তি হোঁচট খেল। তোমার বিজ্ঞানমনস্ক মন আহত হল। তোমার আস্থায় আঁচড় পড়ল।

তুমি ভাবতে লাগলে। কারণ কিছুতেই হাল ছাড়তে রাজি নও তুমি।

একটু পরেই উত্তর খুঁজে পেলে।

সিনেমায় যেমন দেখায়, নায়ক-নায়িকার পায়ের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে জমাট ধোঁয়া। একই জায়গায় থেমে রয়েছে—ওপরে ভেসে উঠছে না। হয়তো সেইরকম কোনও কেমিক্যাল-ধোঁয়া ব্যবহার করেছে তোমাদের কেউ। তারপর তার ওপরে লুকোনো কোনও টর্চ থেকে স্পেশাল রঙিন আলো ফেলে রামধনুর হলোগ্রাম ইমেজ তৈরি করেছে।

তুমি স্বস্তির শ্বাস ফেললে। যাক, অবশেষে একটা নড়বড়ে হলেও যুক্তি খাড়া করতে পেরেছ তুমি।

নাঃ, এইসব প্ল্যানচেট-ফ্যানচেটে তোমার আর বিশ্বাস নেই। সব বাজে কথা। মিডিয়ামগুলো সব জালিয়াত। ম্যাজিশিয়ান হ্যারি হুডিনি এইসব জালিয়াত মিডিয়ামদের ধরে-ধরে বেনকাব করত। এতক্ষণ এইভাবে বসে-বসে ফালতু বাজে সময় নষ্ট হল।

তুমি হঠাৎই ওই ধোঁয়া—কিংবা কুয়াশা—লক্ষ্য করে জোরে ফুঁ দিলে। তোমাকে আবারও অবাক করে দিয়ে ওই ছোট্ট মেঘের টুকরোটা একইরকম রয়ে গেল। রামধনুটাও।

নাঃ, যুক্তি দিয়ে এটার একটা ব্যাখ্যা বের করতে হবে।

তুমি হঠাৎই সঙ্গীদের হাত ছেড়ে দিলে। বেশ জোরের সঙ্গে বললে, 'তোদের মধ্যে কে চালাকি করছিস বল—।'

সবাই চমকে উঠল। অন্ধকার আর মোমের আলোয় মাখামাখি তোমার মুখের দিকে তাকাল। ওরা অসহায়ভাবে বলল যে, ওরা সত্যিই কোনও চালাকি করেনি।

তুমি বিশ্বাস করলে না। শূন্যে ঝুলে থাকা মেঘের মধ্যে পাগলের মতো এলোমেলো হাত চালালে।

মেঘটা ঘেঁটে গেল। রামধনু মিলিয়ে গেল। সাদা কুয়াশার টুকরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তারই মধ্যে একটা বিকৃত মুখের চেহারা দেখতে পেলে তুমি।

তুমি সেটাকে কোনও আমল দিলে না। আকাশের মেঘও তো অনেক সময় নানান ছবির চেহারা নেয়! এই বিকৃত ভয়ংকর মুখটাও সেরকম কিছু। তুমি নিজেকে বোঝালে, বিজ্ঞান আর যুক্তিই চিরকাল শেষ কথা বলবে।

কিন্তু তোমার সঙ্গীরা ভয় পেল। ওই মুখটা দেখে হঠাৎই একটা আতঙ্কের ঝোঁক ওদের গ্রাস করল। তোমার বকুনির তোয়াক্কা না করেই ওরা ছুট লাগাল ঘরের দরজার দিকে।

তুমি হকচকিয়ে গেলে। কিন্তু তারপরই চেঁচামেচি করে ধমক দিয়ে ওদের ধাওয়া করলে।

এতক্ষণ ধরে এত ঘটনা দেখার পরেও, শোনার পরেও, তুমি বিশ্বাস করতে চাইছ না। ভাবছ প্ল্যানচেট আসলে বুজরুকি, ম্যাজিকের লোকঠকানো কলাকৌশল।

কী করে তোমাকে যে বিশ্বাস করাই!

তোমরা বন্ধুরা তখন দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার দিকে ছুটছে। আর তাদের পেছন-পেছন তাড়া করে তুমিও ছুটছ।

তোমাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আমি তখন মরিয়া। তাই ঘরের বাইরে আমিও বেরিয়ে এলাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম।

আমি জানতাম, এবার তুমি পেছন ফিরে তাকাবে—এবং বিশ্বাস করবে।

ঠিক তাই হল। পেছনে খটখট শব্দ শুনে তুমি সিঁড়ির ওপর থেকে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালে।

দেখলে, প্ল্যানচেটের গোল টেবিলটা খটখট শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে তোমাকে ধাওয়া করে উঠছে।

বলো, এবারে তোমার বিশ্বাস হল তো?

# কুয়াশা, অন্ধকার এবং ...

বৃষ্টি। তবে কুয়াশা আর অন্ধকার যতটা ঘন বৃষ্টি ততটা নয়। ঝিরঝিরে মতন। গাড়ির উইন্ডশিল্ডে বৃষ্টির বাচ্চা-বাচ্চা ফোঁটাগুলো যেন খেলার ছলে দস্যিপনা করে ছিটকে পড়ছিল।

শীতের রাতে কুয়াশা আর অন্ধকার থাকাটা স্বাভাবিক। শুধু বৃষ্টিটাই হিসেবের বাইরে।

সামনের কাচের ওপরে ওয়াইপার চলছিল। একইসঙ্গে হেডলাইটের আলো ছিটকে যাচ্ছিল অন্ধকার আর কুয়াশার দিকে।

আমার একহাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাতে সিগারেট। জানি, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা বেশ কিছুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি।

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

অন্ধকার রাত। গাঢ় কুয়াশা। জমাট শীত। হালকা বৃষ্টি। কালো ফিতের মতো রাস্তা। হেডলাইটের হলদে আলো।

সবমিলিয়ে বেশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই রাস্তা ধরে আজীবন গাড়ি চালাই। এমনকী জীবনের পরেও।

ভাবের ঘোরে বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। সেইজন্যেই মেয়েটাকে প্রথমে দেখতে পাইনি। পাশের গাছপালার ফাঁক থেকে কোন মুহূর্তে যেন আচমকা ছিটকে চলে এসেছে গাড়ির সামনে।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু-হাত সামনে বাড়ানো। বড়-বড় আয়ত চোখে নিছক ভয়।

কী করে যেন শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষতে পারলাম।

বিশ্রী শব্দ হল। ভেজা রাস্তায় গাড়ির চাকা পিছলে গেল। কপাল ভালো যে, আমার পেছনে কোনও গাড়ি ছিল না। থাকলে সে নির্ঘাত আমার গাড়িতে ধাক্কা মেরে বসত।

মেয়েটি টাল সামলাতে গিয়ে গাড়ির বনেটের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল। হেডলাইটের আলো ওর কোমরের কাছটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। থুতনির নীচে আর গালে আলো পড়ে চোখের কোটর দুটো অন্ধকার গর্তের মতো লাগছিল।

হঠাৎ করেই যেন একটা ঠান্ডা শিরশিরে ভাব আমাকে ছুঁয়ে গেল।

মেয়েটা আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিল। প্রায় ছুটে চলে এল গাড়ির

জানলার কাছে। কাচের ওপর শব্দ করে টোকা দিল কয়েকবার।

একমুহূর্ত কী ভেবে আমি ঝুঁকে পড়ে জানলার কাচ সামান্য নামালাম।

মেয়েটি হাত দিয়ে বৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করতে-করতে বলল, 'দরজাটা একটু খুলুন না—প্লিজ...।'

ওর মুখের একপাশে হেডলাইটের আলোর ঠিকরে আসা আভা। বাকিটা ছায়া-ছায়া, অন্ধকার। তারই মধ্যে কয়েকটা জলের ফোঁটা চিকচিক করছে।

কী ভেবে দরজাটা খুলে দিলাম। আমার দিকে জানলার কাচ নামিয়ে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলাম।

ও চট করে উঠে বসল আমার পাশে। দরজা বন্ধ করে ওড়না দিয়ে মুখটা মুছে নিল। তারপর জানলার কাচটা তুলে দিল।

লক্ষ করলাম, মেয়েটা হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অনেকটা পথ ছুটে এসেছে। ওড়নার আঁচল দিয়ে নাকের কাছে বাতাস করল। বোধহয় সিগারেটের গন্ধে অস্বস্তি হচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

আড়চোখে মেয়েটাকে দেখলাম।

হলদে আর লাল চুড়িদার। সেইরকমই একটা ওড়না। জামার ওপরে কালচে রঙের একটা স্লিভলেস সোয়েটার। বয়েস আটাশ কি তিরিশ। বেশ সুন্দর দেখতে। প্রসাধন তেমন না থাকলেও শরীর থেকে একটা হালকা গন্ধ বেরোচ্ছে।

হঠাৎই মনে হল, আমি যেন সিনেমার ভেতরে ঢুকে পড়েছি। কারণ, সিনেমা-টিনেমায় এরকম হয়।

চুপচাপ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর জিগ্যেস করলাম, 'এই রাতে হঠাৎ এভাবে কোথা থেকে এলেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে তাকাল আমার দিকে : 'কেন? জিগ্যেস করছেন কেন?'

ওর কথার সুরে একটা চাপা ভয় টের পেলাম। সেইসঙ্গে চোখের নজরে দু-চারফোঁটা সন্দেহ।

আমি হাসলাম : 'ভয় নেই—আমি পুলিশের লোক নই। যেভাবে এই রাতে কুয়াশা আর বৃষ্টির মধ্যে আপনি হঠাৎ করে আমার গাড়ির সামনে এসে পড়লেন—তাতে প্রশ্নটা করে খুব একটা অন্যায় করেছি বলে তো মনে হয় না।'

কয়েক মুহূর্ত ঠোঁট টিপে বসে রইল। তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এখনও বড়-বড় শ্বাস পড়ছে। বুক ওঠা-নামা করছে।

আমি আবার কথা বললাম, 'খুব পার্সোনাল কিছু হলে বলার দরকার নেই।'

রাস্তার বাঁকে ঝোপের গোড়ায় একটা কুকুর চোখে পড়ল। হেডলাইটের আলোয় জন্তুটার সবুজ চোখ ঝিকিয়ে উঠল। আমি মুখ ফেরালাম মেয়েটার দিকে : 'যাকগে, আমার নাম রনিত। আপনি কোন দিকে যাবেন?'

'আপনি যেদিকে যাচ্ছেন। আমি আসলে এখান থেকে পালাতে চাই—যতদূরে পারা যায়। আমার নাম সোনাল।'

'বাঃ, বেশ অদ্ভুত নাম তো!' তারিফ করে বললাম, 'তা কার কাছ থেকে পালাতে চান? হাজব্যান্ডের কাছ থেকে?'

আবার চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকাল : 'কী করে বুঝলেন?'

কেতার হাসি হাসলাম, বললাম, 'আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। বছর দুয়েক হল এই গুণটা গজিয়ে উঠেছে। তবে কীভাবে হল সেটা এগজ্যাক্টলি বলতে পারব না।'

'আমার হাজব্যান্ডটা একটা জানোয়ার—' কথাটা বলার সময় ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে বেঁকাল সোনাল। ওর চোয়াল শক্ত হল : 'ও পারে না এমন কোনও কাজ নেই। মানে, পারত না এমন কোনও কাজ নেই। আপনি অচেনা মানুষ—তাও বলছি। দিন-রাত নেশা করত, হাত তুলত, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করত...।'

সোনালের দিকে তাকালাম।

এরকম ফুটফুটে কোমলতা মাখা মেয়ের গায়ে কী করে কেউ হাত তোলে!

'...দিন আর রাতগুলো এত বিশ্রীভাবে কাটত যে, মনে হত আমি আর বেঁচে নেই। প্রেতাত্মার মতো বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি...।'

'আর এখন?' কথার পিঠে কথা বলার ছলে প্রশ্নটা করলাম।

'এখন তো মুক্ত। মানে টোটাল ফ্রিডম। এখন আমি যা খুশি তাই করতে পারি—।'

'তাই? জানতে চাইলেন না তো আমি কোথায় যাচ্ছি।'

'জেনে কী হবে? নতুন জীবন শুরু করার সময় এসব ফালতু প্রশ্নের কোনও দাম নেই...।'

আমি অবাক হয়ে সোনালকে দেখলাম। একটু আগে ও ভয়, সন্দেহ, উৎকণ্ঠায় ভাসছিল। আর এখন বেপরোয়া, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত। ও সত্যি, না মায়া? নাকি আমাকে ঘিরে ওর অন্য মতলব আছে? থাকলে থাক। কারণ, এখন আমার ভয়-ডর বলে আর কিছু নেই।

কিন্তু যেভাবে ও আমার গাড়ির সামনে এসে পড়েছে তাতে মনে হয় না ব্যাপারটা সাজানো। তা ছাড়া ও-রাস্তা ধরে আমি প্রায়ই রাতের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাই। আগে কখনও তো ওকে দেখিনি!

'আপনার হাজব্যান্ড এখন কোথায়?'

'নেই।'

'নেই মানে?'

'শেষ। দ্য এন্ড।'

মেয়েটা কি ওর স্বামীকে খুন করেছে নাকি?

আমার কোঁচকানো ভুরু দেখে কী যেন ভাবল সোনাল। হেসে বলল, 'আমি নিজেই জানতাম না আমার মধ্যে এত শক্তি আছে। কী করে যে পারলাম কে জানে! বোধহয় আমি নয়—আমার ভেতরের আত্মা কিংবা প্রেতাত্মা আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়েছে।'

'কী কাজ?'

'বুঝে নিন। এর বেশি বলব না।'

আমার হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল। আড়চোখে সোনালকে বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম। ওর কথার মধ্যে কতকগুলো শব্দ আমার কানে বাজছিল।

একা মেয়ে। এই শীতের রাতে কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ করে কোথা থেকে এল ও? আর ঠারেঠোরে যা বলতে চাইছে তাতে একটা মারাত্মক কাণ্ড করে এসে এইরকম নির্লিপ্ত আর উদাসী থাকছে কেমন করে?

আমার ভীষণ অবাক লাগল। মনের ভেতরের কাঁটাটা খচখচ করতে লাগল।

'আপনি থাকেন কোথায়?' ওকে জিগ্যেস করলাম।

'প্রশ্নটা অনেকটা পুলিশের মতো শোনাচ্ছে।'

'আগেই তো বলেছি—আমি পুলিশ নই।'

আমার দিকে পূর্ণ চোখে তাকাল। তাকিয়ে কী খুঁজল জানি না। তারপর: 'যেখানে আপনার গাড়িতে প্রায় চাপা পড়ছিলাম, সেখান থেকে বড়জোর দু-আড়াই কিলোমিটার। সেখানে আমাদের সাজানো দোতলা বাড়ি। পুরোটা ছবির মতন। শুধু ওই লোকটাই ছিল কলঙ্ক।' একটু চুপ করে রইল। ওড়নার কাপড়ে হিজিবিজি কাটল। তারপর : 'ওই বাড়িতে আমি আর থাকতে পারব না...।'

আমি হঠাৎই রেডিয়োটা অন করে দিলাম।

শুরু হয়ে গেল গান আর কথার কচকচি। দ্বিতীয় কারও গলা আমাকে যেন ভরসা দিল।

'এবারে আপনার গল্পটা শুনতে পারি?' সোনাল জিগ্যেস করল।

আমি চুপ করে রইলাম। চোখ রাস্তার দিকে।

বৃষ্টি এখন আর নেই—তবে রাস্তায় ভিজে দাগ রয়েছে। ভিজে দাগ থাক বা না থাক, এখন রাস্তাই আমার জীবন।

'কী, বলবেন না? আমারটা তো হাঁ করে শুনলেন—।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। পুরোনো স্মৃতি ঝিলিক মেরে গেল মাথার ভেতরে।

'সেই চেনা গল্প।' ওর দিকে না থাকিয়েই বললাম, 'বড়লোক বউ। স্বামী গরিব, তবে সৎ পরিশ্রমী মানুষ। দিন-রাত শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। আমি নাকি অপদার্থ। শিক্ষিত হলেও গণ্ডমূর্খ। ফুটোপয়সার মুরোদ নেই।

'একদিন রাতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আমাকে। ওর বাবার দেওয়া বাড়ি—তাই আমাকে "গেট আউট" বলার অধিকারও ছিল। আমারও যে কী হল! দুঃখে অভিমানে বোকার মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এই গাড়িটা নিয়ে—ওর বাবার দেওয়া গাড়ি।' আক্ষেপে স্টিয়ারিং-এ চাপড় মারলাম : 'আমার লাইফটা একেবারে ইউজলেস ছিল...আর একইসঙ্গে হোপলেস...।'

হঠাৎই হেসে উঠল সোনাল।

'হাসছেন কেন?'

'না, একটা কথা মনে হল—তাই।'

'কী কথা?'

'মানে...দুজন হোপলেস একজায়গায় হলে একটু-আধটু হোপ তৈরি হতে পারে কি না...।'

'বেশ বলেছেন। এরকম কথা শুনলে ভালো লাগে—নতুন করে আবার বেঁচে উঠতে ইচ্ছে করে। জীবনের জন্যে মায়া জাগে।'

সোনাল মাথা নীচু করল। আস্তে-আস্তে বলল, 'আপনি হয়তো ভাবছেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটা সিরিয়াস ক্রাইম করে এসে এত কুল্‌লি কী করে কথা বলছি।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আসলে আমার হাজব্যান্ড আমার চোখে বহুদিন আগেই "নেই" হয়ে গিয়েছিল। ওর থাকা না থাকায় আমার লাইফের কোনও ডিফারেন্স নেই। তা ছাড়া আমার এখনকার লাইফটাও তো ঠান্ডা বরফ আর পাথরের মতো। মানে, মৃত্যু যেমন হয়...।'

দূরে একটা রোড সাইন চোখে পড়ল : 'কার্ভ অ্যাহেড'। তারপরই রাস্তাটা ডানদিকে বেঁকে গেছে।

এসে গেছি। আর কয়েকসেকেন্ড।

সোনালকে বললাম, 'গাড়ি সাইড করছি। আপনি এখানটায় নেমে পড়ুন।'

'কেন?' কপালে ভাঁজ ফেলে আমার দিকে তাকাল ও।

গাড়ির গতি কমালাম : 'এরপর আমার সঙ্গে গেলে আপনার বিপদ হবে—

গাড়ি আর থামানো যাবে না—তাই।'

'কীসের বিপদ?'

'প্লিজ, আমার কথা শুনুন...নেমে পড়ুন।'

'না।' জেদি গলায় বলল মেয়েটা, 'আগে বলুন—কীসের বিপদ—।'

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম: 'সোনাল, বছরদুয়েক আগে...সেই যে আমি রাগ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম...সেই রাতটা ছিল অমাবস্যার রাত। আজও তাই...।'

খেয়াল করলাম, স্টিয়ারিং-এর ওপরে আমার বাঁ-হাতের পাতাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডান হাঁটু আর উরু দেখা যাচ্ছে না।

সোনাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। এফ. এম. রেডিয়োতে ঝিন্‌চ্যাক মিউজিকের সঙ্গে গান বাজছে।

'...সেই শীতের রাতে এই রাস্তায় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ওই যে রোড সাইনটা দেখা যাচ্ছে—ওটা পেরিয়ে ডানদিকে টার্ন নিয়ে...তারপর...।'

আমার বাঁ-দিকের অনেকটা অংশ আচমকা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ব্যাপারটা সোনালের চোখে পড়ল। না পড়ে উপায়ও ছিল না।

ও চোখ বড়-বড় করে ফেলল। ভয়ংকর এক চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই। গাড়ি আর থামানো যাবে না।

'একটা লোডেড ট্রাকের সঙ্গে আমার গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সঙ্গে-সঙ্গে সব শেষ। তারপর থেকে...।'

সোনাল এখনও চিৎকার করে চলেছে। এফ. এম. রেডিয়ো বাজছে। রোড সাইনটা কাছে এসে গেছে।

'তারপর থেকে প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে আমি এ-রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে যাই। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা, শীত পরোয়া না করে ছুটে যাই ওই অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়। মারা যাওয়ার পর থেকে এটাই আমার জীবন, সোনাল...।'

কী মনে হওয়ায় গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরারটা আমার দিকে ঘোরালাম।

যা ভেবেছি তাই। আমার মুখের বাঁ-দিক, গলা—সব মিলিয়ে গেছে। শুধু ডানদিকের গাল, দুটো চোখ, কপাল আর চুল সাপের ফণার মতো শূন্যে ভেসে আছে।

সোনাল ছুটন্ত গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করছে, আর পাগলের মতো চিৎকার করছে।

ডানদিকে বাঁক নিয়ে এগোতেই ছুটে আসা ট্রাকের ঘোলাটে হেডলাইট চোখে পড়ল আমার।

সোনাল তখন হিস্টিরিয়ার রুগির মতো 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছে। গাড়ির উইন্ডশিল্ডের কাচে হিংস্রভাবে ঘুসি মারছে।

আশ্চর্য! এই মেয়েটাই না একটু আগে বলছিল, '...আমি আর বেঁচে নেই। প্রেতাত্মার মতো বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি...।'

এখন ওর সামনে সত্যি-সত্যি সেই সুযোগ এসে গেছে। এখন থেকে ও আর আমি একসঙ্গে ঘুরে বেড়াব।

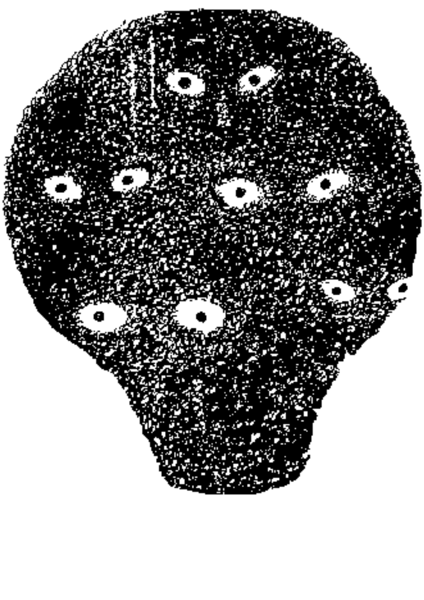
আমার শরীরের বাকি অংশগুলো একে-একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

ট্রাকটা ক্ষিপ্ত গন্ডারের মতো ছুটে আসছে।

আমি অদৃশ্য আঙুলের চাপে গাড়ির হর্নটা বাজাতে শুরু করলাম।

শেষ মুহূর্তটার জন্যে আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

# উপন্যাস



# না যেন করি ভয়

গরম বেগুনিতে কামড় দিয়ে শানু একটু বিপদে পড়ল। হাঁ করে ফুঁ দিয়ে বেগুনির টুকরোটাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। তারপর সাবধানে ছ্যাঁকা বাঁচিয়ে ওটকে কামড় দিতে-দিতে বলল, 'আহলে আইটা উ আজে—।'

টুনটুন জিগ্যেস করল, 'কী বললে? কী বললে?'

বেগুনিটাকে ঠিকঠাক কবজা করে শানু আবার একই কথা বলল, 'আসলে বাড়িটা খুব বাজে—।'

শানুর মা অনিতা, মানে টুনটুনের মাসি, ভুরু কুঁচকে ছেলেকে আলতো ধমক দিয়ে বললেন, 'ওকে এসব আজেবাজে কথা বলার কী দরকার! ছেলেটা ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।'

শানু মাসতুতো বোনের দিকে একবার তাকিয়ে একমুঠো মুড়ি মুখে ঢেলে দিল। তারপর সেটা চিবোতে-চিবোতে বলল, 'আগে থেকে না বলে রাখলে প্রবলেম আছে, মা। নইলে কোন রাতে দেখবে বাঁশির আওয়াজ শুনে...।'

অনিতা তাড়াতাড়ি ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক—এখন ওসব বাজে কথা থাক। ও সবে এসেছে...।'

টুনটুন হেসে উঠে হাত নেড়ে বলল, 'ওতে আমি ভয় পাব না, মাসি। ওরকম ভুতুড়ে বাড়ির গল্প আমি অনেক পড়েছি। শুধু দেখতেই যা বাকি! তো শানুদা যদি হেল্প করে তা হলে সেই বাকিটুকুও আর থাকবে না।'

কথা শেষ করে টুনটুন মুড়ি-তেলেভাজায় মন দিল।

বাইরে ঝমঝম শ্রাবণের বৃষ্টি। শুরু হয়েছে সেই দুপুর থেকে—আর এখন সন্ধে সাতটা। আকাশের যা হাঁকডাক আর জলের যা তোড় তাতে মনে হয় না এ-বৃষ্টি মাঝরাতেও থামবে।

না থামুক ক্ষতি নেই। কারণ, টুনটুন জানে, বৃষ্টি-ঝমঝম সন্ধেবেলাতেই ভূতের গল্প-টল্প ভালো জমে। তাই ও চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বেশ আশা নিয়ে পলকহীন চেয়ে রইল শানুর দিকে। ওর নজরে একটা বেপরোয়া ভাবও ছিল। সেই ভাবটা যেন বলতে চাইছে, এসো, কত ভয় দেখাবে দেখাও। পরীক্ষা করেই দ্যাখো আমি ভয় পাই কি না।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। কাচের জানলায় নীলচে সাদা আলো ঝিলিক্ মারছে বারবার। সেদিকে একপলক দেখে অনিতা শানুর দিকে তাকিয়ে বেশ চিন্তার গলায় বললেন, 'তোর বাপিকে কতবার করে বললাম, এখন

বেরিয়ো না। জেদ ধরে সেই গেলই। ছাতাতে কি এ-বৃষ্টি আর আটকায়! দেখিস একেবারে ভিজে কাক হয়ে ফিরবে...।'

টুনটুনের মেসো গেছেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে খবর দিতে। কারণ, ফ্রিজের গায়ে হাত দিলে নাকি শক মারছে। টুনটুন আজ বিকেলে শক খেয়েছে বলেই মেসোর চিন্তাটা হয়েছে আরও বেশি। সকালে এসে পৌঁছেছে যে-অতিথি সে কি না বিকেলের মধ্যেই শক খেয়ে বসে আছে!

টুনটুন যতই মেসোকে বুঝিয়েছে যে, শকটা হালকা চিনচিনে—ওর তেমন কিছু লাগেনি, মেসো ততই জেদ ধরে বলেছেন, 'ইলেকট্রিক শক মানে ইলেকট্রিক শক। তকে কখনও খাটো করে দেখা উচিত নয়...।'

শানু ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু মুখে আবদার করে বলল, 'মা, প্লিজ, ওকে শর্টে কালো বাড়ির ব্যাপারটা একটু বলি। ও তো ভয় পাবে না বলছে। তা ছাড়া ও এখানে নতুন। ওকে একটু অ্যালার্ট না করে দিলে কখন কী হয়...।'

অনিতা নিমরাজি হলেন ঃ 'বললে বল। এরপর রাতে যদি ও ভয় পায়...।'

টুনটুন তেলেভাজা চিবোতে-চিবোতে তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল, 'না, না, মাসি। তুমি শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছ। আমার...।'

শানুও তাল মিলিয়ে বলল, 'রাতে ও ভয় পাবে কী করে? ও তো তোমার আর আমার সঙ্গে শোবে...।'

শেষ পর্যন্ত অনিতা হার মানলেন। ওদের জন্য আরও কয়েকটা বেগুনি ভাজতে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন।

শানু মুড়ি-তেলেভাজা খেতে-খেতে বলল, 'তোকে ব্যাপারটা বলছি...কিন্তু বাপির সামনে এ নিয়ে একটা কথাও বলবি না।'

টুনটুন ঘাড় নাড়ল। কয়েকবার পা দুলিয়ে শানুর দিকে ঝুঁকে এল।

টুনটুন এবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। শুধু পাশই করেনি, চারটে লেটার এবং স্টার পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মন ভরেনি। রেজাল্টটা আরও ভালো হবে আশা করেছিল। ওর স্কুলের টিচাররাও এই রেজাল্টে কিছুটা হতাশ হয়েছেন। ফলে রেজাল্ট বেরোনোর পর টুনটুন ক'দিন বেশ মনমরা হয়েছিল। তাই দেখে মা আর বাপি দুজনেই ঠিক করলেন, ও মাসির বাড়ি ক'দিন ঘুরে আসুক।

টুনটুনের মেসোর বদলির চাকরি। মাসছয়েক আগে বদলি হয়ে এসেছেন তিলকপুরে। সুতরাং টুনটুনের মন ভালো করতে মাসির বাড়িতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে।

আজ সকালেই বাপি ওকে পৌঁছে দিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। সাত-আটদিন পর এসে আবার নিয়ে যাবেন।

বাপি চলে যাওয়ার পর টুনটুনের কিছুক্ষণ মনখারাপ লেগেছিল, কিন্তু শানু ওর সঙ্গে গল্পে মেতে উঠতেই মনখারাপের ব্যাপারটা ওর মাথা থেকে উবে গেল। আর তারপরই শুরু হল বৃষ্টি।

শানু টুনটুনের চেয়ে বছর চারেকের বড়। ও বি. কম. পড়ছে বটে, কিন্তু পড়াশোনা ওর ভালো লাগে না। সবসময় অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে বেড়ায়। ওর জন্য চিন্তা করে-করে মাসি নাকি রোগা হয়ে গেছে।

টুনটুন এসব কথা মায়ের মুখেই শুনেছে। শুনে-শুনে 'শানুদা'কে ও অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখানে এসে শানুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, গল্প করার পর, 'শানুদা'কে ওর দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে।

কত গল্পই যে করতে পারে শানু!

শানুর গল্পের জন্যই টুনটুনের এখনই মনে হচ্ছে মসির বাড়িতে ও এসেছে ক-ত দিন যেন হয়ে গেছে। অথচ ও এসেছে আজ সকাল ন'টায়—আর এখন সবে সন্ধে সাতটা।

তেলেভাজা-মুড়ি খেতে-খেতে কালো বাড়ির কাহিনি শোনাল শানু। শুনতে-শুনতে টুনটুনের মনে হল, শানুদা বোধহয় বইয়ে পড়া কোনও ভূতের গল্প ওকে শোনাচ্ছে। টুনটুন অসংখ্য ভূতের গল্প পড়েছে, আর সেগুলো যে 'গল্প' সে নিয়ে ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই। ও ভূতের গল্পের পোকা হলেও ভূতে ওর একফোঁটা বিশ্বাস নেই। কারণ, মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কে যে নিরানব্বই আর ফিজিক্যাল সায়েন্সে চুরানব্বই পায় ভূতে তার বিশ্বাস থাকবে কেমন করে!

সুতরাং বেশ মন দিয়ে শানুর গল্প শুনল টুনটুন। শুনতে-শুনতে একটু যে গা-ছমছম করেনি তা নয়। কিন্তু ভূতের কোনও গল্প পড়ার পর বেশ ভয়-ভয় লাগুক এটাই তো টুনটুন চায়!

রাতে মাসি ঘুমিয়ে পড়লে শানুর সঙ্গে অন্য অনেক গল্প করেছে ও। কিন্তু ওই কালো বাড়ির গল্পটা কিছুতেই মাথা থেকে যায়নি। ও অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে ওই বাড়িটার কথা ভেবেছে। কারা থাকত ওই বাড়িতে? তারা এখন কোথায়? কেন ওই বাড়িটা পোড়োবাড়ি হয়ে পড়ে আছে?

বাইরে বৃষ্টি এখনও বেশ ভালোই পড়ছে। তবে সন্ধেবেলা যেমন ঘনঘন বাজ পড়ছিল এখন সেরকম নয়। মাজে-মাঝে টিউবলাইটের মতো সাদা আলো জানলার কাচ ভেদ করে ঝলসে যাচ্ছে ঘরের দেওয়ালে।

টুনটুনের ঘুম আসছিল না কিছুতেই। একটু ভয়-ভয়ও করছিল। কিন্তু শানুর কাছে সেটা ধরা পড়ুক ও চাইছিল না।

অন্ধকারে চোখ খুলে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ও চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'শানুদা...।'

কোনও সাড়া নেই।

'শানুদা—।' আবার চাপা গলায় ডাকল ও।

'উঁ...।' ঘুমজড়ানো চোখে সাড়া দিল শানু, 'বল, কী?'

'ওই বাড়িটার গল্প তুমি কি আমাকে শর্টে বললে?'

শানু এবার পাশ ফিরল টুনটুনের দিকে। একটা হাই তুলল ঃ 'এই মাঝরাত্তিরে কীসব কোশ্চেন শুরু করলি! বল কী বলছিস।'

টুনটুন আবার একই প্রশ্ন করল।

শানু একবার ঘুমন্ত মায়ের দিকে দেখল। তারপর আবার হাই তুলে বলল, 'যেটুকু জানি সেটুকুই বলেছি। তবে এই এরিয়ার আরও অনেকে অনেক কিছু জানে—সবসময় বলতে চায় না।'

'কারা থাকত ওই বাড়িতে, শানুদা?'

'আরে সে অনেক ব্যাপার। কাল দেখা যাবে। এখন ঘুমো তো।'

'কাল একটু খোঁজখবর করে দেখলে হয়। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে...ওই কালো বাড়ির পুরো গল্পটা...শর্টে নয়...লঙে।'

'বললাম তো কাল সব হবে। এখন প্লিজ, আমার কাঁচা ঘুমটা ঘেঁটে দিস না—।'

শানু আবার ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

ঘরের দেওয়ালে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই বাজ পড়ার শব্দ।

টুনটুন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল।



পরদিন বিকেলে শানুর সঙ্গে তিলকপুর দেখতে বেরোল টুনটুন। বেরোনোর সময় অনিতা জোর করে ছেলের হাতে একটা ছাতা গুঁজে দিয়েছেন।

টুনটুন আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে কালো মেঘ। কিন্তু সেই কালো মেঘের মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট নীল জানলা—আকাশ দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে কত যে গাছ! তারা সব সবুজ হাত তুলে আকাশকে যেন ডাকছে।

দেখতে-দেখতে টুনটুনের মনে হল, ও কারও আঁকা একটা ছবি দেখছে। কলকাতায় এরকম ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। ইস, মা-কে এই ছবিটা

দেখাতে পারলে ভীষণ ভালো লাগত ওর।

হাঁটতে-হাঁটতে ওরা দুটো পুকুর পেরিয়ে গেল। তারপরই একটা বিশাল খেলার মাঠ। মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। জল-কাদায় ওদের ভূতের মতো লাগছে।

শানু বলল, 'এই মাঠে আমরা খেলি। ওই যে, আমার বন্ধুরা সব খেলছে। পরশু থেকে আমার জ্বর-জ্বর মতন হয়েছে বলে মা ক'দিন খেলতে বারণ করেছে। এই মাঠটা পেরোলেই আমাদের ক্লাব "বিপ্লবী সংঘ"।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই শানুর পকেটের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফোন বের করে পরদার দিকে একপলক তাকাল শানু। কে ফোন করেছে দেখল। তারপর বোতাম টিপে ফোন কানে লাগিয়ে বলল, 'এই তো, ক্লাবের কাছে এসে গেছি। মাঠ পেরোচ্ছি। আমার সঙ্গে আমার মাসতুতো বোন আছে। আমাদের বাড়িতে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এক্ষুনি ঢুকছি।'

মাঠের পাশ দিয়ে ওরা এগোতে লাগল। মাটির ওপরে ইটের খোয়া ছড়ানো রাস্তা। তার জায়গায়-জায়গায় জল-কাদা জমে আছে। রাস্তার পাশে বড়-বড় ঘাস, আর কয়েকটা বিশাল গাছ। তার পাশেই ঢালু জমি নেমে গেছে। সেখানে বৃষ্টির জল জমে ছোটখাটো পুকুর হয়ে গেছে। ব্যাঙের দল ডাকছে।

একটু পরেই ওরা ক্লাবঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

ইটের দেওয়াল। সাদা রং করা। মাথায় টিনের চাল। তার ওপরে গাছের ঝরাপাতা ছড়িয়ে আছে।

ক্লাবঘরের দেওয়ালে ছোট্ট সাইনবোর্ড। তাতে লেখা ঃ 'বিপ্লবী সংঘ'।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

ঘরে টিভি চলছে। মেঝেতে রঙিন চাদর পাতা। তার ওপরে বসে তিনজন ছেলে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছে।

তিনজনের সঙ্গে টুনটুনের পরিচয় করিয়ে দিল শানু। অঙ্কিত, রোশন, আর রাজর্ষি। ওরা টুনটুনকে বসতে বলল। তখন শানু বলল, 'না রে, এখন বসব না। ওকে কালো বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাব। অন্ধকার হয়ে গেলে প্রবলেম জানিস তো!'

তিনজনের মধ্যে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সবচেয়ে বড়সড় অঙ্কিত। ও হেসে বলে উঠল, 'না, না—ওকে দেখাস না। ভয় পেয়ে যাবে...।'

টুনটুন পালটা হাসল, 'ভয় পাই পাব। আমার ওই বাড়িটা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তা ছাড়া ভয়-টয় পেলে তোমরা তো আছ...।'

'তা হলে আর দেরি করে লাভ কী!' অঙ্কিত উঠে দাঁড়াল ঃ 'চল, আমিও

তোদের সঙ্গে যাই...।'

শানু বলল, 'টুনটুন বলছে ওর নাকি হেভি সাহস। এবার সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

রোশন আর রাজর্ষিকে বলে ওর ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে এল। অনেকগুলো গাছপালার সারি পেরিয়ে একটা পুকুরকে পাক দিয়ে ভাঙাচোরা একটা রাস্তায় এসে পড়ল।

আকাশে চাপা গুড়গুড় শব্দ হল। হাঁটতে-হাঁটতেই ওরা মুখ তুলে আকাশে তাকাল। একটু আগের দেখা ছোট-ছোট নীল জানলাগুলো আবছা কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে।

অঙ্কিত বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা—বৃষ্টি আসতে পারে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা প্রায় ছুটতে শুরু করল।

কাঁচা রাস্তায় জল-কাদা। দুপাশে ছোট-খাটো বাড়ি-ঘর। কোনওটা পাকা বাড়ি, কোনওটা টিনের চাল, আর কোনওটা স্রেফ মাটি আর চাটাই দিয়ে তৈরি। বাড়ির উঠোনে লাউ-কুমড়োর মাচা আর আম-কাঁঠাল-পেয়ারা গাছ।

দু-মিনিট যেতে না যেতেই বাঁ-দিকে একটা ফাঁকা জমি পাওয়া গেল। জমিতে আগাছার জঙ্গল। আর জমি পেরিয়ে বিশাল একটা সবজির খেত। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

সেগুলো ছাড়িয়ে চোখ মেললেই দু-চারটে ছোট-ছোট বাড়ি, আর তার মাথায় আকাশ। কিন্তু ডানদিকে পঁচিশ কি তিরিশ ডিগ্রি মতন চোখ সরলেই আকাশটা আর দেখা যাচ্ছে না।

কারণ, তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো বাড়িটা।

ওরা তিনজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। টুনটুন অবাক হয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কালো রঙের বিশাল একটা ডাইনোসর যেন গুড়ি মেরে বসে আছে। পড়ন্ত দিনের মেঘলা আলোয় বাড়িটার দিকে তাকিয়ে টুনটুনের মনে হল ওটা যেন অন্ধকার দিয়ে তৈরি। শরীরটাকে গুটিয়ে ছোট করে রেখেছে। প্রতিটি পেশিতে অসম্ভব তেজ ও শক্তি। শুধু ওটার মাথাটা যে কোথায় সেটাই ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না।

একটা বাড়ির আকার যা-ই হোক না কেন আকাশের পটভূমিতে তার সীমানা সবসময়েই সরলরেখা দিয়ে তৈরি হয়—অন্তত টুনটুন এতদিন তাই জানত। কিন্তু এই কালো বাড়িটার যে-সীমারেখা আকাশের গায়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে সেটার বেশিরভাগটাই বাঁকা রেখা দিয়ে তৈরি। এর কারণ হতে

পারে খসে পড়া ইট পলেস্তারা, কিংবা বাড়ির নানান জায়গায় লেপটে থাকা কালচে সবুজ শ্যাওলা।

বর্ষার জোলো বাতাস হু-হু করে বইতে শুরু করল। টুনটুন, শানু আর অঙ্কিতের চুল উড়তে শুরু করল। ঝোড়ো হাওয়ায় দিশেহারা পতাকার মতো ঝাপটা মারতে লাগল গালে, কপালে।

টুনটুন বাড়িটার দিকে আরও দু-চার পা এগিয়ে গেল। ওর দেখাদেখি পা বাড়াল বাকি দুজন।

তখনই ছাতাধরা জিনিসের গন্ধটা টুনটুনের নাকে এল। বর্ষাকালে বহুদিন আলো-বাতাস না পাওয়া জামাকাপড়ের গায়ে যে-বিশ্রী গন্ধটা টের পাওয়া যায়, ঠিক সেইরকম।

গন্ধটা নাকে আসতেই মুখে বিরক্তির শব্দ করে নাক টিপে ধরল টুনটুন।

শানু চাপা গলায় বলল, 'বাড়িটার গা থেকে সবসময়েই এরকম বাজে গন্ধ বেরোয়।'

'কেন?' টুনটুন জিগ্যেস করল। কিন্তু বাড়িটার দিক থেকে চোখ সরাল না।

অঙ্কিত ওর প্রশ্নের জবাব দিল, 'কেউ জানে না কেন...।'

বহুকাল আগে বাড়িটার রং কালো ছিল কি না কে জানে। কিন্তু এখন তার সারা গায়ে ময়লা আর শ্যাওলা জমে বলতে গেলে কালো রংটাই বসে গেছে। ভালো করে নজর করলে সেই কালোর ওপরে ছাতাধরা সাদা ছোপ-ছোপ দাগ বেশ দেখা যায়।

কালো বাড়িটার বিশাল চৌহদ্দি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আর সেই পাঁচিলের চেহারাও বাড়ির সঙ্গে মানানসই। সর্বত্র ভাঙাচোরা—কোথাও আছে, কোথাও নেই। আগাছার জঙ্গলে পাঁচিলটার অনেক জায়গাই ঢাকা পড়ে গেছে।

পাঁচিলের একজায়গায় প্রায় দশফুট উঁচু বিশাল লোহার গেট। বাতাস আর বর্ষায় জং ধরা। গেটের পাল্লা দুটো ফুট দুয়েক ফাঁক হয়ে আছে। বড়-বড় ঘাস আর আগাছা গেটের নীচের দিকটা ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে যতটা চোখ যায় শুধু ছোট-বড় গাছ আর হরেকরকম আগাছার জঙ্গল। সদর দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোনোর পথটাও আগাছায় প্রায় ঢেকে গেছে।

বাড়ি আর তার লাগোয়া জমির বহর দেখে মনে হয় বাড়িটা এককালে কোনও বড়লোকের বাগানবাড়ি ছিল।

টুনটুন লক্ষ করল, কালো বাড়িটার আশপাশের জমিতে বড়-বড় ঘাস-পাতার মধ্যে দুটো গোরু চরে বেড়াচ্ছে আর বাড়িটার কাছ থেকে প্রায় চল্লিশ-

পঞ্চাশ মিটার দূরে দুটো ছোট মাপের আধাখ্যাঁচড়া বাড়ি রয়েছে। আধাখ্যাঁচড়া বলতে একতলা তৈরির পর দোতলা তৈরি হতে-হতে কনস্ট্রাকশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকলে যা হয়!

সেই বাড়ি দুটো দেখিয়ে টুনটুন অঙ্কিতকে জিগ্যেস করল, 'ওই বাড়ি দুটোয় কারা থাকে?'

'কেউ না।'

'কেন?'

'সে প্রায় বিশ বছরের পুরোনো কেস। বাবার মুখে শুনেছি। দু-বন্ধু দুটো বাড়ি তৈরি করছিল। তাদের ফ্যামিলি একতলায় থাকত। দোতলা তৈরির কাজ চলছিল। এক বর্ষার সিজ্‌নে দু-ফ্যামিলির সাতজন মেম্বার বাজ পড়ে একসঙ্গে খতম।' বড় করে শ্বাস ছাড়ল অঙ্কিত : 'তারপর থেকে কালো বাড়িটার কাছাকাছি আর কেউ বাড়ি তৈরির চেষ্টা করেনি...।'

অঙ্কিতের কথাগুলো টুনটুন শুনছিল, কিন্তু ও স্থিরচোখে তাকিয়ে ছিল কালো বাড়িটার দিকে। এক অদ্ভুত ভয় আর মুগ্ধতা ওর মধ্যে কাজ করছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অঙ্কিত আবার বলল, 'কালো বাড়িটার চারপাশে ওই যে সব গাছ দেখছ, ওতে মাঝে-মাঝে পিকিউলিয়ার সব ফুল হয়—নানান রঙের ফুল...খুব অ্যাট্রাকটিভ। শুনেছি, ওই ফুলের লোভে দুজন কালো বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়েছিল—আর বেরোতে পারেনি। তাদের আর কোনও খোঁজও পাওয়া যায়নি। সেই থেকে ওই ফুলের ফাঁদে আর কেউ পা দেয় না।'

পাখির মিহি ডাক কানে এল ওদের। টিয়ার ঝাঁক 'ট্যাঁ-ট্যাঁ' করতে-করতে মেঘলা আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে উড়ে গেল।

কালো বাড়িটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থেকে টুনটুন জিগ্যেস করল, 'অঙ্কিতদা, এই বাড়িটায় ঢুকে আবার বেরিয়ে এসেছে এমন কেউ নেই?'

প্রশ্নটা শুনে অঙ্কিত একটু দোটানায় পড়ে গেল। একবার টুনটুনের দিকে তাকাল। জবাব দেবে কি দেবে না কয়েক সেকেন্ড ভাবল।

তখন শানু ওকে বলল, 'বল না, মনিরুল চাচার কথা বল—।'

'কে মনিরুল চাচা?' টুনটুনের প্রশ্নের যেন আর শেষ নেই।

'ওই ওদিকে বটতলায় চায়ের দোকান ছিল।' হাত তুলে একদিকে নিশানা করল অঙ্কিত : 'পাঁচ-ছ'বছর হল ওর ছেলে কামাল দোকান চালায়—আর চাচা চুপচাপ দোকানের একপাশে বসে থাকে।'

'মনিরুলচাচা এই বাড়িটায় ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ—' কালো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে বলল অঙ্কিত, 'আবার বেরিয়েও এসেছিল...।'

'তারপর?'

'তারপর কী হয়েছিল সেটা চাচার মুখ থেকেই শুনবি। তোর বাড়ি দেখা শেষ হয়েছে? তা হলে চল, এখনই বটতলায় যাই।'

এর মধ্যেই আলো বেশ কমে এসেছে। আশপাশের জলা থেকে ভেসে আসা ব্যাঙের ডাক জোরালো শোনাচ্ছে। বড়-বড় গাছের পাতার ঝাঁকের আড়ালে ঘরে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে।

কমে যাওয়া আলোয় কালো বাড়িটাকে ওত পেতে থাকা এক অপার্থিব জন্তুর সিলুয়েট বলে মনে হল টুনটুনের। মনে হল, যেই ওরা পিছন ফিরে হাঁটা দেবে অমনি যেন সেই জন্তুটা ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

টুনটুন শানুকে বলল, 'শানুদা, এখন বটতলায় গেলে মাসি কিছু বলবে?'

'না, না, মা কিছু বলবে না। ও আমি ম্যানেজ করে নেব। যদি বাই চান্স দেরি হয় ফোন করে দেব। তুই এখানে বেড়াতে এসে সবসময় কি ঘরে বসে থাকবি না কি?'

ওরা তিনজন ফিরে চলল। কালো বাড়িটা পিছনে পড়ে রইল। কিন্তু টুনটুনের মনে হল, বাড়িটা যেন অদৃশ্য সুতোয় ওকে পিছনদিকে টানছে।

ওরা তিনজন যখন মনিরুলচাচার দোকানে এসে পৌঁছল তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, আর সেইসঙ্গে টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

মনিরুলচাচাকে দেখে বেশ অবাক হল টুনটুন।

শানুদা আর অঙ্কিতদা বলেছিল মনিরুলচাচার বয়েস সত্তর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু চাচার মাথার চুলগুলো সব দাঁড়কাকের মতো কালো। চেহারা ভাঙাচোরা হলেও বাদামি চামড়ায় এই বয়েসেও চকচকে ভাব আছে। চোখে চশমা, থুতনিতে দাড়ি।

চায়ের দোকানটা বাঁশের খুঁটি আর টিনের চালি দিয়ে তৈরি, কিন্তু মাপে বেশ বড়। দোকানের বাইরে সার দিয়ে কটা ব্যাটারির বাক্স উপুড় করে রাখা—খদ্দেরদের বসার জন্য। এখন বৃষ্টির জন্য সিটগুলো সব খালি। আর ভেতরে জোড়াতালি দেওয়া একটা বড় টেবিল, তার দুপাশে দুটো ফাটল ধরা লম্বা বেঞ্চ।

দোকানের একপাশে পাতা উনুনে আগুন জ্বলছে। চাচার ছেলে কামাল

ব্যস্ত হাতে চা-বিস্কুটের জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছে। ওর গায়ে গেঞ্জি আর প্যান্ট। পোক্ত হাতে সসপ্যানে চামচ নাড়ছে। তাতে অদ্ভুত ছন্দে 'বাজনা' বাজছে।

দোকানটার আলো বলতে দুটো বাল্‌ব। সেই আলোয় উদ্ভট চেহারার কতকগুলো ছায়া তৈরি হয়েছে।

চাচা দোকানের একপাশে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে একটা টুলে বসেছিল। অঙ্কিত চাচার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'চাচা, ভালো আছ তো?'

চাচা কাগজ থেকে মুখ তুলল, 'কে, আঙ্কু? বসো—চা খাবা নাকি?'

'হ্যাঁ, চাচা, খাব। আজ সঙ্গে আমার এক বন্ধু এসেছে।' গলার স্বর খাদে নামিয়ে অঙ্কিত বলল, 'আপনার সেই কালো বাড়ির কেসটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চায়...।'

'ওঃ—' বলে হাসল চাচা : 'এই গল্প কতজনেরে যে কইসি! ওই শয়তান বাড়িডা য্যামন ছিল ত্যামনই রইয়া গেল। আমাগো কপাল পোড়া...।'

ওদের তিনজনের জন্য তিনটে চা বলল অঙ্কিত। দোকানের ভেতরে তিনজন খদ্দের বসে চা খাচ্ছে, খোশগল্প করছে।

টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। চাচা যেদিকটায় টুলে বসে সেদিকটায় দোকানের চাল সামনে হাত তিনেক বাড়ানো। ওরা ব্যাটারির বাক্স টেনে নিয়ে চাচার কাছ ঘেঁষে বসে পড়ল।

মুখ মুছে দাড়িতে হাত বুলিয়ে মনিরুলচাচা তার অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে-দিতে টুনটুনরা চাচার গল্প শুনতে লাগল।

বহুবছর আগের কথা। সময়টা শীতকাল। মনিরুলচাচা তখন সদ্য জোয়ান। একদিন সন্ধের পর স্টেশন থেকে ঘরে ফেরার পথে হঠাৎ বাঁশির শব্দ চাচার কানে আসে। বাঁশি তো নয়, যেন বুকফাটা সুরেলা কান্না। বাঁশি শুনে চাচার মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। চাচার মনে হচ্ছিল, বাঁশির সুরটা যেন চাচাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কানের কাছে ফিসফিস করে কেউ যেন বলছে, 'আয়...চলে আয়...।'

চাচা তখন বাজার পেরিয়ে সবে দশ কি বারো কদম এগিয়েছে। চারপাশটা অন্ধকার হলেও পথে দু-চারজন লোক চোখে পড়ছে। কিন্তু সেই মন-ভোলানিয়া বাঁশির সুর মনিরুলচাচা ছাড়া আর কেউ যেন শুনতে পাচ্ছিল না।

তখন চারপাশে এত আলো ছিল না। এত দোকানপাট ছিল না। এত বাড়ি-ঘরও ছিল না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। চারপাশে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক আর জোনাকির মিটমিটে আলো।

বাঁশির সুর মনিরুলচাচাকে যেন 'হাত ধরে' ডেকে নিয়ে চলল।

কেমন এক অলৌকিক নেশার ঘোরে চাচা পৌঁছে গেল সেই কালো বাড়িটার কাছে। বাড়ির বাগানের ফুলগুলো তখন রঙিন আলো হয়ে জ্বলছে। অদ্ভুত আভা ফুটে বেরোচ্ছিল ওগুলোর ছোট-ছোট শরীর থেকে। যে-টানটা মনিরুল চাচা তখন টের পেয়েছিল সেটা সমুদ্রের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার টান। সেই টানে চাচা জং ধরা লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে বাড়িটার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়েছিল।

তারপর...।

তারপর সেই বাঁশির সুর চাচাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। চাচা ঢুকে পড়েছিল অন্ধকার বাড়িটার ভেতরে।

অন্ধকারে দিকভ্রম হয়ে গিয়েছিল। সময়ের হিসেবও ওলোটপালট হয়ে গিয়েছিল। চাচাকে নিয়ে কারা যেন ভয় পাওয়ানোর খেলায় মেতে উঠেছিল! বৃষ্টি-ভেজা শরীরের মতো ঘামে ভিজে উঠেছিল চাচার শরীর। একটা প্রচণ্ড ভয় চাচাকে কুঁকড়ে দিয়েছিল। চিন্তাভাবনা, মন, সব অসাড় করে দিয়েছিল। ভয়ের গোলকধাঁধায় চাচা দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেয়েছিল।

শুধু এইটুকুই চাচার মনে আছে।

ওই বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর পর চাচাকে সদর হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল। চারদিন পর চাচা সেরে ওঠে। তখন লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারে একটা গোটা রাত চাচা ওই কালো বাড়িতে কাটিয়েছিল। কারণ, গাঁয়ের লোকরা চাচাকে পরদিন ভোরবেলা বাড়ির সদরের লোহার গেটের কাছে পড়ে থাকতে দ্যাখে। চাচার জামাকাপড় ছেঁড়া ছিল, সারা গায়ে রক্তের দাগ ছিল। কপালে, হাতে, আঘাতের চিহ্ন ছিল।

কিন্তু সেরে উঠে চাচা কিছুই বলতে পারেনি। বাড়ির ভেতরকার ব্যাপার-স্যাপার সব ভুলে গেছে। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে স্লেটের লেখা মোছার মতন সেই ভয়ংকর স্মৃতিগুলো কেউ যেন মুছে দিয়েছে।

সেরে ওঠার পর প্রায় একমাস চাচা ঘেঁটে যাওয়া মন নিয়ে কষ্ট পেয়েছে। তারপর পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠলেও মনে না পড়ার সেই অস্বস্তিটা এত বছর পরেও যায়নি।

চাচার গল্প শুনতে-শুনতে বৃষ্টি আরও বেড়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে পলিথিন শিটের ছাদনা দেওয়া সাইকেল রিকশা প্যাঁক-প্যাঁক করতে-করতে চলে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে লাগানো একটা টিউবলাইট মিইয়ে যাওয়া আলো ছড়িয়ে অন্ধকার হটাতে চেষ্টা করছে। ব্যাঙের ডাকের একটানা ছন্দ কেটে দিয়ে একটা

মোটরবাইক ছুটে গেল।

চা খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কামালের হাতে পয়সা দিয়ে শানুরা উঠে পড়ল।

বৃষ্টির ধরন দেখে টুনটুন ভাবছিল দোকানের চালার নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি কমার জন্য অপেক্ষা করবে। কারণ, শানুর কাছে একটিমাত্র ছাতা—আর ওরা তিনজন। কিন্তু শানু আর অঙ্কিত অপেক্ষা করার পাত্র নয়। বিশেষ করে অঙ্কিত একটু যেন বেপরোয়া। বলল, 'দুর! এই বৃষ্টিতে ভিজলে কিস্যু হবে না।'

শুধু বলল নয়, বলতে-বলতে নেমে গেল রাস্তায়। মনিরুলচাচাকে হাত নেড়ে বলল, 'আসি, চাচা...।'

বাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাতে-চালাতে টুনটুন জিগ্যেস করল, 'চাচার কিছুই মনে নেই।'

'শুনলে তো—' অঙ্কিত বলল।

'ওই বাড়িটায় যারা ঢুকে আবার বেরিয়ে আসে তাদের আর কিছু মনে থাকে না—' আপনমনেই বলল টুনটুন, 'কিন্তু যে-দুজন লোক ঢুকে আর বেরোয়নি—তাদের?'

শানু হেসে বলল, 'আজব তো! ওই লোকদুটোর কী হয়েছে আমরা কী করে জানব।'

অঙ্কিত বলল, 'তুমি ওই বাড়িটায় ঢুকে পরীক্ষা করে দেখতে পারো তোমার সবকিছু মনে থাকছে কি থাকছে না—।'

কথাগুলো বলে অঙ্কিত হাসল। শানুও ওর সঙ্গে যোগ দিল।

কিন্তু টুনটুন হাসল না। ও তখনও চাচার কথাগুলো ভাবছিল। চাচার সারা গায়ে রক্তের দাগ ছিল। জামাকাপড় ছিল ছেঁড়া। কপালে-হাতে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ওগুলো হল কেমন করে? তা হলে বাড়িটার ভেতরে কি কোনও হিংস্র জানোয়ার আছে?



পরদিন বিকেল চারটে থেকে বিপ্লবী সংঘের ফুটবল ম্যাচ। শানুর সঙ্গে টুনটুন সময় মতো বেরিয়ে পড়ল। শানুর জ্বর কমে গেছে। বাড়িতে মা-কে বারবার করে বলে এসেছে যে, ও খেলতে নামবে না—মাঠের ধারে টুনটুনের সঙ্গে বসে শুধু খেলা দেখবে। কিন্তু মাঠে এসে জার্সি পরা বন্ধুবান্ধব

আর সাদা ফুটবলটা দেখে শানুর মাথাটা বিগড়ে গেল। ও টুনটুনের পাশ থেকে ছুটে চলে গেল অঙ্কিতের কাছে। অঙ্কিত আর তিনটে ছেলের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বলে ও জার্সি পরে তৈরি হয়ে গেল খেলার জন্য।

টুনটুন 'শানুদা, শানুদা' করে ডাকতেই ও ছুটে চলে এল মাঠের ধারে। চাপা গলায় বলল, 'অ্যাই, মা-কে বলবি না কিন্তু। তোকে বেণুদার রেস্টুরেন্টে ফিশ ফ্রাই খাওয়াব—।'

টুনটুন জবাবে হাসল। ফুটবল খেলা ওর ততটা পছন্দের না হলেও ওর মনে হচ্ছিল জার্সি আর কেড্‌স পরে ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ে।

একটু পরেই রেফারি বাঁশি বাজিয়ে ম্যাচ শুরু করল। বিপ্লবী সংঘ বনাম রক্তিম ইউনাইটেড। একদিকে লাল-সাদা জার্সি, অন্যদিকে নীল-হলুদ। জল-কাদা ভরা মাঠে কাদা-মাখা ফুটবলটা ছোটাছুটি করতে লাগল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে প্লেয়াররাও। থেকে-থেকে রেফারির বাঁশি বাজতে লাগল।

কোথা থেকে যেন কিছু দর্শকের দল জুটে গিয়েছিল। খেলার ওঠা-নামার তালে-তালে তাদের চিৎকারও উঠছে-নামছে। কেউ-কেউ প্লেয়ারদের নাম ধরে চেঁচিয়ে নানান নির্দেশ দিচ্ছে। টুনটুনের মনে হল, স্রেফ মুখে-মুখেই ওরা তীব্র উত্তেজনাময় ফুটবল খেলে চলেছে।

দর্শকদের মধ্যে চার-পাঁচজন মেয়েকে চোখে পড়ল। তার মধ্যে একটি লম্বামতন মেয়েকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী মনে হল। অঙ্কিতের পায়ে বল গেলেই ও উত্তেজিতভাবে চিৎকার করছে। 'দাদাভাই, দাদাভাই' বলে চেঁচিয়ে ডেকে ওর মূল্যবান পরামর্শ ছুড়ে দিচ্ছে।

মেয়েটি ফরসা। লম্বাটে মুখ। চোখদুটো বড়-বড়। মাথার চুল হর্সটেইল করে বাঁধা। পরনে সবুজ-কালো ছাপ-ছাপ একটা চুড়িদার। দেখে মনে হয় ক্লাস সেভেন কি এইটে পড়ে।

টুনটুনের মনে হয়েছিল মেয়েটি অঙ্কিতের বোন হতে পারে। শুধু 'দাদাভাই' শব্দটা ছাড়াও অঙ্কিতের মুখের সঙ্গে মেয়েটির মুখের বেশ মিল খুঁজে পেল ও। তবে একেবারে সুনিশ্চিত হওয়া গেল হাফটাইমের সময়।

অঙ্কিত মাঠের ধারে আসতেই মেয়েটি ওর পরামর্শ আর বকুনি নিয়ে 'দাদাভাই'-এর ওপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। অঙ্কিত হেসে ওর চুল টেনে দিয়ে সব টরচার সহ্য করতে লাগল।

হঠাৎই ও মুখ ফিরিয়ে টুনটুনের দিকে তাকিয়ে ওকে কাছে ডাকল, বলল, 'এদিকে এসো। এই যে—আমার ছোট বোন দিশা—ইন্ডিয়ার প্রথম লেডি ফুটবল কোচ। অবশ্য জানি না ওর আগে কেউ আছে কি না। ও আসলে

আমার ছোট বোন নয়—দিদি...আবার দিদিমাও বলতে পারো...।'

টুনটুন হাসল দিশার দিকে তাকিয়ে। ততক্ষণে অঙ্কিত সংক্ষেপে টুনটুনের পরিচয়ও দিয়ে ফেলেছে। বলেছে, ও তিলকপুরের গেস্ট। এখানে সবে বেড়াতে এসেছে। কালো বাড়িটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড।

এটুকুই বোধহয় যথেষ্ট ছিল। হাফটাইমের পর খেলা শুরু হতেই দিশা টুনটুনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর ডানদিকে টুনটুন, আর বাঁ-দিকে অন্য বন্ধুরা।

দিশা বলল, 'আগে খেলাটা শেষ হোক, তারপর তোমাকে কালো বাড়িটার ব্যাপারে বলছি। আমার মা বলে বাড়িটা ভীষণ জাগ্রত—মানে জীবন্ত।'

টুনটুন ভেবে পাচ্ছিল না একটা বাড়ি কেমন করে জাগ্রত হতে পারে। মায়ের কাছে বেশ কয়েকবার শুনেছে জাগ্রত মা-কালীর কথা। কিন্তু...?

একটু পরেই ওর মনে 'হল, কোনও 'কিন্তু' নেই। দেবতা যদি জাগ্রত হতে পারে তা হলে অপদেবতা কেন নয়!

ফুটবল খেলা নিয়েও অনেক বকবক করছিল দিশা। খুব ছোট থেকেই ও ফুটবলের পোকা। তখন ও ছেলেদের সঙ্গে জোট বেঁধে মাঠে বল পেটাপিটি করত। এখন টিভির খেলা আর পাড়ার খেলা দেখে সাধ মেটায়।

বিপ্লবী সংঘ তিন গোল দিল, রক্তিম ইউনাইটেড দিল একটা। অঙ্কিতদের প্রতিটি গোলের সময় দিশা হাততালি দিয়ে পিংপং বলের মতো লাফাচ্ছিল আর চিৎকার করছিল। টুনটুনের মনে হচ্ছিল, গোলগুলো যেন ওই তিড়িং-বিড়িং মেয়েটাই দিয়েছে।

খেলার শেষের দিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখন বড়জোর আর মিনিট পাঁচ-সাত বাকি। সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে খুলে গেল একরাশ কালো আর রঙিন ছাতা। টুনটুনের সঙ্গে ছাতা ছিল না। কিন্তু দিশার সঙ্গে ছিল। ও টুনটুনকে ওর ছাতার নীচে ডেকে নিল।

খেলা ভাঙার পর দিশা টুনটুনকে বলল, 'আমাদের বাড়ি চলো। তুমি গেলে মা-বাবা খুব খুশি হবে।'

টুনটুন শানুর কথা বলতেই দিশা বলল, 'ওদের দেরি হবে। তার চেয়ে দাদাভাইকে বলে দিই শানুদাকে নিয়ে চলে আসবে। তারপর তুমি আর শানুদা একসঙ্গে ফিরে যেয়ো—।'

দিশার কথাবার্তার মধ্যে কেমন একটা সরলতা আর মোলায়েম আদেশ মিশে ছিল। যার জন্য ওর যে-কোনও প্রস্তাবে 'না' বলা কঠিন। টুনটুন ওকে দেখছিল আর ভাবছিল এত টগবগে এনার্জি মেয়েটা পায় কোথা থেকে!

ওদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে কালো বাড়িটা নিয়ে নানান গল্প শোনাল দিশা। ওর স্কুলের বন্ধুরাও এরকম অনেক গল্প বলে। তবে গল্পগুলো সত্যি কি মিথ্যে বলা কঠিন।

টুনটুন বলল, 'গল্পগুলো শুনতে কিন্তু খারাপ লাগছে না। বইয়ের গল্পের মতন। আসলে বাড়িটা ওইরকম দেখতে বলে এতরকম ছমছমে গল্প তৈরি হয়েছে। পরে হয়তো দেখা যাবে বাড়িটা খুব ভালো—প্লেইন অ্যান্ড সিম্প্‌ল...।'

দিশা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তা হলে মনিরুলচাচার গল্পটা?'

ওটা নিয়েই টুনটুনের একটু অসুবিধে হচ্ছিল। ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ওটা ঠিকমতো এক্সপ্লেইন করতে গেলে আরও খবর দরকার। কেউ যদি বাড়িটার ভেতরে ঢুকে একটু ইনভেস্টিগেট করত তা হলে...।'

'ওরে বাবা! তোমার তো দেখছি সাহস কম নয়!'

টুনটুন হেসে বলল, 'না, আমার সাহস কম। আমার বাপির সাহস আমার চেয়ে অনেক বেশি—।'

'তাই?' চোখ বড়-বড় করল দিশা। তারপর সামনের একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'এই যে—এটা আমাদের বাড়ি।'

অঙ্কিতদের বাড়িতে গিয়ে হইহই করে অনেক সময় কেটে গেল। চারজনে মিলে তুমুল তর্কবিতর্ক আর আলোচনা হল। বিষয় কালো বাড়ি আর আজকের ফুটবল ম্যাচ।

ওদের বাড়ি থেকে টুনটুন আর শানু যখন রওনা হল তখন রাত প্রায় আটটা। ওদের পায়ের নীচে আঁকাবাঁকা পিচের রাস্তা। তার নানান জায়গায় ছাল ওঠা। ইটের টুকরো বেরিয়ে পড়েছে। এখানে-ওখানে জল জমে আছে। আর আলো বলতে ধুলোর আস্তরে মলিন হয়ে যাওয়া টিউবলাইট। লাইটগুলো এত দূরে-দূরে যে, একের আলো অন্যকে ছুঁতে পারছে না।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ওদের সঙ্গে একটা ছাতা ছিল বলে অঙ্কিতদের বাড়ি থেকে আরও একটা ছাতা ধার নিয়ে এসেছে।

শানু হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে তেরছাভাবে বেরিয়ে একটা কাঁচা পথ ধরল। ছোট্ট করে বলল, 'এটা শর্টকাট, বুঝলি?'

শর্টকাট সবারই পছন্দের। কিন্তু চারপাশটা যেন বড় বেশি অন্ধকার। তার সঙ্গে এলোমেলো গাছপালা, বড়-বড় ঘাস আর একঘেয়ে ব্যাঙের ডাক।

জল-কাদায় পা ফেলতে-ফেলতে টুনটুনের মনে একটা অচেনা ভয় চারিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সঙ্গে একটা টর্চ থাকলে ভালো হত।

বেশ কিছুটা এগোনোর পর একটা বিশাল পুকুর দেখতে পেল ওরা। এখানে

মেঘ আর অন্ধকার এত গাঢ় যে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি না পড়লে পুকুরটাকে পুকুর বলে বোঝা যেত না।

চলতে-চলতে টুনটুন পুকুরটার দিকে দেখছিল। সেটা লক্ষ করে শানু বলল, 'এটা কালু হালদারদের পুকুর। এই এলাকার বেশিরভাগটাই ওদের জমি। শুনেছি এককালে ব্যাপক বড়লোক ছিল—এখন শুধু কয়েক বিঘে জমিজমা পড়ে আছে...।'

শানু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা আর বলা হল না। একটা চাপা বাঁশির সুর ওকে থামিয়ে দিল।

শুধু কথা নয়, চলাও থামিয়ে দিয়েছিল শানু। ওর দেখাদেখি টুনটুনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এ কি সেই বাঁশির সুর—যে বাঁশির সুরের কথা শানুদা বলছিল? যে-বাঁশির টানের কথা গতকাল মনিরুলচাচা গল্প করেছে?

শানু চাপা গলায় বলল, 'ওই বাঁশি বাজছে! চল, আমরা ফিরে যাই—।'

টুনটুন জিগ্যেস করল, 'কেন, বাঁশির আওয়াজে ভয় কীসের?'

'যদি টেনে নেয়? তোকে সেদিন বলছিলাম না—।'

'কোনদিকে টানবে?'

টুনটুনের দিকে ঘুরে তাকাল শানু ঃ 'কেন, কালো বাড়িটার দিকে। মনিরুলচাচা কাল বলল শুনিসনি?'

বাঁশির সুরটার মধ্যে অপার্থিব কিছু ছিল না। তবে চোস্ত হাতে কেউ বাঁশিটা বাজাচ্ছিল। চাচা ঠিকই বলেছিল—বুকফাটা সুরেলা কান্না। অতল গহ্বরের কোনও কারাগার থেকে কয়েকশো বছরের পুরোনো কোনও বন্দি আকুল হয়ে মুক্তি চাইছে। তার তোলা বাঁশির সুর কোমল আর্তিতে যেন আকাশে, বাতাসে, গাছের পাতায়, পুকুরের জলে মাথা খুঁড়ে মরছে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বাঁশির সুরটা অদৃশ্য এক সরীসৃপ হয়ে মোলায়েম সাবলীল গতিতে অলসভাবে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সবকিছুকে যেন এক অলৌকিক প্রবল আকাঙ্ক্ষায় জড়িয়ে ধরতে চাইছিল।

টুনটুনের সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। বাঁশির সুরটা ঠিক কোনদিক থেকে ভেসে আসছে সেটা ও কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিল না। বৃষ্টির মধ্যেই ও চোখ সরু করে চারপাশটা খুঁটিয়ে নজর করে লুকিয়ে থাকা অলৌকিক বাঁশিওয়ালাকে খুঁজছিল।

শানু আবার বলল, 'চল, ফিরে চল। এই রাস্তায় আর এগোব না—রিস্‌ক হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুই সঙ্গে আছিস। কোনও একটা কেস হয়ে গেলে...'

ঠিক তখনই টুনটুনের চোখ একটা জায়গায় আটকে গেল। সেদিকে তাকিয়ে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের কাছ থেকে তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরে পুকুরপাড়ে একটা বিশাল অন্ধকার গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছটা পুকুরের দিকে অনেকটা ঝুলে রয়েছে। বহুদূর থেকে ছিটকে আসা টিউবলাইটের আলো হালকা জ্যোৎস্নার মতো গাছের ভিজে পাতা আর ডালে লেপটে আছে।

পুকুরের দিকে ঝুলে পড়া একটা বড়সড় ডাল টুনটুনের নজর কেড়েছিল। ওর মনে হল, সেই ডালে কিছু একটা যেন পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে।

ও শানুর জামা ধরে টান মারল : 'শানুদা, ওটা কী দ্যাখো তো—।' আঙুল তুলে গাছটার দিকে দেখাল টুনটুন।

শানু ভালো করে নজর চালিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ রে, ওই ঝুলে পড়া ডালটায় কী একটা যেন জড়িয়ে রয়েছে—।'

'সাপ-টাপ হতে পারে?'

'উঁহু—বৃষ্টির মধ্যে সাপ অত কষ্ট করে ওপরে বেয়ে উঠে গাছের ডাল জড়িয়ে থাকবে কেন? ওটা অন্য কিছু—।'

শানুর কথা শেষ হতে-না-হতেই টুনটুন একটা কাণ্ড করে বসল। পায়ের কাছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা বড় ঢিল কুড়িয়ে নিল। ছাতাটা খোলা অবস্থাতেই পাশে নামিয়ে রাখল। তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ঢিলটাকে গাছ লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।

ঠিক লক্ষ্যভেদ না হলেও ঢিলটা কাছাকাছি পাতা বা ডালে গিয়ে ঠোক্কর খেল। কারণ, সংঘর্ষের চাপা শব্দটা ওরা শুনতে পেল।

আর ঠিক তখনই বাঁশির সুর থেমে গেল। যেন অলৌকিক বাঁশিওয়ালাকে ঢিল মেরে কেউ থামিয়ে দিয়েছে।

ঝুঁকে পড়ে ছাতাটা তুলে নিল টুনটুন। দেখল, সেই গাছের ডাল থেকে কী একটা যেন সরসর করে নেমে যাচ্ছে।

শানু হঠাৎই ওর হাত ধরে টান মারল, বলল, 'চল তো, একটু এগিয়ে দেখি—।'

এগিয়ে দেখি! তার মানে?

টুনটুন এই কথাগুলো ভাবতে না ভাবতেই শানু আবার ওর হাত ধরে টানল। তারপর চটপটে পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেল।

তখনই ওরা স্পষ্ট দেখল গাছের ডাল বেয়ে অনেকটা নেমে এসে সেই 'কী একটা যেন' পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়ল।

'ঝপাৎ' শব্দ হল। ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

পুকুরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল শানু আর টুনটুন।

জল নড়ছে, ফুলে উঠছে, নামছে—কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা জলের ওপরে সূক্ষ্ম নকশা বুনে চলেছে।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর টুনটুন জিগ্যেস করল, 'শানুদা, জলে ঝাঁপ দিল ওটা কী? সাপ?'

'সাপের মতো...কিন্তু সাপ জলে ঝাঁপ দিলে ওরকম ঢেউ ওঠে না। ওটা অন্য কিছু। আগে কখনও আমি দেখিনি...কেউ দেখেনি।'

'তুমি খেয়াল করেছ, ঢিল ছোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাঁশি থেমে গেছে। তা হলে কি ওই জিনিসটাই বাঁশি বাজাচ্ছিল?'

'জানি না—আমি কিছু জানি না।'

টুনটুন চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কালো বাড়িটা এখান থেকে কতদূরে, শানুদা?'

শানু হাত তুলে একদিকে দেখাল ঃ 'বেশ দূরে। ওইদিকে।'

বেশ কিছুক্ষণ ওরা পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। পাড়ের দিকে নজর রাখতে লাগল—পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রাণীটা জল থেকে ওঠে কি না।

কিন্তু আর কিছু দেখতে পেল না।

একসময় শানু বলল, 'এবার চল—রাত হয়ে যাচ্ছে।'

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফেরার পথে শানু আবার বলল, 'এসব কথা কাউকে বলিস না, বুঝলি?'

টুনটুন বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ল।

ঠিক তখনই বৃষ্টিটা আরও জোরে নামল।



কী করে যেন কালো বাড়িটা টুনটনের মাথায় চেপে বসতে লাগল। বারবার ওর মনে হতে লাগল, বাড়িটা ওকে টানছে। চোখের সামনে বসে আছে একটা জমাট রহস্য, অথচ সেটা কেউ তলিয়ে দেখতে চাইছে না। বাড়িটাকে এত ভয় পায় সবাই!

শানু আর অঙ্কিতের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা বলেছে টুনটুন। একদিন রাগ করে এ-কথাও বলেছে, 'শানুদা, তোমরা তোমাদের ক্লাবের নামটা পালটে ফ্যালো। নাম রেখেছ "বিপ্লবী সংঘ" অথচ ওই বাড়িটায় ঢুকতে ভয় পাও। তোমরা...।'

'শোন—' শানু বলল, 'আমরা ভয় ঠিক পাই না—তবে...মানে, শুধু-শুধু বাড়িটাকে ডিসটার্ব করে কী লাভ! বাড়িটা যেমন আছে থাক না নিজের মনে...।'

'শুধু বাড়ি কেন?' পালটা তর্কে মেতে উঠল টুনটুন। কপালে নেমে আসা চুল সরিয়ে বলল, 'সেদিন রাতের কেসটা কী হল? ওই যে, গাছ থেকে সাপের মতো জিনিসটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল...বাঁশির আওয়াজ থেমে গেল...।'

অঙ্কিত অবাক হয়ে শানুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার রে?' ওর ভুরু কুঁচকে গেল।

তখন শানু আমতা-আমতা করে ঘটনাটা জানিয়েছে। অঙ্কিত টু শব্দ না করে একমনে শানুর কাহিনি শুনেছে। শুনতে-শুনতে আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করেছে।

টুনটুনের উৎসাহ আর খোঁচায় কালো বাড়িটা নিয়ে নানান খোঁজখবর নিতে শুরু করল শানু আর অঙ্কিত। জানা গেল, ঠিক ওইরকম একটা অদ্ভুত প্রাণীকে এলাকার আরও দু-একজন দেখেছে। তবে তারা প্রত্যেকেই কোন এক অপদেবতার ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে চেয়েছে।

কালো বাড়ি ছাড়া তিলকপুরে আরও যা কিছু দেখার আছে সেসব টুনটুনকে ক'দিন ধরে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল শানু। যেমন, দেড়শো বছরের পুরোনো একটা শিবমন্দির—যেখানে শিবরাত্রির সময় অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়। আশপাশের বহু এলাকা থেকে দলে-দলে সবাই আসে শিবের পুজো দিতে।

তারপর তিলকপুরের স্কুল, বাজার, রবিবারের পশু-পাখির হাট, ফুলচাষের বাগান—কিছুই দেখাতে বাকি রাখল না।

সব দেখানো শেষ হলে শানু বলেছিল, 'তবে আমাদের এখানে সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিসটা তুই সবার আগে দেখে ফেলেছিস। কালো বাড়ি। কিন্তু এটার কথা কেউ ডিসকাস করে না—যদিও প্রায় সবাই জানে।'

রবিবার বেলার দিকে হাটে ঘুরে বেড়োচ্ছিল ওরা তিনজন। বিশাল এলাকা জুড়ে হাট বসেছে। জায়গাটা একটা ফাঁকা মাঠ। তার মাঝে-মাঝে বড়-বড় গাছ, আর কয়েকটা চালাঘর—টিন অথবা চাটাইয়ের ছাউনি দেওয়া।

হাটে বেশ ভিড়। বিক্রির আশায় অনেকেই তাদের গোরু-বাছুর, ছাগল, কুকুর নিয়ে এসেছে। এ ছাড়া আছে নানান রঙের পাখি। খদ্দেররা ঘুরে-ঘুরে পশু-পাখি পরখ করে দেখছে। চারপাশে কিচিরমিচির ট্যাঁও-ট্যাঁও করে হরেকরকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে কখনও-কখনও ছাগলের ডাক বা গোরুর হাম্বা রব।

টুনটুনের অদ্ভুত লাগছিল।

বর্ষার ছাই-রঙা আকাশ। বেলা বারোটার সময়েই গোধূলির আলো ছেয়ে আছে। মানুষজনের ভিড়। পশু-পাখির ডাক। সবমিলিয়ে এক জ্যান্ত ছবি।

ওরা পাখি দেখছিল। হঠাৎই প্রচণ্ড শোরগোল শুনে চমকে ফিরে তাকাল।

দেখল হাটের লোকজন দিশেহারা হয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটছে। আর পাগলের মতো চিৎকার করছে।

ওদের তিনজোড়া চোখ এই ডামাডোলের কারণ খুঁজছিল। কয়েক সেকেন্ড পরই দেখতে পেল একটা স্বাস্থ্যবান কালো বলদ খেপে গিয়ে এলোমেলো দৌড়চ্ছে। তারই গুঁতোর ভয়ে লোকজনের ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

ওরা তিনজন ছুটে পিচের রাস্তায় চলে এল। একটা দোকানের সামনের রোয়াকে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

রোয়াকে আরও দু-চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের জিগ্যেস করে জানা গেল ওই এলোমেলো ছুটে বেড়ানো কালো বলদটার নাম মনু। ওটা বদন ঘড়াইয়ের বলদ। প্রচণ্ড গরমে মাঠে লাঙল দিয়ে-দিয়ে নাকি পাগল হয়ে গেছে। ওকে সারিয়ে তোলার জন্য বদন অনেক ঝাড়ফুঁক করিয়েছে। কবিরাজের সালসা আর মোদক খাইয়েছে। এখন কী একটা ইনজেকশান দিয়ে চিকিৎসা চালাচ্ছে।

বদন প্রতি সপ্তাহের হাটে বলদটাকে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে। কিন্তু কপাল খারাপ—এখনও বিক্রি হয়নি।

মনু তখনও লেজ খাড়া করে দৌড়চ্ছে। আর রোগা-সোগা টাকমাথা একজন লোক তার পিছন-পিছন মরিয়া হয়ে ছুটছে, আর মাঝে-ম্যাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে নিজের লুঙ্গি সামাল দিচ্ছে।

জটলার মধ্যে একজন আঙুল তুলে সেদিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে...মনুর পেছনে দৌড়চ্ছে...বদন ঘড়াই...।'

লোকজন দৃশ্যটা দেখছিল, হাসাহাসি করছিল। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, এই খ্যাপা বলদটা গোটা এলাকাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। এটাকে দূরের কোনও গ্রামে চুপিচুপি ছেড়ে দিয়ে এলে বদন ভালো করত। তার জবাবে কে যেন বলল, সেটা হওয়ার নয়। কারণ, মনুকে বদন দারুণ ভালোবাসে।

এসব কথাবার্তার মধ্যেই মনু এবং তার মালিক হাটের লন্ডভন্ড এলাকা ছাড়িয়ে দূরে গাছগাছালির মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

হাট থেকে ফেরার পথে শানু ঠাট্টা করে বলল, 'যাক, ফ্রি-তে একটা সিনেমা দেখা হয়ে গেল। সিনেমাটার নাম "পাগলা বলদ"।'

টুনটুন আর অঙ্কিত হেসে উঠল। কিন্তু একইসঙ্গে টুনটুনের মনে হচ্ছিল,

স্নেহ-ভালোবাসা বড় মারাত্মক জিনিস। বোধহয় সবকিছুর চেয়ে বড়।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক দু-দিন পরে। বিকেলে।

সেদিন বৃষ্টি ছিল না—তবে আকাশে সাজানো-গোছানো মেঘ ছিল। টুনটুন আর দিশা হেঁটে যাচ্ছিল অঙ্কিতদের বাড়ির দিকে। অঙ্কিত আর শানু ওদের সঙ্গে ছিল না। ওরা গেছে সাইকেলের দোকানে—অঙ্কিতের সাইকেলের বেয়ারিং সারাতে। অঙ্কিত বলেছে, 'তোরা এগো—আমরা একটু পরেই তোদের পথে ধরে নেব...।'

টুনটুন ওর স্কুলের কথা বলছিল। বলছিল ওর স্যারদের কথা। স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস-এর সময় কীরকম হুইহুল্লোড় আর মজা হয় সেসব কথা শোনাচ্ছিল।

ওদের পাশ দিয়ে বেল বাজিয়ে দু-একটা সাইকেল যাচ্ছিল। একটা মোটরবাইক কানে তালা ধরিয়ে আঁকাবাঁকা রেখায় কায়দা দেখিয়ে ছুটে গেল। দিশা বলল, 'ওটা বিকাশদা। দারুণ বাইক চালায়...।'

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে আরও খানিকটা এগোতেই টুন-টুন বহুদূরে কালো বাড়িটাকে দেখতে পেল।

ও বলল, 'চলো, ওটার কাছ দিয়ে যাই।'

দিশা ওর দিকে তাকিয়ে একটু দেখল। বলল, 'খুব ইন্টারেস্ট, না?'

'হ্যাঁ—তা একটু আছে।'

'তুমি ভূতুড়ে বাড়ি ভয় পাও না?'

'কে জানে! বাড়ির বাইরে থেকে তো পাই না।' মাথা ঝাঁকাল টুনটুন ঃ 'ভেতরে ঢুকলে ভয় পাব কি না সেটা ডিপেন্ড করছে...।'

দিশা আর কিছু বলল না। ওকে নিয়ে বাঁ-দিকের একটা কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়ল।

এমন সময় দূর থেকে টুনটুনের নাম ধরে কেউ ডাকল।

ওরা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল অঙ্কিত আর শানু—হাসছে, হাত নাড়ছে। ইশারায় বলল, 'তোরা এগিয়ে যা—আমরা পেছনে আছি।'

টুনটুনরাও হাত নাড়ল। তারপর এগিয়ে চলল।

পথের দুপাশে কাছে-দূরে ছোট-বড় অনেক গাছ। তারই মাঝে এখানে-ওখানে কয়েকটা বাড়ি। বেশিরভাগই একতলা। কয়েকটা বাড়ির মাথায় টিনের বা টালির চাল।

পথের ওপরে বাচ্চারা ছুটোছুটি করে খেলা করছে। দুটি মেয়ে টিউবওয়েল থেকে কলসিতে জল ভরছে। গাছের আড়ালে কোথায় যেন একটা কোকিল ডাকছিল।

টুনটুন অবাক হয়ে এসব দেখছিল। শহরের চেয়ে কত আলাদা! কী মোলায়েম!

একটু পরেই ওরা কালো বাড়িটার কাছাকাছি চলে এল। সামনেই ফাঁকা জায়গা। গাছপালার রাজত্ব। সেগুলো পেরিয়ে জং ধরা লোহার গেট।

দিশা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই পিছন থেকে কয়েকজন মানুষের চেঁচামেচি হইচই কানে এল। তার মধ্যে দু-চারজন বাচ্চার গলাও মিশে আছে।

ব্যাপারটা কী? পিছনে ফিরে তাকাল টুনটুন।

তাকিয়েই ভয়ে ওর প্রাণ উড়ে গেল। ওদের দিকে পাগলের মতো ধেয়ে আসছে একটা কালো পাহাড়। মনু। বদন ঘড়াইয়ের সেই খ্যাপা বলদটা।

'দিশা—ছোটো!' বলে চিৎকার করে যেদিকে দু-চোখ-যায় ছুটতে শুরু করল টুনটুন।

দিশা চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। এই খ্যাপা বলদটার কথা ও টুনটুনের মুখে শুনেছে।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল দিশার। ও চিৎকার করে দিশেহারা হয়ে এলোমেলো ছুটতে শুরু করল। বলদটা দিশারই পিছু নিল।

অনেকটা ছুটে যাওয়ার পর টুনটুন পিছন ফিরে দেখল। দিশা চিৎকার করছে, ছুটছে।

কিন্তু এবার টুনটুন আরও বেশি ভয় পেল। কারণ, মনুর ভয়ে পাগল হয়ে দিশা কালো বাড়িটার দিকেই ছুটে যাচ্ছে। বলদটার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। ওর সামনে আর কোনও আড়াল নেই, আশ্রয় নেই।

আগাছার জঙ্গলের মধ্যে টুনটুন দাঁড়িয়ে পড়ল। ও কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এবং ওর অবাক চোখের সামনে লোহার দরজার দু-পাল্লার ছোট ফাঁক দিয়ে দিশা কালো বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ল।

বলদটা প্রবল আক্রোশে ছুটে গেল সেই লোহার সিংদরজার দিকে। মাথা নীচু করে শিং বাগিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল দরজার পাল্লার ওপরে। সংঘর্ষের ধাতব শব্দ বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

দিশা আরও জোরে ভয়ংকর এক চিৎকার করে ঢুকে পড়ল কালো বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে।

টুনটুন কেঁপে উঠল। শিরশির করে একটা স্রোত বয়ে গেল ওর শরীরের ভেতর দিয়ে। ও 'দিশা! দিশা!' করে ডেকে উঠল।

বলদটা আরও দুবার দরজায় ঢুঁ মারল। তারপর ছুট লাগাল পাগলের মতো। ঝোপজঙ্গল খেত চিরে দৌড়তে লাগল।

ততক্ষণে মানুষজনের ভিড় জমে গেছে। কালো বাড়ির কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন তুলছে, বাড়িটার দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।

টুনটুন ছুটে গেল ওদের কাছে। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দিশাকে বাঁচান! একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। ওকে যে করে হোক সেভ করুন। পুলিশে খবর দিন। ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিন। কিছু একটা করুন—প্লিজ!'

কে একজন বলল, 'এখানে ফায়ার ব্রিগেড কোথায়? থানায় খবর দিতে পারো, তবে বড়বাবু আসবে বলে মনে হয় না...।'

আর একজন মন্তব্য করল, 'ও বাড়িতে ঢোকা মানে জান বন্ধক দেওয়া।'

'মেয়েটা মরতে ও-বাড়িতে ঢুকতে গেল কেন? পাশ দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে পালাতে পারল না?'

'একটু পরেই তো সব আঁধার হয়ে যাবে। তারপর কি আর ও-বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে?'

এসব মন্তব্য শুনতে-শুনতে টুনটুন যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিল। ও চট করে আকাশের দিকে তাকাল। সন্ধে নামতে এখনও বোধহয় আধঘণ্টাখানেক বাকি। আকাশে মেঘ না থাকলে হয়তো আরও দশ-পনেরো মিনিট পাওয়া যেত। কিন্তু...।

তা হলে কি ও থানায় ছুটে যাবে?

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই শোনা গেল মেঘের গুড়ুম-গুড়ুম।

তখনই শানু আর অঙ্কিতকে দেখতে পেল টুনটুন। ও ছুটে ওদের কাছে গেল। বলল বদন ঘড়াইয়ের খ্যাপা বলদ মনুর কথা আর দিশার কথা।

বলতে-বলতে টুনটুনের চোখে জল এসে গেল। অঙ্কিত ভীষণ ঘাবড়ে গেল। আর শানু বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে।

অঙ্কিত পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে বাড়িতে ফোন করল। মা-কে দিশার খবরটা দিয়ে বলল, ওর বাবা যেন এক্ষুনি থানায় খবর দেন।

শানুও মোবাইল ফোনের বোতাম টিপতে লাগল। মা ফোন ধরতেই বলল, 'অঙ্কিতের ছোট বোনটা ভীষণ বিপদে পড়েছে। আমি আর টুনটুন এখানে আছি। ফিরতে দেরি হবে।'

অনিতা জিগ্যেস করলেন, 'কী বিপদ হয়েছে?'

'দিশা—অঙ্কিতের বোন—কালো বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।'

'কালো বাড়িতে? বলিস কী!'

শানু আর কথা না বাড়িয়ে আচমকা ফোন রেখে দিল।

অঙ্কিত ততক্ষণে দুটো ছেলেকে থানায় রওনা করে দিয়েছে। বলেছে, বড়বাবুকে ব্যাপারটা বলে যেমন করে হোক স্পটে নিয়ে আসতে।

টুনটুন লক্ষ করল, অঙ্কিতের মুখ ফ্যাকাসে, দিশেহারা। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ও শানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শানুদা, শিগগির চলো। এখনও আলো আছে। বাড়িটার ভেতরে ঢুকে দিশাকে নিয়ে আসি। এরপর সন্ধে হয়ে গেলে...।'

অঙ্কিত ইতস্তত করতে লাগল। দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন পরামর্শ শুনতে চাইল।

টুনটুন অঙ্কিতের কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে টান মারল : 'অঙ্কিতদা, জলদি করো! দেরি হয়ে গেলে দিশার যদি কিছু একটা হয়ে যায়...প্লিজ...।'

টুনটুনের গলা ভেঙে গেল। চোখে জল এসে পড়ল।

তখনই ও খেয়াল করল, অঙ্কিতের চোখও শুকনো নেই।

এমন সময় শানু আর অঙ্কিত দুজনেরই মোবাইল বাজতে শুরু করল। ওরা চটপট ফোন ধরে কথা বলতে শুরু করল।

কথা শুনে টুনটুন বুঝতে পারল ওরা ওদের বাবার সঙ্গে কথা বলছে।

অঙ্কিত ফোনে কথা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল। বলল, 'তোমরা যা করার তাড়াতাড়ি করো। এদিকে আমরা দেখছি...।' তারপর ফোন কেটে দিল।

শানুও একই ধরনের কথা বলে ফোন শেষ করল।

অঙ্কিত চোখ মুছল। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। তারপর বলল, 'চল—।' বলে কালো বাড়িটার দিকে এগোল।

টুনটুন আর দেরি করল না। শানুর হাত ধরে একটা টান মেরে অঙ্কিতের সঙ্গে এগোল।

জনতার ভিড় থেকে রব উঠল, 'যেয়ো না! ও-বাড়িতে ঢুকো না! আগে পুলিশ আসুক...।'

অঙ্কিত একপলকের জন্য পিছন ফিরে তাকাল শুধু। কোনও কথা বলল না। উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখল। দিশা ওর ছোট বোন—ওদের নয়।

আবার কালো বাড়িটার দিকে পা চালাল অঙ্কিত। সঙ্গে শানু আর টুনটুন।

জল-কাদা আর ঘাস মাড়িয়ে ওরা বেশ কষ্ট করে এগোতে লাগল। টুনটুন কান পেতে শুনতে চাইল দিশার চিৎকার।

শানু বলল, 'পুলিশ এখুনি এসে পড়বে।' ওর কথাটা অনেকটা ভরসা খোঁজার মতো শোনাল।

একটু পরেই ওরা বাড়ির সিংদরজায় পৌঁছে গেল। অঙ্কিত দিশার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল। তারপর পালা করে টুনটুন আর শানুও চেঁচাল। কিন্তু দিশার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

অঙ্কিত আচমকা একটা সাহসের জোয়ার দেখিয়ে গটগট করে ঢুকে পড়ল বাড়ির এলাকায়। টুনটুন আর শানুও দেরি করল না।

বাড়িটার এত কাছে এসে শ্যাওলা ধরা দেওয়ালগুলো আরও ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল টুনটুন। ভিজে চকচকে জমাট শ্যাওলা। সেইসঙ্গে ছাতা ধরা গন্ধটা ভয়ংকর তীব্র হয়ে নাকে আসছিল।

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ওরা খোলা জায়গাটা পেরিয়ে গেল। সামনেই কালো বাড়ির কালো রঙের বিশাল সদর দরজা। দরজার পাল্লায় বেশ কয়েকটা লোহার গজাল বসানো। ওগুলোর মাথা বিষফোঁড়ার মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। পাল্লা দুটোর নানান জায়গায় ফাটল ধরা। এখানে-ওখানে কাঠের চটা উঠে গেছে। ধুলো আর ময়লায় দরজাটা মলিন। দরজার ফ্রেমের কোনা থেকে ছোট-বড় গাছ বেরিয়ে গেছে।

দরজার পাল্লা দুটো বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে। এই ফাঁক দিয়েই দিশা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে। ওরা নজর চালিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিকষ অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

অঙ্কিত দরজার ফাঁকের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে ডাকল : 'দিশা—! দিশা—!'

কোনও সাড়া নেই।

টুনটুন দিশার নাম ধরে ডাকল দুবার।

কোনও উত্তর নেই।

'চল—' বলে দরজার একটা পাল্লা ঠেলে দিল অঙ্কিত। তারপর কালো বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ওর পিছন-পিছন শানু আর টুনটুনও ঢুকে পড়ল।

ওরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে দিশার নাম ধরে ডেকে চলল। সেই চিৎকারের মধ্যে মনের ভয় তাড়ানোর চেষ্টাও খানিকটা মিশে ছিল। ওদের চিৎকারের উত্তরে ফাঁপা প্রতিধ্বনি ফিরে এল বারবার।

এমনসময় আকাশের মেঘ ডেকে উঠল। বিকট শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। কালো বাড়ির সদর দরজাটা হঠাৎ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ওরা তিনজন চমকে ফিরে তাকাল। শানু আর টুনটুন ছুটে গেল দরজার দিকে। দরজাটা টেনে খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু ভেতর থেকে ধরে টানার মতো কোনও কড়া কিংবা হাতল খুঁজে পেল না।

তখন ওরা দরজার পাল্লায় জোরে-জোরে কয়েকবার ধাক্কা মারল, কিন্তু ভারী দরজাটা সে-ধাক্কাকে পাত্তা দিল বলে মনে হল না।

শানু আর টুনটুন অঙ্কিতের কাছে এসে দাঁড়াল। শানু একটু ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'দরজাটা কে বন্ধ করল বল তো? আমরা তো আর এ-বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না...!'

অঙ্কিত কোনও উত্তর দিল না। বাড়ির ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

গোটা বাড়িটায় এক অদ্ভুতরকমের আলো ছড়িয়ে আছে। গোধূলির আলোর সঙ্গে একটু নীলচে রং মিশিয়ে দিলে বোধহয় এইরকম আলোই পাওয়া যাবে। কিন্তু আলোটা কোথা থেকে আসছে সেটা বোঝা গেল না।

ওরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা চওড়া করিডর মতন। তার দুপাশেই খাড়া কালো রঙের দেওয়াল। দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ আর ছাতা ধরা গন্ধ।

করিডর ধরে ওরা আরও একটু এগোল। অঙ্কিত দিশার নাম ধরে ডাকল দুবার, এবং যথারীতি কোনও সাড়া পেল না।

ওরা একটা সিঁড়ির সামনে এসে পড়ল। চওড়া কালো পাথরের সিঁড়ি। এবড়োখেবড়ো ধাপগুলো দোতলার দিকে উঠে গেছে।

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওরা ওপরে উঠতে শুরু করল। আর ঠিক তখনই ওরা খেয়াল করল, কোথা থেকে যেন একটা হালকা শব্দ ওদের কানে আসছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের মতো। খুব ঢিমে তালে কেউ যেন শ্বাস নিচ্ছে, আবার ছাড়ছে।

'কীরে, কোনও মেশিন-টেশিন চলছে নাকি?' অঙ্কিতের দিকে তাকিয়ে শানু জিগ্যেস করল।

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটাল অঙ্কিত ঃ 'কামারশালায় যেরকম শব্দ হয় অনেকটা সেই টাইপের—না?'

'হ্যাঁ—।'

ওরা দোতলায় উঠে এল। এবার বাড়ির ভেতরের চেহারাটা ওদের কাছে স্পষ্ট হল।

একতলায় ওরা কোনও ঘরের দরজা দেখেনি। অবশ্য সেভাবে খোঁজেওনি। কিন্তু দোতলায় এসে অনেকগুলো দরজা চোখে পড়ল। আরও বুঝতে পারল, বাড়িটা মাপে বিশাল।

বাড়িটার ভেতরের রকমসকম অনেকটা পুরোনো দুর্গের মতো। দোতলার লম্বা বারান্দাটা একটা প্রকাণ্ড বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা বরাবর পাক খেয়ে গেছে। বারান্দা থেকে নীচে তাকালে একটা খোলা জায়গা চোখে পড়ে। সেই চাতালের ঠিক মাঝখানে একটা চৌকো পুকুরের মতো। পুকুরটার পাড় বাঁধানো। আর পুকুরে নামার জন্য চারদিকেই পাথরের সিঁড়ি রয়েছে। পুকুরের চারকোণে চারটে বড়-বড় থাম। তার গায়ে নানান নকশা। তবে জায়গায়-জায়গায় সিমেন্ট খসে গেছে। শ্যাওলা ও ময়লা জমে নকশা চাপা পড়ে গেছে। এ ছাড়া থামগুলোয় জড়িয়ে রয়েছে নানান গুল্মলতা।

পুকুরের জলের রং যা-ই হোক, এখন সেটা কালো দেখাচ্ছে। আর বারান্দা থেকে ঝুঁকে পুকুরের দিকে তাকিয়ে ওরা কোনওরকম প্রতিফলন দেখতে পেল না।

জলে আকাশের ছায়া না দেখতে পেয়ে ওপরদিকে তাকাল টুনটুন। না, সেখানে খোলা আকাশ নেই। বরং রয়েছে ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড ঢাকনা। সেই ঢাকনার কোথাও-কোথাও ফাটল কিংবা গর্ত রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে আকাশের শেষ আলো চোখে পড়ছে।

ওরা তিনজন প্রথমে বারান্দাটা একটা চক্কর দিয়ে ফেলল। 'দিশা! দিশা!' করে বারকয়েক ডাকল। উত্তর দিল প্রতিধ্বনি।

অঙ্কিত বলল, 'চল, এবার ঘরগুলো খুঁজে দেখি। তারপর তিনতলাটা দেখব।'

শানু আর টুনটুন ওর কথায় সায় দিল।

দোতলায় ওঠার সময় সিঁড়ির ধাপ যে আরও ওপরদিকে উঠে গেছে সেটা ওরা খেয়াল করেছে। তবে টুনটুনের মনে প্রশ্ন জাগছিল, কালো বাড়িটা ক'তলা? বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখে ওর কখনও মনে হয়নি ওটা দোতলার বেশি। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঘোরাঘুরি করে ওর মনে হচ্ছে, তিনতলা কেন, বাড়িটা চারতলাও হতে পারে। তবে বাড়িটাকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ ও এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের ওই চাপা শব্দটা একটা অস্বস্তি তৈরি করছে। ওটা এখনও হয়ে চলেছে। টুনটুন ভাবল, সব ক'টা

ঘর তল্লাশি করে দেখলেই ওটার রহস্য ভেদ করা যাবে। হয়তো জানলা দিয়ে জোলো বাতাস ঢুকে ওরকম অদ্ভুত শব্দ তৈরি করছে।

দিশার নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে ওরা তিনজনে তিনটে ঘরের দরজা লক্ষ্য করে দৌড়ল।

বাড়ির ভেতরে কোথাও কোনও ইলেকট্রিক বাল্‌ব, টিউবলাইট কিংবা পাখা ওদের চোখে পড়েনি। শুধু তাই নয়, কোনও ওয়্যারিং বা সুইচবোর্ডও নেই। মনে হয়, এসব ব্যবস্থা এ-বাড়িতে কোনওকালেই ছিল না। তা হলে কি বাড়িটা মোমবাতি-হ্যারিকেন কিংবা প্রদীপ-কুপির যুগে তৈরি?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে টুনটুন একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরটা বেশ বড়। ঘরে একটা প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি। তার পাল্লার ওপরে দুটো লম্বা-লম্বা আয়না লাগানো। আর একদিকে একটা একমানুষ সমান আলনা। তাতে বেশ কয়েকটা নোংরা ছেঁড়া কাপড় ঝুলছে। আলনার উলটোদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড় পালঙ্ক। পালঙ্কে এলোমেলোভাবে পড়ে আছে দুটো বালিশ আর দুটো কোলবালিশ। দু-একটা বালিশের খোল ফেটে তুলো বেরিয়ে এসেছে। বিছানায় একটা সাদা চাদর পাতা রয়েছে। তার প্রান্তটা পালঙ্কের দুপাশে পরদার মতো ঝুলছে।

গোটা ঘরের সর্বত্র ধুলো আর ধুলো। আর তার সঙ্গে পুরোনো ছাতা ধরা গন্ধ।

টুনটুন দেখল, ওর মুখোমুখি দেওয়ালে দুটো জানলা হাট করে খোলা।

ও খুব অবাক হল। কারণ, আগে যখনই ও কালো বাড়িটাকে দেখেছে তখন একটা জানলাও ওর নজরে পড়েনি। কিংবা এমন হতে পারে, জানলা সব বন্ধ ছিল এবং শ্যাওলার পরত জানলার পাল্লা আর দেওয়ালকে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছে যে, আলাদা করে আর চেনা যায়নি।

কী এক কৌতূহলে জানলার কাছে ছুটে গেল টুনটুন। চোখ মেলে বাইরে তাকাল। তারা ভরা আকাশ ওর নজরে পড়ল।

হঠাৎই ওর খেয়াল হল, কোনও গাছপালা, বাড়িঘর কিংবা আলোর বিন্দু— কিছুই ওর চোখে পড়ছে না। সবটাই শুধু রাতের আকাশ—মেঘহীন, পরিষ্কার। দেখে মনেই হয় না, এই আকাশ ক'দিন ধরে কী বৃষ্টিই না দিয়েছে!

কিন্তু এই অল্প সময়ে আকাশটা কী করে এত ঝকঝকে হয়ে গেল?

এ-কথা ভাবতে-ভাবতে ও নীচের দিকে তাকাল। আর তাকিয়েই ওর মাথাটা কেমন টলে গেল।

এ কী দেখছে ও? নীচের দিকে তাকিয়েও সেই রাতের আকাশ!

আকাশটা কি এই বাড়িটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে? এমনকী নীচ থেকেও?

টুনটুনের মাথাটা পাক খেয়ে গেল। ওর চারপাশটা কেমন দুলে উঠল। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরে ও সামলে নিল। কিন্তু একইসঙ্গে ভয় পেয়ে গেল। এ-বাড়ি থেকে ওরা বেরোবে কেমন করে? দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে তাকালে তিলকপুরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না—শুধু আকাশ আর আকাশ!

টুনটুনের সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের লোক এসেই বা কী করে ওদের উদ্ধার করবে? লোকজন জোগাড় করে ওরা কি এই বাড়িটাকে ভেঙেচুরে একেবারে শেষ করে দিতে পারবে?

এমন সময় রক্ত হিম করা একটা চিৎকার টুনটুনকে পাথর করে দিল।

চিৎকারটা লম্বায় অনেক বড়। গলার স্বর এতটাই কর্কশ যে, মনে হল, ভাঙাচোরা গলা নিয়ে কেউ বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় চরম চিৎকার করছে।

হয় শানু, নয় অঙ্কিত। টুনটুনের মনে হল, চিৎকারের মালিক ওদেরই কেউ একজন। যদি তাই হয় তা হলে ওর সঙ্গে টুনটুনের কি আর দেখা হবে!

আর দেরি করল না ও। মাথার চক্কর সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'শানুদা! অঙ্কিতদা!' তারপর ঘরের দরজা লক্ষ্য করে তীব্র ছুট লাগাল।

ঠিক তখনই বিছানার সাদা চাদরটা ভেসে উঠল শূন্যে। সমুদ্রের জলের মতো ঢেউ তুলে ধীরে ধীরে নেমে এল ঘরের মেঝেতে। ঠিক যেন প্যারশুটে ভর করে অদৃশ্য কেউ ঘরের মেঝেতে 'ল্যান্ড' করল।

ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে, আর-একটু হলেই টুনটুনের পা চাদরের ওপরে পড়ছিল। ছুটন্ত গাড়ি যেভাবে ব্রেক কষে অনেকটা সেভাবেই নিজেকে কোনওরকমে থামিয়ে দিল ও।

আর তখনই ওকে অবাক করে দিয়ে চাদরের ঠিক মধ্যিখানটা ফুলে উঠতে শুরু করল। এবং ফোলা জায়গাটা ক্রমেই খাড়াভাবে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। চাদরে ঢাকা একটা ফুটবল শূন্যে ভেসে উঠলে যেমন হয়।

টুনটুনের মনে হল, চাদর ঢাকা একটা মানুষ কীভাবে যেন মেঝেতে লেপটে ছিল—এবার অদ্ভুতভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

ও চিৎকার করতে চায়নি। কিন্তু চিৎকারটা নিজে থেকেই বেরিয়ে এল বাইরে। সহজে থামতে চায় না এমন চিৎকার। আর সেই চিৎকারের স্বরটাও এমন যে, টুনটুনের মনে হল, ও নয়, অন্য কেউ চিৎকার করছে।

চাদরের অবয়বটা খাড়া স্তম্ভের মতো টুনটুনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ওর চিৎকার চলছিল—একবার, দুবার, তিনবার।

চার নম্বর চিৎকার শুরু হতেই সাদা চাদরটা ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

টুনটুন কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছিল। হাঁপাচ্ছিল হাপরের মতো। ঘরটার চারপাশ সতর্ক চোখে দেখছিল। নীলচে গোধূলি আলো আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা এখন ওকে বেশ ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। ও কোনওরকমে পাশের ঘরের দিকে রওনা হল। যাওয়ার সময় পালঙ্কের দিকে ভয়ের চোখে তাকাল বেশ কয়েকবার।

বারান্দায় এসেই ও অঙ্কিতকে দেখতে পেল।

এ কী উদভ্রান্তের মতো চেহারা হয়েছে ওর! মাথার চুল এলেমেলো। টি-শার্টে কালির দাগ। চোখে আতঙ্ক।

'শানুদা কোথায়?' টুনটুন হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল।

'জানি না। ও তো ওদিকের ঘরটায় ঢুকেছিল...।' আঙুল তুলে দূরের একটা ঘর দেখাল অঙ্কিত।

'তুমি কি একটু আগে চিৎকার করছিলে?'

'হ্যাঁ। ও-ঘরটায় একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার আছে—।' সামনের একটা ঘরের খোলা দরজার দিকে দেখাল ও ঃ 'ঘরের দেওয়ালগুলো হঠাৎ কাঁপতে শুরু করেছিল। তারপর...একবার ফেঁপে উঠছিল, আর-একবার চুপসে যাচ্ছিল। বেলুনের মতো। তা ছাড়া দেওয়ালের গা বেয়ে একরকম কষ বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সেসময় একটা দেওয়াল ফুলে উঠে আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে দেয়। তারপরই দেখি আমার টি-শার্টের পিঠটা দেওয়ালে আটকে গেছে—কিছুতেই ছাড়াতে পারছিলাম না। তখন ভয়ে...।'

'দিশা...দিশা...কোথায়?'

'জানি না। চলো, আমরা দুজনে মিলে একটু খুঁজে দেখি। আমার...আমার ভীষণ ভয় করছে ...।' কথা বলতে-বলতে হঠাৎই অঙ্কিতের খেয়াল হল টুনটুন হাঁপাচ্ছে। তাই ও জিগ্যেস করল, 'তোমার কী হয়েছে? এরকম হাঁপাচ্ছ কেন? চোখ-মুখ কেমন হয়ে গেছে...।'

টুনটুন অঙ্কিতের হাত আঁকড়ে ধরল। বলল, 'এ-ঘরটায় আমিও কতকগুলো বিচ্ছিরি ব্যাপার দেখেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু নিজের চোখে দেখেছি। চলো, বলছি...।'

যে-ঘর থেকে টুনটুন একটু আগে বেরিয়ে এসেছে সেদিকে ভয়ের চোখে তাকিয়ে ও ঘরের দরজাটা একরকম দৌড়ে পেরিয়ে গেল। অঙ্কিতের সঙ্গে সিঁড়ির দিকে যেতে-যেতে ও সব বলল—বাড়িটাকে ঘিরে থাকা রাতের আকাশের

কথা, বিছানার চাদরের কথা।

অঙ্কিত হঠাৎই অসহায় গলায় বলে উঠল, 'টুনটুন, আমরা কি আর এ-বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না?'

টুনটুন চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিচিত্র বাড়িটাকে দেখল, বলল, 'বেরোতে হবেই...যে করে হোক। বাড়িটা যতই ভয় দেখাক...আমরা...।'

টুনটুনের কথা আটকে-আটকে যাচ্ছিল। হঠাৎই ও দিশা আর শানুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করল।

অঙ্কিত বুঝল, এটা ভয় তাড়ানোর একটা চেষ্টা। তাই ও আর দেরি করল না—টুনটুনের সঙ্গে গলা মেলাল।

কয়েকবার ডাকাডাকির পর ওরা থামল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।

টুনটুন জোর করে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ, ইচ্ছে করলেই এ-বাড়ি থেকে ওরা বেরোতে পারবে না। তা ছাড়া দিশার খোঁজ করতে হবে, শানুরও খোঁজ করা দরকার। এত বড় বাড়ি! কে জানে, এর কোন ঘরে কোন আনাচেকানাচে ওরা হারিয়ে গেছে।

তিনতলায় এসেই টুনটুন আর অঙ্কিত অবাক হয়ে গেল।

ওদের সামনে সেই চৌকো পুকুর। তার চারকোণে চারটে-স্তম্ভ। দোতলা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে ওরা পুকুরটাকে দেখেছিল। তাই পুকুরটা একতলায় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে ওটা তিনতলায়!

ওপরদিকে তাকাল টুনটুন। ছাতার মতো সেই প্রকাণ্ড ঢাকনা।

ওর মাথা গুলিয়ে গেল। অঙ্কিতকে বলল, 'এ-বাড়িটার দিকগুলো কেমন যেন জট পাকানো। এই যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম—সেটা কি উঠে এলাম, নাকি নামলাম?'

অঙ্কিত বলল, 'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ওই দ্যাখো, জলের মধ্যে কী!'

টুনটুন অঙ্কিতের ইশারা লক্ষ্য করে তাকাল। পুকুরের কোণটে জলে আলোড়ন। কিছু একটা জলের ওপরে এসে শরীরটা আবার পাক খাইয়ে জলের গভীরে তলিয়ে গেল।

টুনটুন পুকুরের ঘাটের কাছে এগিয়ে গেল। আলোটা এখন আরও কমে গেছে বলে মনে হল। তারই মধ্যে ও নজর চালিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। কোথায় গেল প্রাণীটা? যদি ওটা সত্যিই কোনও প্রাণী হয়।

একটু পরে প্রাণীটাকে দেখতে পেল টুনটুন। একটা নয়—অন্তত চার-পাঁচটা। জলে ঝটাপটি তুলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। তবে মাছের মতো নয়—সাপের মতো।

মাথায় কালো রঙের চুল বা সেরকম কিছু রয়েছে। লম্বা তেলা শরীর। দুপাশে দুটো [illegible] পাখনার মতো। আর লেজও একটা নয়—দুটো।

টুনটুন আর অঙ্কিত অবাক হয়ে প্রাণীগুলোকে দেখতে লাগল। সাপের মতো, অথচ সাপ নয়। এ কোন আশ্চর্য সরীসৃপ!

ঠিক তখনই ওরা দেখল, উলটোদিকের ঘাটের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে দুটো সরীসৃপ। ভেজা ন্যাকড়ার মতো নরম ওদের শরীরে সিঁড়ির ধাপের আদলে ভাঁজ পড়েছে।

ওদের বিস্ময় ভরা চোখের সামনে সরীসৃপ দুটো এগিয়ে গেল একটা স্তম্ভের কাছে। ওটার গায়ে পাক খেয়ে লেপটে রইল।

টুনটুনের মনে পড়ে গেল সেই রাতের কথা। দিশাদের বাড়ি থেকে ও আর শানু যখন বৃষ্টির মধ্যে ফিরছিল। গাছ থেকে সাপের মতো কী একটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুকুরের জলে।

টুনটুন বলল, 'অঙ্কিতদা, এরকম একটা পিকিউলিয়ার সাপ আমি আর শানুদা দেখেছিলাম। সেদিন রাতে তোমাদের বাড়ি থেকে ফেরার সময়...।'

'এটা আবার কী টাইপের সাপ রে! দুটো লেজ...মাথায় চুল...।'

'কী জানি!'

এমন সময় একটা মেয়েলি চিৎকার শুনতে পেল ওরা। কিন্তু কোনদিক থেকে চিৎকারটা এল সেটা ঠিক বুঝতে পারল না।

অঙ্কিত আর টুনটুন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপরই ওরা ছুটতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু কোথায় সিঁড়ি!

ভয়ে কাঁটা হয়ে ওরা দুজনে সিঁড়িটাকে খুঁজতে শুরু করল।

একটু পরেই অবাধ্য সিঁড়িটাকে খুঁজে পেল ওরা। যে-সিঁড়িটাকে ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে খুঁজে পাওয়ার কথা সেটাকে পাওয়া গেল একেবারে বাঁ-প্রান্তে। এটুকু সময়ের মধ্যে পাথরের সিঁড়িটা যে কী করে নড়েচড়ে সরে এল সেটা কে জানে!

ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। চিৎকারটা তখনও নীচ থেকে ভেসে আসছে।

নীচে এসে ওরা দেখল দোতলার চেহারাটা আর আগের মতো নেই। সেখানে এখন বিশাল মাপের একটা হলঘর। তার সিলিং-এ কয়েকটা বালব জ্বলছে। কী করে জ্বলছে সেটা বোঝা মুশকিল—কারণ, কোথাও ওয়্যারিং বা সুইচের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

হলঘরের দূরের কোণে একটা মেয়ে ভেজা বেড়ালের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। দু-হাত বুকের কাছে জড়ো করা। আর প্রকাণ্ড হাঁ করে প্রবল চিৎকার করছে।

দিশা! দিশাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা। কিন্তু দিশা ওদের দেখতে পেল না। কারণ, ও তখন ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে একটানা চিৎকার করে চলেছে। হলঘরের মেঝেতে চলে-ফিরে বেড়োচ্ছে অসংখ্য কালো ছায়া। ছায়াগুলোর চেহারা নানান রকমের। ওরা মেঝেতে লেপটে চলে বেড়োচ্ছে। কিন্তু যে-কায়া থেকে ছায়াগুলো তৈরি হয়েছে তাদের কোনও হদিস নেই। শুধু মেঝেতে আর দেওয়ালে চলন্ত ছায়া কিলবিল করছে।

'দিশা! দিশা!' চিৎকার করে উঠল অঙ্কিত। ছায়াগুলো মাড়িয়ে ও ছুট লাগল দূরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় মেয়েটার দিকে। টুনটুনও মরিয়া হয়ে দৌড়ল ওর পিছনে।

সঙ্গে-সঙ্গে ছায়াগুলো মিলিয়ে যেতে লাগল পটাপট। আর ঘরের বাতাসে এক অলৌকিক ঝড় উঠল। ঘন বাতাস ঘূর্ণিপাক তুলে হলঘরের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য নেচে বেড়াতে লাগল। মাথার ওপরে ঝুলন্ত বাল্‌বগুলো পেন্ডুলামের মতো দুলতে লাগল।

অঙ্কিত ছুটে গিয়ে পাগলের মতো জাপটে ধরল দিশাকে। আনন্দে কাঁদতে শুরু করল। দিশাও 'দাদাভাই! দাদাভাই!' বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

টুনটুন দিশাকে ভরসা দিয়ে বারবার বলতে লাগল, 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। আমরা এসে গেছি...।'

ভাই-বোন একটু সামলে নেওয়ার পর টুনটুন জিগ্যেস করল, 'শানুদা কোথায়?'

ঘরের মধ্যে ঝড় সাঁইসাঁই আওয়াজ তুলছিল। ঝোড়ো বাতাসে সকলের চুল উড়ছিল।

দিশা ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'শানুদা কোথায় জানি না। দোতলা না তিনতলায় যেন একবার দেখেছিলাম। কীসের ভয়ে পাগলের মতো ছুটে পালাচ্ছে।'

দিশাকে অবাক চোখে দেখছিল টুনটুন।

কী চেহারা হয়েছে ওর! চোখের কোলে কালি। গাল দুটো বসে গেছে। চুড়িদার এখানে-ওখানে ছেঁড়া। যেন একটা সাইক্লোন বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে।

অঙ্কিত বলল, 'এ-বাড়িটার ঘর, সিঁড়ি—কিছুই ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না।

চলো, আমরা একসঙ্গে থেকে এলোমেলো এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াই। দেখি, বেরোনোর দরজাটা খুঁজে পাই কি না। এইভাবে হয়তো শানুর খোঁজও পেয়ে যেতে পারি—।'

ওরা তিনজন আর দেরি করল না। হলঘরের একটা বড় দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই চলতে শুরু করল। কখনও সিঁড়ি, কখনও বারান্দা, কখনও অলিন্দ ধরে ওরা ছুটতে লাগল, আর মাঝে-মাঝেই শানুর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

এইভাবে বাড়িটার গোলকধাঁধায় পাক খেতে-খেতে ওরা একটা বিশাল ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরটা মাপে যেমন বড় তেমনই তার ছাদ তিরিশ ফুট উঁচুতে। ঘরে অনেকগুলো বাল্‌ব জ্বলছে।

ঘরটায় একটা প্রকাণ্ড মাপের যন্ত্র বসানো। যন্ত্রটার হাজাররকম পার্টস। এবং নানানরকম শব্দ করে সেগুলো নড়ছে, কারণ যন্ত্রটা চলছে। অনেকগুলো সরু-সরু কাচের নল দিয়ে রঙিন কেমিক্যাল বয়ে চলেছে। কোনও-কোনও ইস্পাতের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। একটা বিরাট ফাঁপা চামড়ার বল যন্ত্রের শব্দের তালে-তালে ফুলে উঠছে, চুপসে যাচ্ছে। তা থেকে ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে। এই শব্দটাই ওরা মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের মতো মনে হচ্ছিল।

'এটা কীসের যন্ত্র?' বিশাল যন্ত্রটা জরিপ করতে-করতে অঙ্কিত বলল।

টুনটুন বলল, 'কে জানে! পাইপে-পাইপে একেবারে জট পাকিয়ে গেছে।'

দিশা বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই, দাদাভাই। শানুদার খোঁজ করতে হবে যে...।'

ওরা ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা চিৎকারের শব্দ কানে এল। কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে সেটা ঠাহর করার চেষ্টা করতে-না-করতেই চিৎকারটা আবার শোনা গেল। ওরা তিনজনে সেদিক লক্ষ্য করে ছুটল।

দুটো ঘর পেরিয়ে তিন নম্বর ঘরে গিয়েই ওরা শানুকে দেখতে পেল। ওকে নিয়ে অদৃশ্য কারা যেন ছিনিমিনি খেলছে। অনেকটা ভলিবল খেলার ঢঙে ওকে নিয়ে লোফালুফি চলছে। কিন্তু সেই শক্তিশালী 'খেলোয়াড়'-দের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

শানু ভয়ে চিৎকার করছিল। ওকে ওইরকম অবস্থায় দেখে অঙ্কিতরাও ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে খেলোয়াড়রা বোধহয় থেমে গেল। কারণ, শানু ধপাস করে খসে পড়ল পাথরের মেঝেতে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

ওরা ছুটে গেল শানুর কাছে। ওকে ধরে তুলল। ওর কপালে বেশ খানিকটা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে। হাতে দু-জায়গায় ছড়ে গেছে। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে বেশ কয়েক জায়গায়। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। যন্ত্রণায় 'উঃ! আঃ!' করছে।

ওরা শানুকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। টুনটুন জিগ্যেস করল, 'শানুদা, তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?'

'জানি না। আমি তো সারাক্ষণ তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এই বাড়িটা যেন কেমন। সবকিছু গুলিয়ে যায়।'

অঙ্কিত বলল, 'চল, সবাই মিলে এবার বেরোনোর চেষ্টা করি—।'

ওরা দল বেঁধে রওনা হল। নীল আলোয় বেরোনোর পথ খুঁজতে লাগল।

ঠিক তখনই একটা বাঁশির সুর ভেসে উঠল বাতাসে। অদ্ভুত মিঠে সুরটা গোটা বাড়িটায় কেঁপে-কেঁপে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কে বাঁশি বাজাচ্ছে?' টুনটুন বলে উঠল।

'জানি না।' অঙ্কিত বলল, 'তবে এই বাঁশির সুরটা সবাইকে টেনে নেয় বলে শুনেছি।'

'টেনে নেয় মানে?'

'মানে, হিপনোটাইজ বা ওরকম কিছু একটা করে বলে শুনেছি। বাঁশির এই সুরের ফাঁদে পড়ে অনেকে নাকি এই বাড়িটায় ঢুকে পড়েছে—আর বেরোতে পারেনি। তাদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি...।'

শানু ভয়ে-ভয়ে বলল, 'আমাদের কী হবে?'

দিশা বলল, 'ভয় পেলে চলবে না, শানুদা। যে করে হোক, এ-বাড়ি থেকে আমাদের বেরোতে হবে।'

ওরা আবার চলতে শুরু করল। কখনও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, কখনও নামতে লাগল। নানান ঘরে ঢুকতে লাগল—যে-কোনও দরজা পেলেই সেটা দিয়ে ঢুকে পরীক্ষা করতে লাগল বেরোনোর পথ পাওয়া যায় কি না। একইসঙ্গে অদ্ভুত বাড়িটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল।

হঠাৎই একটা বড় মাপের ঘরে ঢুকে ওরা অবাক হয়ে গেল।

ঘরটা কোনতলায় ওরা জানে না। কারণ, এ-বাড়িতে 'একতলা, দোতলা, তিনতলা' শব্দগুলোর যে কোনও মানে নেই সেটা এতক্ষণে ওরা হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে।

ঘরটায় ঝকঝকে আলো। একেবারে আধুনিক ড্রইংরুমের ধাঁচে সাজানো।

লম্বা-লম্বা সোফা। মাঝে বড় মাপের সেন্টার টেবিল। টেবিলে ফুলদানি। রঙিন সুগন্ধি ফুলে সাজানো। ছাতা ধরা গন্ধটা আর টের পাওয়া যাচ্ছে না।

সোফাগুলোয় ছ'জন মানুষ বসে রয়েছে। তাদের বয়েস নানারকম। তবে সবচেয়ে বেশি বয়েসি মানুষটির মাথায় ধবধবে সাদা চুল, গালে সাদা দাড়ি, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। কেতাদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট মানুষটি উচ্চতায় খাটো। তার ফরসা চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ।

ওদের দেখতে পাওয়ামাত্রই হাসি মুখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। হাত সামনে বাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, 'ওয়েলকাম টু দ্য অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড অফ স্পেস-টাইম অ্যান্ড সুপারন্যাচারাল...।'

থতমত খেয়ে ওরা চারজনই ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। কিন্তু অবাক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ভদ্রলোক বলল, 'আমার নাম ডক্টর শিলাদিত্য সেন। লেখাপড়ার ডাক্তার। বহু বছর ধরে এই সময়ের ফাঁদে আটকে রয়েছি। কবে ছাড়া পাব জানি না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডক্টর সেন ঃ 'নেহাত ভাগ্যচক্রে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নইলে এই বাড়িটার যা কারবার! কখন যে থ্রি ডায়মেনশনে থাকে আর কখন যে ফোর ডায়মেনশনে চলে যায় তার ঠিক নেই। এসো, এসো—বোসো—।'

একটা খালি সোফা দেখিয়ে ওদের বসতে বলল শিলাদিত্য সেন। ওরা চুপচাপ বসে পড়ল।

ওদের মন থেকে ভয়টা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগল। আর একইসঙ্গে পেটের খিদে টের পেল ওরা। এই অদ্ভুত বাড়িতে ওদের কত সময় কেটে গেছে কে জানে!

ডক্টর সেন হাসি মুখে কথা বলতে-বলতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। হাতে তালি দিয়ে হাত ঝেড়ে বলল, 'এবারে বলো দেখি, তোমাদের গল্পটা শুনি। এ-বাড়িতে তোমরা ঢুকলে কবে?'

শানু, অঙ্কিত, টুনটুন আর দিশা পালা করে ওদের কথা বলতে শুরু করল। কথা বলতে-বলতে ওরা একটু-একটু করে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, ওদের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাচ্ছিল।

ওদের কাহিনিতে শেষের রেশ টেনে অঙ্কিত বলল, '...তারপর এ-ঘরে ঢুকে আপনাদের দেখা পেলাম।'

'হ্যাঁ, দেখা পেলে।' হেসে বলল শিলাদিত্য সেন, 'তবে আমাদের নাও দেখা হতে পারত। অনেকেই আছে যারা অনেক বছর আগে এ-বাড়িতে ঢুকে

পড়েছে—কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।' ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডক্টর সেন বলল, 'হয়তো আর কোনওদিন দেখা হবেও না।'

'কেন? দেখা হবে না কেন?' শানু জানতে চাইল।

'দেখা হবে না, কারণ, এই বাড়িটা থ্রি ডায়মেনশন আর ফোর ডায়মেনশনের মাঝে যাতায়াত করে...ছুটোছুটি করে বেড়ায়...।'

'থ্রি ডায়মেনশনের মানে না হয় বুঝলাম...' অঙ্কিত বলল, 'কিন্তু ফোর ডায়মেনশন?'

'হ্যাঁ-ফোর ডায়মেনশন।' হাসল ডক্টর সেন ঃ 'ওই ফোর্থ ডায়মেনশনটাই যত গোলমেলে ব্যাপার। ফোর্থ ডায়মেনশনটা আসলে হল টাইম—সময়। থ্রি ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডে শুধু তিনটে ডায়মেনশন—মানে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা—দিয়ে বোঝা যায় একটা জিনিস আমাদের চোখের সামনে আছে কি নেই। কিন্তু ফোর ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডে একটা বাড়তি ফ্যাক্টর—মানে, বাড়তি ডায়মেনশন—এসে যায় ঃ সময়। সেই কারণেই আমাদের থ্রি ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডের সব কনসেপ্ট সেখানে খাটে না। স্পেস-টাইমের কারসাজি আর কী! এর বেশি তোমাদের বোঝানো মুশকিল।

'এই বাড়িটা সেই কারণেই অদ্ভুত। এর ঘরগুলো মাপে, সংখ্যায় আর চেহারায় বারবার পালটায়। এর সিঁড়িগুলো উলটেপালটে যায়। এর যে-কোনও ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে বাইরে যে-দৃশ্য দেখা যায় তার সঙ্গে আমাদের কনসেপ্টের কোনও মিল নেই। পুরো ব্যাপারটাই একেবারে অন্যরকম।

'যদি তোমরা এই ঘর থেকে বেরিয়ে একটু পরেই আবার ফিরে আসো তা হলে হয়তো দেখবে এই ঘরটাই আর খুঁজে পাচ্ছ না—পুরো ভ্যানিশ হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে তোমাদের আর কখনও হয়তো দেখাই হল না। এটাই হল বাড়িটার ক্যারেকটার...।' দু-হাত দুপাশে ছড়িয়ে থামল শিলাদিত্য সেন।

'কিন্তু অন্য সব ব্যাপারগুলো?' একসঙ্গে প্রশ্ন করে ফেলল দিশা আর টুনটুন। একে অপরের দিকে তাকাল একপলক। তারপর ঃ 'ওই যে সব ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো! চাদরে ঢাকা মূর্তি। ঘরের দেওয়াল ফুঁড়ে ওঠা, চুপসে যাওয়া। ওই পুকুরের জলে সাঁতরে বেড়ানো সাপের মতো জিনিসগুলো। তা ছাড়া বাঁশির শব্দ...।'

হাসল ডক্টর সেন। সকলের মুখের ওপরে একপলক নজর বুলিয়ে বলল, 'বলছি—সব বলছি। আমার যেটুকু জানা আছে সেটুকু অন্তত ঠিকঠাকভাবে বলার চেষ্টা করছি। দ্যাখো, প্রথমেই বলেছি, "ওয়েলকাম টু দ্য অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড অফ স্পেস-টাইম অ্যান্ড সুপারন্যাচারাল...। এর মধ্যে স্পেস-টাইমটা যতটা সহজে

পেরেছি এক্সপ্লেইন করেছি—বাকিটা সুপারন্যাচারাল—মানে, অলৌকিক—এলাকার ব্যাপারস্যাপার।' গলার স্বর সিরিয়াস করে ডক্টর বলে চলল, 'তোমরা কি জানো, এ-বাড়িতে ঢোকার পর কত লোক এখানে মারা গেছে? এই অদ্ভুত স্পেস-টাইমের মধ্যে সেইসব বন্দি প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। কখনও তাদের দেখা যায়—কখনও যায় না। এ ছাড়া সবশেষে রয়েছে এই প্রাগৈতিহাসিক বাড়িটা। তোমরা কি বললে বিশ্বাস করবে, এই বাড়িটা জীবন্ত! যে-যন্ত্রপাতির ঘর তোমরা দেখেছ ওটা আসলে বাড়িটার হার্ট-লাংস—আর এনার্জির সোর্স। বাড়িটার শ্বাস নেওয়ার শব্দ তোমরা সর্বক্ষণ শুনতে পাচ্ছ। যে-ঘরে অঙ্কিত দেওয়ালের গায়ে আটকে গিয়েছিল, ওটা এই বাড়িটার স্টমাক—পাকস্থলী।

'আমি জানি, এগুলো অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার—কিন্তু সত্যি। একটা জীবন্ত প্রাচীন বাড়ি, যেটা ভুতুড়ে, স্পেস-টাইমে থ্রি ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ড আর ফোর ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হরবখত যাতায়াত করে! তোমরাই বলো, এরকম একটা বাড়ির সঙ্গে লড়াই করে পারা যায়!

'আর ওই যে বাঁশির ব্যাপারটা। ওই বাঁশিগুলো সব হাড় দিয়ে তৈরি। কীভাবে ওগুলো বাজে, কে বাজায়—সেটা আমি আজও ঠিকঠাক উদ্ধার করতে পারিনি। তবে ওই বাঁশির আওয়াজে সম্মোহনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঢেউ চুম্বকের মতো শিকারকে টেনে নিয়ে আসে এই বাড়িতে। তার শরীর থেকে কী এক কায়দায় সব হাড় বের করে নেওয়া হয়—বাড়িটাই বের করে নেয়—অথচ মানুষটা তখনও বেঁচে থাকে। জলে সাপের মতো সাঁতার কাটে, গাছপালার ডালে শরীরটাকে জড়িয়ে রাখে। আমার ধারণা, বাড়িটা নিজে বাঁশি বাজায়। তার সঙ্গে ওই সরীসৃপ-মানুষগুলোও কখনও-কখনও বাজায়। এইভাবে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকার পর একদিন...একদিন ওরা আমার মতো...' সোফায় বসে থাকা নানান বয়েসি পাঁচজন মানুষের দিকে ইশারায় দেখালেন ডক্টর সেন, '...বা আমাদের মতো হয়ে যায়।' একটা লম্বা শ্বাস ফেলে ঘরের ছাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। কিছুক্ষণ পর মুখ নামিয়ে টুনটুনদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরাও এককালে সাঁতার কাটতাম, বাঁশি বাজাতাম। বাড়িটার বাঁশি তৈরির নেশা থেকেই যত সমস্যা।'

'এতসব কথা আপনি জানলেন কী করে?' দিশা ডক্টর সেনকে প্রশ্ন করল।

বিষণ্ণভাবে হাসল ডক্টর সেন। বলল, 'আমি এখানে আছি বহুবছর। আমার স্টাডিরুম আছে এ-বাড়িতে। কিন্তু এই ডায়মেনশনের গন্ডগোলের জন্য ঘরটা এখন দেখাতে পারছি না। আমি এই বাড়িটার ব্যাপারে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে স্টাডি করেছি, রিসার্চ করেছি—তারপর ধীরে-ধীরে সব জানতে পেরেছি। এককথায়

বলতে গেলে এই বাড়িটা একটা জাদুকর। নানারকম ইলিউশান তৈরি করতে পারে ও।'

'কী করে এই বাড়ি থেকে বেরোনো যায় আপনি জানেন না?' দিশা জানতে চাইল।

'না, জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি—চোখের সামনে যা দেখছ তা সবসময় সত্যি নয়—আসলে একটা ইলিউশান। এ-কথাটা মনে রেখো। এই যে আমরা ছ'জন তোমাদের সামনে রয়েছি—আমরা আসলে নেই—বহুদিন আগেই "নেই" হয়ে গেছি। আমরা একসময় বাঁশি বাজাতাম...একসময়...।'

ডক্টর সেনের কথাগুলো ধীরে-ধীরে প্রতিধ্বনির মতো শোনাতে লাগল। একটা ঝোড়ো ঘূর্ণিপাক কোথা থেকে যেন আচমকা এসে ঘরে ঢুকে পড়ল। ওদের চোখের সামনে ডক্টর সেন আর তার পাঁচ সঙ্গী পাউডারের মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঝরে গেল, মিলিয়ে গেল। আর একইসঙ্গে ঘরের আলোগুলো সব নিভে গেল।

টুনটুনরা দেখল, অন্ধকার ঘরে আবার সেই নীলচে গোধূলি-আলো। ঘরের শেষ প্রান্তের দেওয়ালে চারটে খোলা জানলা। জানলা দিয়ে রাতের আকাশ চোখে পড়ছে। তারায় ভরা ঝকঝকে গাঢ় নীল আকাশ।

কী ভেবে টুনটুন সবাইকে ডেকে নিয়ে ছুটে গেল সেই খোলা জানলাগুলোর কাছে। একটা জানলা দিয়ে মুখ বের করে তাকাল।

সেই একই দৃশ্য। ডাইনে, বাঁয়ে, ওপরে-নীচে শুধু আকাশ আর আকাশ। তারা আর তারা। ফোর ডায়মেনশন। ওলটপালট।

ডক্টর সেনের কথা মনে পড়ল ওর।

'চোখের সামনে যা দেখছ তা সবসময় সত্যি নয়—আসলে একটা ইলিউশান।'

এই তারা ভরা আকাশ কি তা হলে ফোর ডায়মেনশনের মায়া? কী আছে এই আকাশের আড়ালে? বাঁচার পথ নেই তো?

টুনটুন ভেতরে-ভেতরে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। কিছু একটা তো করতে হবে। হবেই। নইলে এই বাড়িতে প্রেতাত্মার সংখ্যা বাড়বে শুধু।

মা-বাপির কথা মনে পড়ল ওর। চোখে জল এসে গেল। কিন্তু সামনে তো আর কোনও পথ খোলা নেই। ভয় পেলে চলবে না।

ও চোখের জল মুছে নিল। শানুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শানুদা, যদি একটু পরে নীচের দিক থেকে আমার ডাক শুনতে পাও তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে তোমরা সবাই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়বে—।'

'কী বলছিস তুই?' শানু চেঁচিয়ে উঠল।

'কী করছ? কী করছ? পাগলামো কোরো না—।' অঙ্কিত।

'টুনটুনদা! টুনটুনদা!' দিশা।

কিন্তু তার আগেই টুনটুন খোলা জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শূন্যে।

নীচের তারা ভরা আকাশ ওর জন্য আঁচল পেতে রয়েছে। ঠিক এই কথাটাই মনে হল টুনটুনের। ও যেন খোলা প্যারাশুটের মতো ভাসতে-ভাসতে নীচে নামতে লাগল।

একটু পরেই ভেজা গাছপালা আর জল-কাদায় ওর শরীরটা আছড়ে পড়ল। কানে এল ব্যাঙের ডাক।

পৃথিবীটা এত সুন্দর আগে কখনও মনে হয়নি টুনটুনের। মনে হয়নি ব্যাঙের ডাক এ-ত মিষ্টি।

ও পাশ ফিরে তাকাল চারপাশে। বেশ খানিকটা দূরে তিনটে সার্চলাইট জ্বেলে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

টুনটুনের গায়ে আলো এসে পড়েছিল। ওকে দেখতে পেয়েই লোকজন হইহই করে লাফিয়ে উঠল।

টুনটুন শরীরের সব শক্তি জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'দিশা! অঙ্কিতদা! শানুদা!'

তারপরই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

# আঁধারপ্রিয়া

*'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।*
*ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।'*

একটি শীতের সন্ধ্যা, ১৯৭৪ সাল

সতেরো-আঠেরো বছরের মেয়েটি রাস্তা পার হচ্ছিল। পরনে গোলাপি-কালো নকশা ছাপা শাড়ি। গায়ে একটা বাদামি রঙের শাল অগোছালোভাবে জড়ানো। এখন কোনও কিছুই গুছিয়ে করার মতো মনের অবস্থা মেয়েটির নেই।

সেটা মেয়েটির হাঁটার ধরন লক্ষ করলেও বোঝা যায়।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে শীত যতই জাঁকিয়ে বসুক না কেন যানবাহনের বেহিসেবি সংখ্যার তাতে কোনও হেরফের হয় না। সুতরাং এদিক-ওদিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল নানান গাড়ি ঃ প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম, স্কুটার, মোটরবাইক। আর অসংখ্য মানুষ যে-যার ব্যস্ততায় ফাঁকফোকর পেয়েই একছুটে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথের বাঁ-দিকে পায়রার খোপের মতো ছোট-ছোট লটারির টিকিটের দোকান। ডানদিকে পাঁচমিশেলি ফলের দোকানে কেনাকাটার ভিড়। তার পাশেই জাগ্রত মা-কালীর মন্দিরে আরতি হচ্ছে, ঘণ্টাও বাজাচ্ছে কেউ-কেউ। ভক্তেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রণাম সেরে নিচ্ছে। কেউ মাথা ঠুকছে মন্দিরের দেওয়ালে। কারও মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তাই ভক্তি মেশানো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে দেবীকে। আর কেউ বা মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় কাতর প্রার্থনায় আকুল।

মেয়েটি আস্তিক। ওর বাড়িতে ঠাকুরের আসন আছে। সেখানে ওর মা সকাল-সন্ধে পুজো করেন। মেয়েটিও একই অভ্যাস পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। দেবদেবীর ওপরে ওর ভক্তি আছে, আস্থাও। এই পথ ধরে ও বহুদিন বহুবার যাতায়াত করেছে, কিন্তু এই কালী মন্দিরে কখনও থমকে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানায়নি। ওর কাছে ওর বাড়ির দেবদেবীই ছিল সব।

কিন্তু আজ সকাল থেকেই ওর সমস্ত হিসেব গুলিয়ে গেছে। মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। মনের অবস্থাও এলোমেলো। তাই ও-দিকের ফুটপাথে কালী মন্দিরটা চোখে পড়ামাত্রই ও কোনওরকমে গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে রাস্তা পার হল। ওর টানা-টানা চোখে নাম-না জানা আশঙ্কা। রাস্তার ধার ঘেঁষে বসেছিল

কয়েকজন শাকসবজি বিক্রেতা। তাদের পাশ কাটিয়ে মেয়েটি চলে গেল ফুটপাথের ওপরে। মন্দিরের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গাঢ় চোখে অনুভব করল জাগ্রত মা কালীকে। মেয়েটির চোখ জলে ভিজে গেল। মনে পড়ে গেল মায়ের কথা, বাবার কথা, ছোট-ছোট দুটো ভাইয়ের কথা।

আর শুভদীপের কথা।

প্রতিমাকে প্রণাম জানিয়ে মেয়েটি অন্যান্য ভক্তের পাশ কাটিয়ে সরে এল মন্দিরের দেওয়ালের কাছে। তারপর বিষাদে আকুল হয়ে মাথা ঠুকতে লাগল, আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'মা, আমাকে রক্ষা করো। মা...মাগো...।'

মেয়েটির মনের একটি অংশ বলতে চাইছিল, 'মাথা খুঁড়ে কোনও লাভ নেই। যা হওয়ার তা হবেই।' কিন্তু ওর মনের অন্য আর-একটা অংশ চিৎকার করে বলছিল, 'দেবতার লীলা দেবতাই জানে। তোর প্রার্থনায় যেন তিলমাত্রও অবিশ্বাস না থাকে।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি যেন ঘোর থেকে জেগে উঠল। শাল সরিয়ে বাঁ-হাত বের করে ঘড়ি দেখল ঃ সাতটা পঁচিশ। শুভদীপ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছে। বাঁ-হাতের চেটো স্পষ্টভাবে চোখের সামনে মেলে ধরল মেয়েটি। শুভদীপের ফোন নম্বর লেখা রয়েছে সেখানে ঃ ফোর সেভেন টু ফোর জিরো ওয়ান।

চোখের জল মুছে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে এল ও। হাঁটতে শুরু করল পাঁচমাথার মোড়ের দিকে। মোড়টা পেরিয়ে ও যাবে শ্যামবাজারের টেলিগ্রাফ অফিসে। সেখান থেকে ফোন করা যায়। যদি ওদের ফোন খারাপ থাকে তা হলে দুটো ওষুধের দোকান আছে কাছাকাছি—একটু বেশি পয়সা দিলে ওরা ফোন করতে দেয়।

মেয়েটির গায়ের রং মাজা। সরল, টানা-টানা, গভীর চোখ। গড়ন লম্বা ছিপছিপে। ভুরুর কাছটা যেন জোড়া, নাকে ছোট্ট সাদা চকচকে পাথর বসানো নাকছাবি। চিবুক তীব্র, সামান্য উদ্ধত। অথচ চোখের দৃষ্টি এখন অসহায়। খানিকটা যেন ভয় পেয়েছে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পার হওয়ার সময় নেতাজীর মূর্তির প্রায় পাশ ঘেঁষে চলে গেল মেয়েটি। রাস্তায় পথচারী যানবাহন ও যেন দেখেও দেখছিল না।

শীতের বাতাসে হালকা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছিল। একটু দূরের জিনিস ঠিকমতো ঠাহর করে দেখা যাচ্ছিল না। মেয়েটির নজর ঝাপসা হয়ে আসছিল বোধহয়। ও শালের খুঁট দিয়ে কয়েকবার চোখ মুছল।

টেলিগ্রাফ অফিসের দোতলায় উঠে একটা টেলিফোন বুথ খালি পেয়ে গেল মেয়েটি। চটপট বুথের ভেতরে ঢুকে গিয়ে অকূলপাথারে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো রিসিভারটাকে আঁকড়ে ধরল। না, ডায়াল টোন নেই। লিভারটা টেনে বেশ কয়েকবার খুটখুট করল ও। রিসিভার কানে চেপে শুনল। না, একটা অস্বাভাবিক গুঞ্জন কানে আসছে শুধু।

বেরিয়ে এসে পাশের বুথের ভাঙা দরজার কাছে দাঁড়াল মেয়েটি। একজন অবাঙালি ভদ্রলোক বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছেন টেলিফোনে। মেয়েটি উসখুস করতে লাগল। পিছনের কাউন্টারের ওপাশ থেকে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শুনতে পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, মর্স কোডের সংকেত ওর মাথার ভেতরে বাজছে। এই ভদ্রলোকের টেলিফোন করা কখন শেষ হবে!

একটু পরে বুথ খালি হতেই মেয়েটি ঢুকে পড়ল বুথে। নম্বর ডায়াল করার সময় টের পেল ওর হাত কাঁপছে।

ও-প্রান্তে রিং বাজছিল। চারবারের পর টেলিফোন তুলল কেউ।

'হ্যালো।' বয়স্ক পুরুষ কণ্ঠস্বর। বোধ হয় শুভদীপের বাবা।

'হ্যালো, শুভদীপ আছে?'

'আপনি কে বলছেন?' প্রশ্নের মধ্যে অপছন্দের সুর।

শুভদীপের বাবার সঙ্গে মেয়েটির এখনও আলাপ হয়নি। শুভর কাছে শুনেছে, ভদ্রলোক বেশ কড়া আর রাশভারি। ওঁর ব্যাবসার পয়সাতেই শুভদীপদের যত বাবুয়ানি।

মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। এক মুহূর্ত কী ভেবে কাঁপা গলায় মিথ্যে বলল, 'আমি ওর বন্ধু জয়ন্তর দিদি। জয়ন্ত ওকে একটা খবর দিতে বলেছে। ওর লাস্ট উইকের ক্লাস নোটটা যেন কাল ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে আসে। আর...' আর কী বলা যায় এই মুহূর্তে!

ও-প্রান্তের রাশভারি গলা শোনা গেল, 'দাঁড়াও, বুড়োকে দিচ্ছি, ওকে যা বলার বলো—' 'বুড়ো' শুভদীপের ডাকনাম।

কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। শুধু পিছন থেকে টরে-টক্কা ভেসে আসছে। কী রকম দম বন্ধ করা ভ্যাপসা গরম লাগছে যেন।

'হ্যালো—'

শুভদীপের গলা।

আঃ! মা কালী সত্যিই জাগ্রত।

'শুভ...শুভ...খুব বিপদে পড়েছি...'

গলা চিনতে পারল শুভ। সঙ্গে সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন নির্বিকার

কাঠ-কাঠ হয়ে গেল। বাবার সামনে কী করে সহজভাবে কথা বলবে ও! ও তো বলেই দিয়েছিল, 'ফোন নাম্বার নিচ্ছ নাও, কিন্তু, জেনুইন ইমারজেন্সি না হলে ফোন কোরো না—অথচ...।

'কেন, কী হয়েছে?' শান্তভাবে প্রশ্নটা করল শুভ।

'শুভ...শুভ...আজ সকাল থেকে খুব...বমি হচ্ছে। বারবার ওয়াক উঠছে।' শেষ দিকে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

হাসল শুভ, বলল, 'কাঁদছ কেন, বোকা মেয়ে! রেগল্যান ট্যাবলেট খেয়ে নাও, বমি-বমি ভাব এক্ষুনি কেটে যাবে। কোনও কারণে বোধহয় খাওয়াদাওয়ার গন্ডগোল হয়েছে।'

মেয়েটি বুঝতে পারল, ও-প্রান্তে টেলিফোনের সামনে শুভদীপ এখন একা এবং নিরাপদ। কিন্তু শুভর কথায় ভরসা না পেয়ে ও তখনও কাঁদছিল। জড়ানো গলায় বলল, 'না, না, সেসব নয়। অন্য ব্যাপার—ট্যাবলেট খেলেও কমবে না। তুমি বুঝতে পারছ না। সেই যে পুজোর সময় আমরা ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিলাম। তোমাকে তখন অত করে বারণ করলাম, তুমি শুনলে না। বললে, ভয়ের কিছু নেই...এখন কী সর্বনাশ হল বলো তো।' কান্না আরও বেড়ে গেল।

'আস্তে, আস্তে—' চাপা গলায় বলে উঠল শুভ।

তা হলে কি ওর বাবা আবার ঢুকে পড়েছেন ঘরে? কিন্তু মেয়েটি তখন মরিয়া। একমাত্র শুভদীপই ওকে বাঁচাতে পারে এই পাগল-করা ঝড় থেকে। তাই ও জেদি গলায় বলল, 'কাল আমি ছ-টার সময় তোমার জন্যে কফি হাউসে ওয়েট করব। তুমি আসবে কিন্তু। তারপর—।'

'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।' ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল শুভদীপ, 'মাত্র একবারে এত কিছু হতে পারে না। নিশ্চয়ই তুমি হিসেবে কোনও গন্ডগোল করছ। আর তাতেই এত প্যানিকি হয়ে উঠেছ। যাকগে, কোত্থেকে ফোন করছ তুমি?' শুভ জানে ওদের বাড়িতে ফোন নেই।

মেয়েটি বলল।

'ও ব্বাবা! এই সামান্য একটা ব্যাপারের জন্যে এই ঠান্ডার মধ্যে এতদূর চলে এসেছ। এরকম হিসেবের গোলমাল তোমার আগেও হয়েছে। ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাড়ি যাও। ভালো করে খেয়ে-দেয়ে কষে ঘুম দাও—।'

'কাল তুমি ছ'টার সময় আসছ তো হলে?' মেয়েটি ভয় পাওয়া গলায় জিগ্যেস করল।

'কাল ছ'টার সময় বোধহয় হবে না। কাল আমাদের বিজনেসের ব্যাপার

নিয়ে বাবার সঙ্গে একটু বসতে হবে...।'

শুভদীপ যে পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে বাবার ব্যাবসায় সময় দেয় সেটা মেয়েটি জানে। কিন্তু এখন এই জরুরি অবস্থায় ওর কি বিজনেস নিয়ে মাথা না ঘামালে চলছিল না!

'শুভ, প্লিজ, এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমি মরে যাব। যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু, তুমি পাশে না থাকলে আমি—।'

'শোনো, এত আপসেট হওয়ার কিছু নেই। পরশু সন্ধেবেলা...অ্যাই, শোনো, কাল আমি বিডিজি-র ক্লাসটা করতে পারব না। ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নিয়ে অনেকটা লাইব্রেরি ওয়ার্ক বাকি আছে। নোট করলে তোকে দেব, কপি করে নিস। এখন রাখছি। কাল এগারোটায় ক্লাসে দেখা হবে।' বলে টেলিফোন রেখে দিল শুভ।

মেয়েটি বুঝতে পারল, শেষ দিকটায় শুভ কাল্পনিক কোনও ক্লাসমেটের সঙ্গে কথা বলছিল। ওর এই অভিনয়ের একমাত্র কারণ হয়তো টেলিফোনের কাছাকাছি ওর বাবা এসে পড়েছেন। কিন্তু এই অবস্থায় অন্য সমস্যার কথা শুভ ভাবছে কেমন করে! মেয়েটি তো অন্য কোনও সমস্যার কথা আর ভাবতে পারছে না!

গা গুলিয়ে উঠল মেয়েটির। গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইল সবকিছু। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে ঢোক গিলল ও। রিসিভার রেখে দিয়ে আবার ডায়াল ঘোরাল।

বুথের বাইরে একজন তরুণ টেলিফোন করার জন্য অপেক্ষা করছিল। মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার ডায়াল ঘোরাতে দেখেই হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে দিল সে। রুক্ষ গলায় বলল, 'কী হল, দিদি। এখানে পরপর দুটো টেলিফোন করা যায় না। বাইরে আসুন, আমার হয়ে যাক, তারপর আপনি আবার করবেন।'

মেয়েটি ঘুরে তাকাল ছেলেটির দিকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি পাথর হয়ে গেল। ভাসানের সময় দুর্গা প্রতিমার মুখটা ঠিক এরকম দেখায়।

মেয়েটি কান্না-চাপা গলায় বলল, 'প্লিজ, আমার ভীষণ জরুরি দরকার...।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি করে নিন। বলেছি বলে কিছু মাইন্ড করবেন না।'

আবার ফোন করল মেয়েটি।

ও-প্রান্তে সেই রাশভারি গলা।

মেয়েটি রিসিভার রেখে দিল।

আবার ডায়াল ঘোরাল। আবার সেই কণ্ঠস্বর।

তারপরও সেই একই ব্যাপার।

তার পরের চেষ্টায় ও-প্রান্তে কোনও রিং শোনা গেল না। বোধহয় শুভদীপের বাবা বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন একপাশে।

একটা ঘোরের মধ্যে টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি। এখন আর ফোন করার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই। কিন্তু এখন কী করবে ও?

পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটি নানান কথা ভাবছিল।

সন্দেহটা ওর মনে মাথাচাড়া দিয়েছিল দিন সাতেক আগে থেকেই। মেয়েলি নিয়মটার গরমিল হতেই ওর ডায়মন্ডহারবারের ব্যাপারটা মনে পড়ে গিয়েছিল। তারপর যত দিন গেছে, ভয়টা ততই জমাট বেঁধেছে। অবশেষে কাল রাত থেকে ওয়াক উঠতে শুরু করেছে। রাতে ও দু-একবার বাথরুমে গিয়েছিল। তার মধ্যে একবার বমির দমক চাপতে পারেনি। কিন্তু শুধু খানিকটা জল বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি মুখ দিয়ে।

তারপর আজকের জঘন্য সকালটার শুরু। গা গুলোনো, মাথা ঝিমঝিম, সেইসঙ্গে ছোটখাটো আরও কত নানান উপসর্গ।

মা কয়েকবার স্নেহ মাখানো অবাক চোখে তাকিয়েছে, ডাক্তার দেখানোর কথা বলেছে, ওষুধ খাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু মেয়েটি বিশেষ আমল দেয়নি। বরং আজ অনেক বেশি সময় ধরে ও প্রার্থনা করেছে ঠাকুরের আসনের সামনে। সেখানে অধিষ্ঠিত মা কালী, দেবী লক্ষ্মী, আর দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁরা নিশ্চয়ই ওর প্রার্থনায় বিশেষ কান দেননি, কারণ শরীরের অস্বস্তি সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরও বেড়েছে।

ওর বাবা অতসব লক্ষ করেননি। সদাগরি অফিসের ম্যানেজারসাহেবের অতসব লক্ষ করার সময় কোথায়! সবসময় ধোপদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট হয়ে রয়েছে। ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। বাড়িতে তিনি সাধারণ সিগারেট খান। কিন্তু রাস্তায় বেরোলেই আঙুলের ফাঁকে থাকে দামি সিগারেট—অফিসেও তাই। অফিসের গাড়ি সকাল ন'টার সময় তাঁকে মোহনলাল স্ট্রিটের মুখ থেকে তুলে নিয়ে যায়। সেই গাড়িতে অফিসের আরও দুজন হোমরাচোমরা যাতায়াত করেন।

বাড়িতে বাবা যখনই কোনও কথা বলেন, তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে অফিস আর উন্নতি। মানুষটা শুধু প্রতিপত্তি আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেই গেল। মায়ের কাছে শুনেছে, একেবারে গরিব অবস্থা থেকে বাবা এই মাঝারি অবস্থায় পৌঁছেছেন। মাঝারি থেকে এখন পৌঁছতে চান অনেক উঁচুতে।

ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখের খবর তিনি খুব কম নেন। আর যখনই নেন,

সেটা একেবারে অফিসারের ঢঙে। কাজে-কর্মে ভুল হলে মাকে অধঃস্তন কর্মচারী ভেবে দিব্যি ধমক লাগান আর আঙুলের ফাঁকে সিগারেট রেখে একমনে টিভির খবর শোনেন।

দেশের খবর নিয়ে কমবেশি মাথাব্যথা থাকলেও বাড়ির খবরে খুব একটা বোধহয় আগ্রহ ভদ্রলোকের ছিল না। তা না হলে সদ্য-যুবতী মেয়ের তাল-কেটে-যাওয়া রোজকার জীবন কেন তাঁর নজরে পড়বে না!

আজ সারাদিন মায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে মেয়েটির। অথচ মা-কে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ছোটবেলা থেকে ওর মনে শুধুই মায়ের স্মৃতি। কারণ ওর বাবা তখন গরিব থেকে মধ্যবিত্ত হওয়ার চেষ্টায় দিনরাত ব্যস্ত ছিলেন।

ছোট-ছোট ভাই দুটোকেও মেয়েটি খুব ভালোবাসে। বুবুর বয়েস আট, আর টুটুর বয়েস পাঁচ। 'দিদি' বলতে ওরা দুজনেই একেবারে আত্মহারা। অথচ আজ ভাই দুটোর সঙ্গেও হাসিখুশি ব্যবহার করতে পারেনি মেয়েটি।

একটিমাত্র দুশ্চিন্তা ওকে চোখের পলকে অন্য গ্রহের বাসিন্দা করে দিয়েছে। ওর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা যেন ছোট্ট একটা ঘরে লুকিয়ে পড়েছে। আর সেই ঘরের জানলাগুলোও যেন বন্ধ করে দিয়েছে কেউ।

একটু আগে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করেছে, কোথায় বেরোচ্ছিস এখন, এই ঠান্ডার মধ্যে?'

'একটা...একটা ফোন করব...।'

'কাল সকালে করিস।'

'না। খুব জরুরি ফোন—এখনই করা দরকার।' দরজার কাছে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল ও।

'যা তা হলে। যা ভালো বুঝিস কর। এখন তুই বড় হয়ে গেছিস, নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছিস—' মা অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলছিল।

মা-কে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তখন।

'আজ সকাল থেকে তোর কী যে হয়েছে!' মা আলনার জামাকাপড় গুছোতে-গুছোতে আবার কথা বলছিল, 'তোকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়—'

শুভদীপের কথা কাউকে বলেনি ও। বাবা তো জানেই না, মা-ও না। ইস, যদি মা-কে সব খুলে বলতে পারত!

মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে, 'কেন, শুধু-শুধু চিন্তার কী আছে!'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'দশ মাস দশ দিন তো পেটে ধরেছি, তাই...।'

দশ মাস দশ দিন!

কথাটা ধাক্কা মারল মেয়েটির বুকে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই দশ দিন কেটে গেছে। তা হলে আর দশ মাস বাকি। মা যদি ব্যাপারটা এখন শোনে তা হলে কি হার্টফেল করবে? মায়ের তো আবার হাই ব্লাড প্রেসারের ধাত রয়েছে।

আর কথা বাড়ায়নি ও। থমথমে মুখে সদর দরজা খুলে নেমে এসেছে রাস্তায়।

এখন, বাড়ি ফেরার পথে, বারবার ওর মনে হচ্ছিল, প্রতিটি মুহূর্তে ওর শরীরের ভেতরে আর একটা শরীর বেড়ে উঠছে।

মেয়েটির চিন্তা এলোমেলো দিশেহারাভাবে ছুটোছুটি করে শেষ পর্যন্ত পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

'মা জননী, অন্ধকে কিছু সাহায্য করবেন—।'

চমকে উঠে মেয়েটি দেখল, ফুটপাথে একজন অন্ধ ভিখারি একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে ভিক্ষে করছে।

মেয়েটি পার্স থেকে একটা টাকা বের করে লোকটিকে দিল।

'ভগবান আপনার ভালো করবেন...।'

মেয়েটি প্রায় চোখ বুজে সেই আশিস গ্রহণ করল। এখন ওর সবরকমের শুভেচ্ছা প্রয়োজন।

বাড়িতে ফেরার পর মেয়েটি ঠিক করল, কাল ও ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে শুভদীপের সঙ্গে দেখা করবে। এই সমস্যাটা এমন কিছু বড় সমস্যা নয়। শুভদীপ নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সমাধান তো একটা আছেই ঃ বিয়ে।

এই চিন্তাটাকে পাখির ছানার মতো বুকে আঁকড়ে ধরে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিল মেয়েটি। বারবার ওর গা গুলিয়ে উঠছিল, মাথা দপদপ করছিল, কিন্তু শুভদীপের সঙ্গে কাটানো ভালোবাসার মুহূর্তগুলোর কথা সিনেমার ছবির মতো পরপর ভেবে ও নিজেকে সামলে রাখছিল। কখনও-কখনও দু-এক কলি গান গেয়ে মনটা হালকা করতে চাইছিল।

কাল শুভদীপের সঙ্গে দেখা হলেই আর কোনও চিন্তা নেই। তারপর মা-কে সব কথা খুলে বলবে ও। মা-কে কষ্ট দিয়েছে ভেবে ও মনে-মনে কষ্ট পেল। কাল ও মা-কে গলা জড়িয়ে ধরে সব বলবে। বলবে, 'মা, মাগো, আমিও তোমার মতো দশ মাস দশ দিন কষ্ট করতে শিখেছি।'

মনটা বোধহয় ওর শান্ত হয়ে আসছিল। কারণ, একসময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি। তবে ঘুমিয়ে পড়ার আগে ও আকুল হয়ে তেত্রিশ কোটি দেব-

দেবীকে ডেকেছিল।

দেবতারা যে ওর আকুল প্রার্থনায় কান দেননি সেটা মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল এক সপ্তাহের মধ্যেই।

শুভদীপ ওর সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল।

## একটি শীতের সন্ধ্যা, ১৯৯৪ সাল

ভদ্রমহিলা আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছিলেন। বেশ মোটাসোটা কালোকোলো চেহারা। সিঁথির সিঁদুর বেশ চওড়া। যতটা চওড়া, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বোধহয় ঠিক ততটাই সরু। তাই আমার কাছে এসেছেন। সম্পর্ক জোড়া লাগানোর ঝাড়ফুঁক তুকতাক করতে।

বড়-বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু খোনা গলায় তিনি অনুনয় করে বললেন, 'কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে। অনেক আশা নিয়ে আমি এসেছি—।'

আমি মহিলাকে ভালো করে দেখলাম। তিনটি সন্তানের জননী। জননী হওয়ার জন্যে আলাদা কোনও যোগ্যতার দরকার হয় না। এ-ব্যাপারে পশু বা মানুষের কোনও তফাত নেই। শুধু জন্মসূত্রে শারীরিক কোনও গোলমাল না থাকলেই হল।

ভদ্রমহিলার স্বামী অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে বেড়ায়। কবে নাকি স্বামীর ব্যাগের মধ্যে একটা পারফিউম মাখানো রুমাল পেয়েছিলেন তিনি। তারপর দু-মাসের ব্যবধানে দুটো চিঠি। না, নির্দোষ চিঠি নয়, প্রেমপত্র।

এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তুমুল হয়ে গেছে, অথচ লাভ কিছুই হয়নি। ভদ্রমহিলার যা চেহারা দেখছি তাতে ওঁর পক্ষে স্বামীকে বশ করা বেশ মুশকিল। তার ওপর উনি ফ্রিজিড কি না কে জানে!

কিন্তু চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। এই চেষ্টা করার জন্যেই সবাই আমাকে টাকা দেয়। আর সেই টাকাতেই আমার আর মায়ের দিন চলে যায়।

'আপনার স্বামীর নাম কি?' ওঁকে জিগ্যেস করলাম।

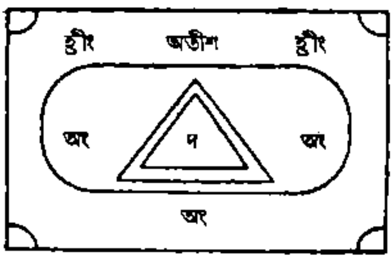
'অতীশ। অতীশ নন্দী—' উৎসাহ নিয়ে মহিলা বললেন।

আমি পাশের টেবিল থেকে বেশ মোটাসোটা একটা বই টেনে নিলাম। অতি ব্যবহারে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোর সেলাই ঢিলে হয়ে গেছে। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে নির্দিষ্ট একটা জায়গা খুঁজে পেলাম ঃ পতি বশীকরণ মন্ত্র। পাতার মার্জিনে আমারই লেখা নানান নোট।

সামনে রাখা একটা সাদা খাতা টেনে নিলাম। একটা ফরসা পৃষ্ঠা বের করে লিখতে শুরু করলাম ঃ

*মন্ত্র ঃ 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণী পতিং মে বশ্যং কুরু-কুরু স্বাহা।'*

*মঙ্গলবার একটি গোটা সুপারি উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে মুখে রাখবে। স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, সুপারিটি মুখ থেকে বার করে দুধ, গঙ্গাজল দ্বারা ধুয়ে আবার সেই সুপারিটি উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে সেটা কুচিয়ে পান সেজে স্বামীকে খাওয়ালে পতি বশ হবে। তীব্র বশীকরণ প্রভাব পেতে হলে সুপারির সঙ্গে বাদুড়ের কানের সামান্য টুকরো এবং গোরোচনা মিশিয়ে পতিকে খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া অভিমন্ত্রিত করার সময় নীচের যন্ত্রটি অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভুর্জপত্রে অঙ্কন করে চোখ বুজে বাঁ-হাতের কনিষ্ঠা দ্বারা স্পর্শ করে রাখতে হবে। এই আচার পালন করলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।*




পতিবশীকরণ যন্ত্র

লেখা এবং যন্ত্রের ছবি আঁকা শেষ হলে কাগজটা ভদ্রমহিলার হাতে নিয়ে বললাম, 'আপনার চেনাজানার মধ্যে অতীশ নামে আর কেউ নেই তো?'

ভদ্রমহিলা দ্রুত মাথা নেড়ে জানালেন, না, কেউ নেই।

আমি বললাম, 'থাকলে মুশকিল হত। দুজন অতীশই আপনার টানে পাগল হত।'

ভদ্রমহিলা বিনয়ের হাসি হেসে বোধহয় ব্লাশ করলেন। গায়ের রঙ কালো বলে রক্তের টুকটুকে লাল উচ্ছ্বাস বোঝা গেল না।

কাগজের লেখা ইত্যাদি পড়া শেষ হলে তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'গোরোচনা জিনিসটা কী?'

'গোরুর পিত্ত থেকে একরকম চকচকে হলদে জিনিস বেরোয়—সেটাই।'

'কিন্তু এই গোরোচনা আর বাদুড়ের কানের টুকরো পাব কোত্থেকে? ওগুলো বাদ দিয়ে যদি...।'

ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে। ওগুলো বাদ দিলে কাজ হবে না। আপনাকে নিউ মার্কেটের একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

ওখানে গিয়ে আমার নাম বললে সব পেয়ে যাবেন। তবে দোকানের নামটা আর কাউকে জানাবেন না—।'

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞভাবে বারবার ঘাড় নাড়লেন। তারপর তাঁর হ্যান্ডব্যাগ থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে জিগ্যেস করলেন, 'কত দেব?'

আমি বই আর খাতা গুছিয়ে রাখতে-রাখতে বললাম, 'দুশো—।'

এমন সময় মা দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। চেহারা এতই রোগা যে, গায়ের চাদরের একপাশ খসে পড়েছে। মুখে অসংখ্য ভাঁজ, চোখে চশমা, গাল ভাঙা, মাথার সব চুল সাদা ধবধবে।

আমাদের দুজনের সামনে দুটো কাপ সাজিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'এতসবের কী দরকার ছিল...।'

আমি বললাম, 'আমার মা—।'

মহিলা দুশো টাকা আমার হাতে দিয়ে ব্যাগটা সরিয়ে রেখে আচমকা উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। মায়ের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঝপ করে একটা প্রণাম সেরে ফেললেন। মা লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে গেল।

আমি মজা পেলাম। ভদ্রমহিলা বোধহয় মা-কে বড়-ডাইনি ভেবেছেন, তাই এত ভক্তি।

মা কোনও কথা না বলে চলে গেল। বহু বছর ধরেই মা খুব কম কথা বলে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে ভদ্রমহিলা বিড়বিড় করে আমার দেওয়া কাগজটা পড়ছিলেন। বোধহয় এখন থেকেই মন্ত্র প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু মাঝে-মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার শব্দ।

ভদ্রমহিলা এখন বোধহয় এই মধ্যবিত্ত মলিন ঘরে বসে থাকতে অস্বস্তি পাচ্ছেন। কাজ মিটে গেলে কে-ইবা ডাইনির আস্তানায় বসে থাকতে চায়!

চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটা কথা জিগ্যেস করছি...কিছু মনে করবেন না...।'

আমি বললাম, 'বলুন। আমার কাছে মন খুলে কথা না বললে কাজে মানান প্রবলেম হয়...।'

হাতের কাগজটা আমাকে দেখিয়ে তিনি অসহায় বালিকার গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এসবে ঠিকঠাক কাজ হবে তো?'

'আপনার কী মনে হয়?'

তিনি বেশ লজ্জা পেয়ে বলে উঠলেন, 'না, মানে, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আপনি তো আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন...ওইসব জিনিস

ঘাঁটতে হবে। আমার গা গুলিয়ে উঠছে...বমি পাচ্ছে...।'

'আপনার কোনও চিন্তা নেই। একবার একটু কষ্ট করেই দেখুন না। আর একটা কথা ঃ যেদিন পানটা সেজে স্বামীকে খাওয়াবেন, সেদিন উপোস করে থাকবেন। খেয়াল রাখবেন, আপনার হাজব্যান্ড যেন কিছু টের না পায়—।'

ভদ্রমহিলা ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে কৃতজ্ঞতায় আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। আমি ওঁকে দরজার কাছে এগিয়ে দেওয়ার সময় বললাম, 'হাজব্যান্ডের সামনে একটু সেজেগুজে থাকবেন। একটু পারফিউম-টারফিউম মাখবেন।'

আচমকা এই হিতোপদেশে ভদ্রমহিলা একটু যেন অবাক হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

'নিয়মগুলো ঠিক-ঠিক মানবেন। কাজটার এফেক্ট কী হল ও-সপ্তাহে আমাকে ফোন করে জানাবেন।'

এই বশীকরণ মন্ত্রে যদি কাজ না হয় তা হলে ওঁর অতীশকে আর ধরে রাখা যাবে না। তখন বাদুড়ের কান কেন, ইয়েতির 'ইয়ে' পানে সেজে খাওয়ালেও কোনও কাজ হবে না।

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। এখন আর কোনও ক্লায়েন্টের আসার কথা নেই। পাশের রান্নাঘর থেকে পাঁচফোড়নের গন্ধ নাকে আসছে। মা রান্না শুরু করে দিয়েছে।

চুপচাপ বসে আমি নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা ভাবছিলাম। আর চার দেওয়ালে ঘেরা ছোট্ট ঘরটাকে দেখছিলাম। কুড়ি বছরে এই ঘরটা এতটুকু বদলায়নি। অথচ জীবন কত বদলে গেছে!

ঘরের দেওয়ালগুলো বিশ বছরে আরও জীর্ণ মলিন হয়েছে। একদিকের দেওয়াল নানানরকম তন্ত্র-মন্ত্র অলৌকিক আচারের বই আর কাগজপত্রে ঠাসা। আর একদিকের দেওয়ালে অনেকগুলো তাক। তাকে নানা জড়িবুটি, পশুপাখির লোম-পালক, হাড় আর নখ, রুদ্রাক্ষ, হরীতকী, শুকনো নিমপাতা, সাপের খোলস ইত্যাদি রয়েছে। ক্লায়েন্টদের দরকারে এগুলো ব্যবহার করতে হয় আমাকে।

তাকগুলোর ওপরে দেওয়ালে রক্ষাকালীর এক বিশাল মাপের ফটো টাঙানো। লোল জিহ্বা, করাল বদন, ছিন্ন মুণ্ডে সজ্জিতা দেবী। এই ফটোর প্রভাব আমার ওপরে যত না, তার চেয়ে ঢের বেশি আমার ক্লায়েন্টদের ওপরে। কারণ, দেবদেবীর ওপর ভক্তি আমার অনেকদিন আগেই ক্ষয়ে গেছে।

এখন আমার মা নিত্য দেবতার পুজো করে। আর আমি করি অপদেবতার পুজো।

মা কালীর উলটোদিকের দেওয়ালে আর-এক দেবতার ফটো ঃ আমার পিতৃদেব। বছরে একদিন ধূপধুনো ফুলমালায় পুজো পেয়ে থাকেন। যদিও সবসময় উনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু ফটোর মানুষ বলেই আমাকে দেখতে পান না। পেলে তাঁর ম্যানেজার-সুলভ গলায় নির্ঘাত ধমকের সুরে বলে উঠতেন, 'এসব কী হচ্ছে, লিলু! তোমাকে না কতদিন শিখিয়েছি, ভূত-প্রেত অপদেবতা বলে কিছু নেই!'

'দেবতা বলেও তো কিছু নেই, বাবা!' আমি হেসে আপনমনেই বলে উঠলাম।

এই বাড়িতে দেবতা একদিন ছিল। কিন্তু বিশ বছর আগে তাঁরা একটা আঠেরো বছরের অসহায় মেয়েকে একা ফেলে রেখে আকাশে চম্পট দিয়েছে।

বাবার ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমার গা গুলিয়ে উঠছিল, বমি পাচ্ছিল অকারণে। পুরোনো সেই রাতটাকে আমি ফিরে পাচ্ছিলাম মনে-মনে।

অবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল তখন ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারিনি আমি। গা গুলিয়ে, মাথা ঘুরে, বমি হয়ে সে এক সাংঘাতিক অবস্থা!

মা আমাকে ধরে-ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার সময় বারবার জিগ্যেস করছিল ঃ 'লিলু, কী হয়েছে বল! কী হয়েছে বল!'

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শুভদীপের নির্লিপ্ত নির্বিকার গলা কানে বাজছিল ঃ 'ভয়ের কিছু নেই।' আর ততই আমার ভয় বাড়ছিল।

মা-কে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম আমি। মা আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে কী বুঝেছিল কে জানে! মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। চাপা ভর্ৎসনার গলায় বলেছিল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!'

আমার গা পাক দিয়ে উঠেছিল। ছুটে বাথরুমে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বমি করতে শুরু করলাম। মা তাড়াতাড়ি এসে বাথরুমের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল, যাতে নাক-গলানে পড়শিরা আমার বমির শব্দ শুনতে না পায়।

সেদিন রাতে ঠাকুরের আসনের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে বসে মা পাথরের মূর্তি হয়ে স্থির ভেজা চোখে তাকিয়ে ছিল দেবতাদের দিকে। এই বিশটা বছরে দেবতারা মা-কে কী দিতে পেরেছেন জানি না, তবে মা এখনও ঠাকুরের আসন ছাড়েনি, দেবতাদের ছাড়েনি, আর...আর আমাকেও ছাড়েনি।

চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে আমি বাবার গলা পেলাম। বাবা কাঁদছে।

রাত তখন অনেক। পাশের ঘর থেকে মা আর বাবার চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। হঠাৎই বাবা কেঁদে উঠল। ইনিয়েবিনিয়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

আমি অস্বস্তি আর যন্ত্রণার মধ্যেও হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফিটফাট পোশাক পরা চব্বিশ ঘণ্টার ম্যানেজারসাহেব কাঁদছে! বাবাকে সেই প্রথম কাঁদতে শুনেছিলাম। মানুষটা ভেঙেচুরে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। অফিসে বাড়িতে যে সবসময় শৃঙ্খলা বজায় রাখে সে নিজেই বেসামাল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।

সে-রাতে আমার ভালো লেগেছিল। বাবা তা হলে আমাদের কথা ভাবে, আমার সুখ-দুঃখের কথা ভাবে!

কিন্তু তিনদিন পর বুঝেছিলাম, বাবা আমার সর্বনাশ নিয়ে ভেঙে পড়েনি। বাবা ভেঙে পড়েছে নিজের সর্বনাশের চিন্তায়। কারণ, আমার ব্যাপারটা পাঁচ কান হলে দামি সিগারেট খাওয়া ম্যানেজারসাহেবের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কী হাল হবে সেটা ভেবেই বাবা ভেঙে পড়েছিল। এই মানসিক চাপ মানুষটা নিতে পারেনি। তাই এক ছুটির দুপুরে সিলিং ফ্যানে মায়ের শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল।

বাবার গল্প সেখানেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু আমার গল্প নয়।

স্বপ্নে দেখা স্লো-মোশান সিনেমার মতো আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে ছবির ফ্রেমের কোনা দিয়ে একটা সরু কালচে রক্তের ধারা ধীরে-ধীরে গড়িয়ে নামছিল।

পুরোনো স্মৃতি সত্যিই বড় নির্লজ্জ। যখন তখন ল্যাংটা হয়ে চোখের সামনে এসে নাচানাচি করে। যেমন এখন, এই অসময়ে, বিশ বছরের পুরোনো কথা মনে পড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। স্মৃতিকণা নামের বিশ বছরের এই উদোম তরুণী শরীরে মোচড় দিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে নাচতে থাকে। নাচতে-নাচতে ও কমলালেবুর খোসার রস ছুড়ে দেয় আমার চোখে। আমার চোখ জ্বালা করে, বুক জ্বালা করে।

হঠাৎ মায়ের গলা পেলাম, 'কী রে, লিলু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি!'

আমি চোখ মেলে তাকালাম। এই শীর্ণ জীর্ণ বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। এঁর সহ্যের কোনও সীমা নেই।

একের পর এক মর্মান্তিক ঝড় বয়ে গেছে আমার মায়ের ওপর দিয়ে।

প্রথমে আমার ঘটনা।

তারপর বাবার স্বার্থপরের মতো আত্মহত্যা।

আর, অবশেষে, বুবু আর টুটুর আলাদা হয়ে যাওয়া।

বিয়ের পরই ওরা আলাদা হয়ে গেছে। দিদির সঙ্গে ওদের দূরত্ব আগেই অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর সেই দূরত্বের মাঝে কেউ যেন কংক্রিটের পাঁচিল তুলে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি আর মা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইলাম। একটা সময়ে প্রচুর টিউশানি করে টাকা রোজগার করতাম। তারপর কী করে কী হয়ে গেল, ঝাড়ফুঁক তুকতাকের দু-একটা বই হাতে এসে গেল। আর একইসঙ্গে তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝোঁক গেল বেড়ে। গোয়াবাগানের এক 'বাবা'র আশ্রমে আমি প্রায়ই যেতাম। ভদ্রলোকের নাম নৃপেন সাধুখাঁ। সংসারী তান্ত্রিক বলে নিজের পরিচয় দিতেন। সেখানে প্রায় বছর পাঁচেক তাঁর সাধন সঙ্গিনী হয়ে ছিলাম। শরীর বা মন নিয়ে শুচিবায়ুর ব্যাপারটা আর ছিল না। তাই বোধহয় 'গুরু'কে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

'তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে দেব?' মা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'তোর কি খুব ক্লান্ত লাগছে?'

আমি একটা হাই তুললাম। তাকে রাখা টেবিলঘড়ির দিকে তাকালাম ঃ প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। মাকে বললাম, 'ন-টা বাজলে খেতে দিয়ো। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব—।'

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। মা ফোন ধরে কথা বলে আমার দিকে রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর ফোন।'

আমি রিসিভার কানে চেপে ধরে 'হ্যালো' বললাম।

ও-প্রান্তে মিসেস খান্ডেল্‌ওয়াল কথা বললেন। আমার অনেকদিনের ক্লায়েন্ট। ওঁর বিশ্বাস, আমার মন্ত্রতন্ত্রের জন্যেই উনি মা হতে পেরেছেন।

প্রায় বছর ছয়েক হল আমার পসার বেড়েছে। ক্লায়েন্টরাই আমাকে সবকিছু দিয়েছে। এই টেলিফোনও ওদেরই দেওয়া। এসব আমি কখনও ভুলি না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন শুতে গেলাম, তখন হঠাৎই মনে হল, আর দিন কয়েক পর ১৮ ডিসেম্বর। বিশ বছর আগে ওই দিনটাতেই আমি শুভদীপকে টেলিফোন করতে বেরিয়ে শ্যামবাজার কালীবাড়ির দেওয়ালে মাথা খুঁড়েছিলাম—কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।



এশিয়াটিক সোসাইটিতে কয়েকটা বইয়ের খোঁজে গিয়েছিলাম।

মাঝে-মাঝে নিজের পড়াশোনার কাজে ওখানে যেতে হয় আমাকে। আজ দুটো বই কিনলাম ওদের সেল্‌স কাউন্টার থেকে ঃ 'এ ক্রিটিক্যাল এডিশান অফ শ্রীকালচক্রতন্ত্ররাজ' আর 'তন্ত্রালোক'। তারপর ওদের পুথিঘরে পড়াশোনা সেরে বেরিয়ে এসেছি বিকেলের পার্কস্ট্রিটে।

সূর্য ডুবে গিয়ে এর মধ্যেই ছায়া নেমেছে। শীতের হাওয়া বেরিয়ে পড়েছে

সান্ধ্য ভ্রমণে। সামনের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ একা-একা লাগছিল। মাঝে-মাঝে এই নিঃসঙ্গতার অসুখ আঁকড়ে ধরে আমাকে। আমার জানা এমন কোনও জড়িবুটি নেই যা এই অসুখ সারাতে পারে।

আমি জানি, আমি স্বাভাবিক নই। আমার বয়েসি যৌবন যাই-যাই কোনও মহিলা সারাদিন নানারকম স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। আর আমি! আমার যত ব্যস্ততা আমার পেশাকে ঘিরে। আমার কোনও বন্ধু নেই—ছেলে-বন্ধুও না, মেয়ে-বন্ধুও না। শুভদীপের ঘটনার পর আমার বিশ্বাসের জায়গাটায় বোধহয় কোনও গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলেও কাউকে আমি বিশ্বাসের আওতার মধ্যে নিয়ে এসে বন্ধু করতে পারিনি। শুধু আমি আর মা লতানে গাছের মতো পরস্পরকে জড়িয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছি।

শরীরের তাড়না আমি কখনও-কখনও টের পাই। তখন কামোত্তেজনা দমন যন্ত্র সামনে রেখে নিয়মমতো অভিমন্ত্রিত করে সে-তাড়নার উপশম করি। তবে সবসময় যন্ত্র বা মন্ত্রে কাজ হয় না।

যে-তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাবসা করে আমি বেঁচে আছি, তাতে কি আমি বিশ্বাস করি?

বহুদিন ধরে ভেবে উত্তর পেয়েছি 'হ্যাঁ'। আমার বিশ্বাসে ইন্ধন জুগিয়েছে আমার অসংখ্য মক্কেল। আর, যে কখনও তোমার ক্ষতি করবে না, তাকে বিশ্বাস করতে ভয় কিসের! তন্ত্রচর্চা কখনও আমাকে নিরাশ করেনি।

ফুটপাথের কোণে দাঁড়িয়ে এসব নানান কথা ভাবছিলাম। অফিস ফেরত লোকজন অনবরত যাতায়াত করছে পাশ দিয়ে। হঠাৎই বিশ বছরের পুরোনো একটা ভূত দেখে আমি চমকে উঠলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে লাফিয়ে পড়ল স্মৃতিকণা নামের মেয়েটা। আমাকে ঘিরে ফুটপাথের ওপরেই ড্যাং-ড্যাং করে নাচতে শুরু করল। ওর বুক উরু অশ্লীলভাবে নড়ছে। আর বিলোল কটাক্ষে আমাকে প্রতি মুহূর্তে শেষ করে দিচ্ছে।

ভূতটা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। খানিকটা অবাক হয়ে দেখছিল আমাকে।

আমি প্রথমটায় ভেবেছি সন্ধের আলোছায়ায় ভুল দেখছি। কিন্তু না, ভূতটা এখনও মিলিয়ে যায়নি!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সবকিছু সেই একইরকম—চলার ছিরি, মুখের ছাঁদ, চুলের কায়দা, আর সর্বনাশা সেই দুটো চোখ।

স্মৃতিকণা পাগলের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বাতাসে হাত-পা ছুড়ে নাচছিল।

আমার মাথার ভেতরে মা অবাক চিৎকারে বলছিল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!' আর বাবা কপাল চাপড়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছিল।

ভূতটা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল।

এবার আরও ভালো করে দেখলাম।

বয়েস হয়েছে, কপালের দুপাশের চুল ফিকে হয়ে এসেছে, কোমর একটু ভারি, প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটারে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করেছে বটে, তবে উঁচিয়ে ওঠা ভুঁড়ির জন্যে একটু বোকাসোকা লাগছে।

কিন্তু চোখ দুটো পালটায়নি। সেই গভীর টলটলে চোখ। রোমান্টিক। এখনও—বিশ বছর পরেও। কেন যে এই চোখের গভীরে সেদিন বোকা মেয়ের মতো ঝাঁপ দিয়েছিলাম! কেন যে ওকে অতটা বিশ্বাস করেছিলাম! কিন্তু তখন যে আমাদের বয়েসটাই ছিল না ভেবে কাজ করার বয়েস।

না, ভূতটাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি।

'আপনাকে যেন চেনা-চেনা লাগছে—' ভূতটার গলার স্বরে এখনও সেই পুরোনো ম্যাজিক।

আমি বললাম, 'শুভদীপ? শুভ?'

'লীলা...শ্যামবাজার...লিলু...মানে...' ও হাসল।

আমি উত্তরে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে তুললাম ঠোঁটে।

'ওঃ, সেই টিপিক্যাল হাফ স্মাইল! বাব্বাঃ, কতদিন পর দেখা! পনেরো-যোলো বছর হবে, কী বলো?'

আমি বললাম, 'পনেরো নয়, কুড়ি...বিশ বছর...।'

বিশ বছর? নাকি বিষ বছর?

শুভদীপের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। আমার 'টিপিক্যাল হাফ স্মাইল'-এর ব্যাপারটাও ও মনে রেখেছে! কিন্তু বিশ বছরটা ভুলে গেছে অনায়াসে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর শুভ বলল, 'লিলু, চলো, কোথাও গিয়ে একটু বসি—যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে। কত গল্প জমে আছে, জানো?'

আমি অবাক হয়ে শুনলাম আমি বলছি, 'চলো, কোনও আপত্তি নেই।'

রাস্তা দিয়ে কত গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। শুভকে আমি কেন এক ধাক্কায় কোনও গাড়ির তলায় ফেলে দিচ্ছি না! কেন খতম করে দিচ্ছি না ওর পৌরুষের আস্ফালন?

আমার একা-হয়ে যাওয়া মন বোধহয় এই মুহূর্তে কারও সঙ্গ চাইছিল। তাই ওর পাশাপাশি হেঁটে চললাম অনায়াসে। বাবার কান্না আর আমি শুনতে

পাচ্ছিলাম না।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে শুভ বলল, 'লিলু, সত্যি, ভাবা যায় না! বিশ বছর পর হঠাৎ করে এরকম রাস্তায় দেখা...!'

আমি অল্প হেসে বললাম, 'আমি আর সহজে অবাক হই না, শুভ। ভাবা যায় না এরকম অনেক কিছু আমি এই বিশ বছরে ভাবতে শিখেছি।'

শুভ একটু অবাক চোখে দেখল আমার দিকে। মজা করে বলল, 'আমার লিলু অনেক পালটে গেছে।'

'পালটাবেই তো। আঠেরো বছর আর আটতিরিশ বছরে অনেক তফাত।'

আমরা 'টমি ক্যাট' রেস্তরাঁয় গিয়ে বসলাম।

রেস্তরাঁর ভেতরটা আবছা অন্ধকার। মাঝে-মাঝে লাল-নীল স্পট জ্বলছে। চাপা ঝংকার তুলে হালকা মিউজিক বাজছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোট-ছোট বুকওয়ালা একটা রোগা মেয়ে মিহি গলায় হিন্দি গান গাইছে।

রেস্তরাঁর সাজগোজ মন্দ নয়। পালিশ করা কাঠের দেওয়াল। তার ওপরে পেতলের কারুকাজ। আর দেওয়ালের নানা জায়গায় রহস্যময় ছমছমে অয়েল পেইন্টিং ঝোলানো। দরজার কাছে রঙিন কাচের চুড়ির শিকল ঝুলিয়ে তৈরি চিক। তার জায়গায়-জায়গায় লাল-নীল হলদে টুনি বাতি।

শুভদীপ মেনু কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পছন্দসই অর্ডার দাও।'

আমি বললাম, 'শুধু একটু স্ন্যাক্স নেব। যেমন, চিকেন, স্যান্ডউইচ চলতে পারে। তার সঙ্গে কফি।'

শুভ পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে-ধরাতে বলল, 'ব্যস, এই! ড্রিঙ্কস নেবে না?'

'না। অভ্যেস নেই—' একটু থেমে তারপর : 'তবে তুমি নিতে পারো। আই ওন্ট মাইন্ড।'

শুভ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমি একটু হুইস্কি নেব। ফর ওল্ড টাইমস সেক—।'

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

বিশ বছর আগের মতো সুন্দর করে হেসে শুভ জিগ্যেস করল, 'বলো, কেমন আছ। কী-কী করলে এই কুড়ি বছরে—।'

ওর কথার সহজ সুরে মনে হল, বিশ বছর নয়, ওর সঙ্গে বিশ ঘণ্টা পরে যেন আমার দেখা হল।

টেবিলের একপাশে কাচের গ্লাসে সাজানো পেপার ন্যাপকিনের নকশা

দেখতে-দেখতে বললাম, 'তেমন কিছুই করিনি। শুধু বুড়ি হয়েছি। কোনওরকমে দিন চলে যাচ্ছে...।'

'কে বলেছে তুমি বুড়ি হয়েছ!' কথাটা বলে শুভদীপ আমার সাজপোশাক দেখছিল। বারবার তাকাচ্ছিল আমার বুকের দিকে। বয়েস সেখানে ছাপ ফেলতে পারেনি। তা ছাড়া আমি তো জানি, ওর বরাবরই বুকের নেশা—তা সে ছোটই হোক, আর বড়ই হোক।

'বিয়ে তো করোনি দেখছি—।'

ওর সিগারেটের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছিল, আর বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, মানুষটা সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে আর কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

আমি হেসে বললাম, 'শুধু বিয়ে কেন, অনেক কিছুই করা হয়ে ওঠেনি।'

আবার সিগারেটে গভীর টান। তারপর ঃ 'বিয়ে না করার জন্যে নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাওনি!'

আমার বমি পাচ্ছিল, গা গুলিয়ে উঠছিল। বললাম, 'ওটা ছাড়া আর কোনও টপিক নেই?'

শুভ হাসল—স্বস্তির হাসি। ও বোধহয় ভেবেছিল, আমি পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে ওর দায়দায়িত্ব নিয়ে চাপান-উতোর শুরু করব। সেই আশঙ্কা কেটে যেতেই ও অনেক সহজ হয়ে গেল।

'এখন কোথায় থাকো? সেই শ্যামবাজারে?'

'হ্যাঁ। একই বাড়িতে। থাকা বলতে আমি আর মা।'

'মেসোমশাই?'

শুভদীপ আমাদের বাড়িতে কখনও যায়নি। শুধু আমার মুখে সকলের গল্প শুনেছিল। ওকে সংক্ষেপে সবার কথা বললাম। তবে বাবা যে আত্মহত্যা করেছে সেটা জানালাম না।

চিকেন স্যান্ডউইচ আর পটাটো চিপ্‌স চলে এল টেবিলে। সঙ্গে টমাটো সস।

শুভ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে স্যান্ডউইচে সস মাখাতে শুরু করল। দু-এক টুকরো চিপ্‌স দাঁতে কেটে স্যান্ডউইচে কামড় বসাল।

আমারও খিদে পেয়েছিল। তাই লোক-দেখানো লজ্জা না করে খেতে শুরু করলাম।

'তুমি আর মাসিমা বাড়িতে একা থাকো!' শুভ বেশ অবাক হয়ে বলল। কিন্তু ওর চোখে একটা লোভের ছায়া দেখতে পেলাম আমি। মনে হল, কয়েক মিনিট পরেই ও হয়তো আমার বাড়িতে আসার বায়না ধরবে।

আমি ওর কথায় হাসলাম, বললাম, 'দুজন থাকলে আর একা কোথায়!'

'তোমাদের চলে কী করে?'

আমি স্যান্ডউইচ চিবোতে-চিবোতে বললাম, 'স্যান্ডউইচটা বেশ ভালো করেছে।'

'তোমাদের চলে কী করে?' শুভদীপ নাছোড়বান্দার মতো দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করল।

আমি হেসে ওর দিকে তাকালাম, বললাম, 'আমি স্যান্ডউইচ মাইনাস স্যান্ড। ওই করেই বেশ চলে যায়।'

শুভ চোখ কপালে তুলে জিগ্যেস করল, 'তার মানে?'

'আমি উইচ। সাদা কথায় যাকে ডাইনি বলে। তুকতাক ঝাড়ফুঁক নিয়ে আছি—।'

আমার কথায় ও এত জোরে হেসে উঠল যে, পাশের টেবিলের লোকজন প্রায় চমকে উঠল। কিন্তু ওর হাসি কিছুতেই আর থামতে চায় না।

হাসতে-হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। কোনওরকমে বলল, 'লিলু, দারুণ জোক করেছ। তোমাকে সেলাম।'

আমি কোনও কথা বললাম না। সত্যি কথা বলেছি, বিশ্বাস করা-না-করা ওর ব্যাপার। ওকে বিশ্বাস করিয়েই বা আমার কী লাভ!

'এবার তোমার কথা বলো—।' আমি ঠান্ডা গলায় বললাম।

শুভদীপের সাজপোশাক, হাতের হিরের আংটি ইত্যাদি জানিয়ে দিচ্ছিল ও বেশ আরামেই জীবন কাটাচ্ছে।

আমার তলপেটটা ব্যথা করছিল। চিনচিনে ব্যথা। এ-ব্যথা থেকে নিস্তার নেই। একটা সিনেমার রিল উলটোদিকে ঘোরাচ্ছিল কেউ। বিশ বছরের পথ পেরিয়ে গেল বিশ সেকেন্ডে। লীলা, এ তুই কী করলি! এ তুই কী করলি!

স্মৃতিকণা কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে টেবিলে। [illegible] হাত-পা-বুক দুলিয়ে-দুলিয়ে ওর সে কী নৃত্য! ছাতা-পড়া পুরনো ঘা-টাকে ও যেন খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দগদগে করে তুলছিল।

আমি পলকের জন্যে চোখ বুজলাম। ওঃ! তোর এই হাহাকারী নাচ আর কত দেখব!

শুভদীপ ওর ব্যাবসার কথা বলছিল। বাবার ব্যাবসাকে কীভাবে কৃতিত্বের সঙ্গে ও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছে গর্ব করে সে-কথাই শোনাচ্ছিল। ওরা এখন প্রায় সাতাশ রকম কনুজিউমার প্রোডাক্ট তৈরি করে। বরানগরে ওদের বিশাল ফ্যাক্টরি। বাবা মারা গেছেন চার বছর। এখন ও আর ওর ছোট ভাই সবকিছুর মালিক। মায়ের অংশটা ওরা দুজনেই দেখাশোনা করে। ওরা এখনও সেই

যোধপুর পার্কের বাড়িতেই আছে। নতুন একটা বাড়ি তৈরি করেছে সল্টলেকে। সেটা লিজ দেওয়া আছে।

বোঝা গেল। আমার সামনে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে একজন সফল লম্পট।

আমি নির্লিপ্ত মুখে শুভর কথা শুনছিলাম। ও আমার কাছে ঝুঁকে এসে চাপা গলায় বলল, 'লিলু, আমাদের প্রোডাক্টের লিস্টে অ্যাডাল্ট আইটেমও আছে।'

আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে ও উদাস গলায় বলল, 'আমাদের প্ল্যান্টে একটা অটোমেটিক পোরশান গন্ডগোল করছে। তাই কন্‌সালট্যান্ট ফার্মকে খবর দিতে এদিকে এসেছিলাম। ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

কথা শেষ করে শুভ একটা ভিজিটিং কার্ড বের করল পকেট থেকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'রেখে দাও——।'

চোখ বুলিয়ে দেখলাম, তাতে অফিস আর বাড়ি—দুটো ঠিকানাই আছে।

একবার মনে হল কার্ডটা ওর মুখে ছুড়ে মারি। কিন্তু ল্যাংটো মেয়েটা টেবিলের ওপরে নাচতে-নাচতেই যেন চোখ টিপল আমাকে। ইশারা করল। কার্ডটা আমি হাতব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম।

হঠাৎই শুভদীপ জিগ্যেস করল, 'এরপর তুমি কোথায় যাবে?'

বেয়ারা কফি দিয়ে গিয়েছিল। তাতে চুমুক দিয়ে বললাম, 'কোথায় আবার, বাড়ি! মা একা আছে।'

শুভ ওর হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল। চুমুক দেওয়ার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল দু-এক পেগ ওর কাছে নেহাতই ট্রায়াল বল।

'লিলু, একটা কথা বলব?' শুভ সতর্ক চোখে আমাকে জরিপ করতে-করতে বলল, 'আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে? আমি ভীষণ লোনলি...।'

আমি কফিতে আরামের চুমুক দিয়ে বললাম, 'তাড়া কিসের! বিশ বছর পর আমাদের দেখা হল কি আবার বিশ বছরের ছাড়াছাড়ির জন্যে!'

'লিলু, ইউ আর গ্রেট!' শুভদীপ আবেগে যেন পা পিছলে পড়ল। ও বোধহয় আমার শরীরের তাপ-উত্তাপ টের পাচ্ছিল। হয়তো সেই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক থেকে বিশ বছর আগে ডায়মন্ডহারবারের ব্যাপারটা জীবন্ত করে তুলতে চাইছিল মনে-মনে।

'তোমাকে দেখে মনেই হয় না তোমার বয়েস তিরিশ পেরিয়েছে।' শুভদীপ বোধহয় প্রশংসার মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

'তোমাকে দেখেও ঠিক একইরকম মনে হয়। মনে হয় সেই বিশ বছর আগের শুভ।' ছেনালি করে ওর ছেনালি শোধ দিলাম। কিন্তু শুভ বোধহয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। কারণ মাথা ঝুঁকিয়ে ও ব্লাশ করল।

'লিলু, কবে আবার দেখা হবে?'

আমি ওকে আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলাম। বললাম, 'কাল সন্ধে সাতটায় আমার বাড়ি এসো। আমি তোমার জন্যে ওয়েট করব—।'

শুভদীপ আমার হাত চেপে ধরল। গাঢ় গলায় বলল, 'তোমার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। তুমি কখনও আমাকে ক্ষমা করবে ভাবিনি।'

হঠাৎ দেখি নাচুনী মেয়েটা আমাদের টেবিলের ওপর থেকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। আর তখনই খেয়াল করলাম, রোগা ছোট-ছোট বুক মেয়েটা তখনও গান গাইছে : 'মার দিয়া যায়, কে ছোড় দিয়া যায়। বোল তেরে সাথ কেয়া সলুক কিয়া যায়...।'

সত্যি, নিয়তির জবাব নেই! নইলে শুভদীপের সঙ্গে এতদিন পর এই অলৌকিক সাক্ষাৎ! এখন বুঝতে পারছি, রক্তের ঋণ সহজে শোধ হয় না। রক্তের ফোঁটা সহজে ধুয়ে যায় না।

কফি শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম : 'কাল সাতটায় এসো কিন্তু।'

শুভও উঠে দাঁড়াল : 'ছ-টা বেজে ষাট মিনিটে আমি পৌঁছে যাব।'

বাড়ি ফেরার পথে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, শুভদীপ কী চমৎকারভাবেই না দুটো প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। এক : ওর বিয়ের প্রসঙ্গ। দুই : বিশ বছর আগে ওর-আমার সন্তানের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা ও জানতে চায়নি।

অনেক ভেবে দেখলাম, শুভদীপকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেওয়াটা আমার অপদেবতাদের অভিপ্রায় নয়।

তা হলে কি আঠেরো বছরের একটা মেয়ের সঙ্গে অন্যায়ের জন্যে আটতিরিশ বছরের এক মহিলা প্রতিশোধ নেবে?

কাঁটায়-কাঁটায় সাতটার সময় শুভদীপ এল আমার বাড়িতে। পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল পরে ও একেবারে ফুলবাবুটি সেজে এসেছে।

ও যখন আমাকে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকল তখন ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

আমার হাসি পেয়ে গেল। লড়াইয়ের জন্যে ও দেখছি পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছে!

মা-কে বলে রেখেছিলাম, সাতটার সময় আমার কাছে একজন দামি মক্কেল আসবে। আর কাজের বাচ্চা মেয়েটাকে দোকানে পাঠিয়ে মিষ্টি আনিয়ে রেখেছি। মা শুভদীপের সামনে সেগুলোই সাজিয়ে দিয়ে গেল। ও 'এ কী, এতসবের কী দরকার ছিল' বলে একটু সৌজন্য দেখাল।

খেতে-খেতেই শুভ ঘরটা খুঁটিয়ে দেখছিল। আর আমি তলপেটের সেই

চিনচিনে ব্যথাটা টের পাচ্ছিলাম।

ও মা-কালীর ফটো দেখল, বাবার ফটো দেখল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমিই প্রসঙ্গ তুললাম।

'তোমার জীবনটা ভীষণ জানতে ইছে করছে।' টেবিলে নখের আঁচড় টানতে-টানতে বললাম। তারপর মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে ঃ 'বিয়ে করেছ?'

ও অস্বস্তি পেয়ে নড়েচড়ে বসল। ওর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোনও কথা বলার আগে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল।

'আমার জীবনটা কোনও জীবন নয়, লিলু। শুধু অফিস-ফ্যাক্টরি-বাড়ি, অফিস-ফ্যাক্টরি-বাড়ি, এই করে দিন কাটছে। একটু থেমে ও বলল, 'তবে কাল থেকে জীবনটা অন্যরকম লাগছে। আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ 'সত্যি, মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করে এক।'

বুঝতে পারলাম, বিশ বছরে শুভদীপ আরও চালাক হয়েছে। আরও সুন্দর করে মন-রাখা কথা বলতে শিখেছে। ওর ডায়ালগ শুনে আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল। কী সুন্দরভাবেই না ও আমার প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে গেল!

মা এসে চা দিয়ে গেল। খালি প্লেট-গ্লাসগুলো তুলে নিয়ে গেল যাওয়ার সময়।

আমি নির্লিপ্ত গলায় একই প্রশ্ন করলাম আবার, 'বিয়ে করেছ?'

আজকের লিলু বিশ বছর আগেকার খুকি লীলারানি নয়।

তা সত্ত্বেও ও চুপ করে আছে দেখে ভর্ৎসনা করে বললাম, 'ওঃ, কাম অন, শুভ! ছেলেমানুষি কোরো না। আমি না করলে কী হবে, সবাই বিয়ে করে।'

একটা সিগারেট ধরাল শুভদীপ। চায়ের কাপে কয়েকবার চুমুক দিল। তারপর উদাস চোখে মা-কালীর ফটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুস্মিতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে বারো বছর। এই জানুয়ারিতে টুয়েলফথ অ্যানিভার্সারি। আমার কাছে ব্যাপারটা মৃত্যুবার্ষিকীর মতো।'

আমার হাসি পেয়ে গেল। বেচারা শুভদীপ আজ কত আশা নিয়েই না আমার বাড়িতে এসেছিল! বিশ বছর আগে পড়া আমার শরীরের ভূগোল বই ওর আজও মুখস্থ আছে কি না সেটা যাচাই করতে এসেছিল। অথচ কথাবার্তা কী অদ্ভুতভাবে ওর অপছন্দের পথে এগোচ্ছে।

আমি শুভর অভিনয়ে সায় দিয়ে সহানুভূতির অভিনয় করে বললাম, 'কেন, সুস্মিতা কি তোমার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলে না?'

'ও আমাকে একটুও বোঝার চেষ্টা করে না। জানি, তুমি হয়তো ভাবছ এসব বলে তোমার সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু...' হঠাৎই সিগারেট ফেলে দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল শুভদীপ ঃ 'বিশ্বাস করো, লিলু, আমি ভীষণ একা—।'

শুভ আমার হাত কচলাতে লাগল।

আমার বিরক্ত লাগছিল, কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিলাম না। ওকে আমি একটু-আধটু আশকারা দিতে চাই। আমার পরিকল্পনার পক্ষে সেটা খুব জরুরি।

আমার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম। শুভর অভিনয়ে বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে ওকে আমার খারাপ লাগছিল না। বোকা ভগবানের চেয়ে বুদ্ধিমান শয়তান অনেক ভালো।

ওর হাত ক্রমশ গরম হয়ে উঠছিল। ও আতুর চোখে আমাকে দেখছিল।

দেখার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ আমি আমার আলমারির সবচেয়ে ফিনফিনে এবং দামি শাড়িটা পরেছি। আর আকাশি শাড়ির নীচে লো-কাট গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ। বাইরে শীত থাকলেও ঘরের ভেতরে সেরকম ঠান্ডা নেই। সুতরাং আমার শরীরের যতটুকু যেভাবে দেখা যায় সেভাবেই দেখছিল শুভদীপ।

আমি আচমকা জিগ্যেস করলাম, 'তোমার ছেলেমেয়ে ক'টা?'

শুভ আমার হাতটা চট করে ছেড়ে দিল। আমাকে একপলক অদ্ভুত চোখে দেখে মাথা নাড়ল ঃ 'নেই।'

'তোমার বিয়ে তা হলে সুখের হয়নি?'

'এর পরেও ঠাট্টা করছ, লিলু!'

'সুস্মিতাকে ডির্ভোসের কথা ভেবেছ?'

'ভেবেছি, কিন্তু কোনও উপায় নেই। বাঁধা পড়ে গেছি। ওর বাবা আমাদের বিজনেসে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ঢেলেছে—।'

তাই বলি! আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা না পড়লে শুভকে কে আটকাতে পারে!

'লিলু, তুমি সাহস দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি। তা হলে পুরোনো ভুলটা শোধরানো যায়। বিশ্বাস করো টাকা-পয়সার দিকে আমার আর কোনও টান নেই।'

কিন্তু মেয়েছেলের দিকে আছে। বুঝতে পারছিলাম, শুভর কথাগুলো আগাগোড়া মিথ্যে, পুরোটাই অভিনয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও শুনতে খারাপ লাগছিল না।

তুমি সাহস দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি। চমৎকার!

আমার গুরু নৃপেন সাধুখাঁ যখন আমাকে কামনা করেছেন তখন স্পষ্ট বলেছেন, 'লীলা, আমাদের মিলন প্রয়োজন।'

আমরা দুজনে মাঝরাতে মিলিত হওয়ার পর উত্তরে মুখ করে বসে কর্ণপিশাচিনী গুহ্যমন্ত্র সাধনা করেছি। ফলে মিলনটাকেও আমার খুব স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয়েছে। সেই গুরুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি বট-যক্ষিণী চেটক, রতিরাজ চেটক, ষটকোণ বিশাংক যন্ত্র প্রয়োগ, বার্তালী মন্ত্র ইত্যাদি চর্চা করেছি। একসময় মানুষটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তিনিই আমার দেখা একমাত্র পুরুষ, যার মধ্যে পুরুষকার রয়েছে।

কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর সম্পর্কের পর তিনি একবস্ত্রে হিমালয়ের দিকে রওনা হয়ে যান। মনে পড়ে, সেদিন আমি হারানো ভালোবাসার জন্যে কেঁদেছিলাম।

খেয়াল করিনি শুভ কখন যেন আমার ঊরুতে হাত রেখেছে। শুনতে পেলাম ও বলছে, 'লিলু, আমি বিয়ে করেছি শুনে তোমার খারাপ লাগছে?'

আমি বাবার ফটোর দিকে চোখ রেখে বললাম, 'না, তা নয়।'

তারপর উঠে গিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। মা জানে, তন্ত্র চর্চার জন্যে নির্জনতা দরকার। এখন ঘরে আমি আর শুভদীপ—ঘরের দুটো দরজাই নিশ্চিন্তে বন্ধ।

শুভ চট করে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের শালটা খুলে রেখে দিল চেয়ারে। তারপর দু-পা ফেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'এখন না—পরে। কয়েকটা দরকারি কথা তোমার শোনা দরকার।'

শুভ আমার চোখে কী দেখল কে জানে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ও শালটা গায়ে জড়িয়ে নিল আবার। ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'শুধু-শুধু তা হলে দরজা দিতে গেলে কেন?'

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম। বললাম, 'শরীরের লজ্জা আড়াল করতে দরজা দিইনি। দিয়েছি মনের লজ্জা আড়াল করতে। বোসো—।'

ও বসে পড়ল।

দাঁতে-দাঁত চেপে আমি ঠিক করলাম, এইবার ওকে বলা দরকার। সত্যি কথার প্রয়োজন কখনও ফুরিয়ে যায় না।

'শুভ, কুড়ি বছর মানে কত দিন জানো। সাত হাজার তিনশো দিন।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আজ আমার সর্বনাশের প্রায় বিংশতিতম বার্ষিকী...।'

'লিলু, প্লিজ, আমাকে আর অসম্মান কোরো না। জানি, আমার অন্যায়ের কোনও ক্ষমা নেই...আমি...।'

'কথা না বলে চুপ করে শোনো।'

শুভদীপের মুখে একটা ভয়ের ছায়া পড়ল। ওর পারফিউমের গন্ধ মিশে যাচ্ছিল মলিন ঘরের প্রাচীন গন্ধের সঙ্গে। কেমন এক অদ্ভুত বাতাবরণ কখন যেন তৈরি হয়ে গেছে এই শীতের সন্ধ্যায়।

শুভ ঠিক বুঝতে পারছিল না কী করবে, কোনদিকে তাকাবে, হাত দুটো কোথায় রাখবে।

আমি স্বগতোক্তির মতো বলতে শুরু করলাম, 'সর্বনাশ বলতে তোমার হাতে আমার মেয়েলি ব্যাপার খোওয়া যাওয়া নয়। এমন কি তুমি আমাকে বিয়ে না করে সরে পড়েছ, তাও নয়। ব্যাপারটা অন্য। বিশ বছর আগে আমার বয়েস ছিল সতেরো কি আঠেরো—কিশোরী আর যুবতীর মাঝামাঝি বয়েস একটা। বাড়িতে ঝগড়া করে আজকের মতোই শীতের এক সন্ধ্যায় শ্যামবাজারের টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তোমার বাড়িতে আমি ফোন করেছিলাম। তুমি নানান পাশ কাটানো কথা বলেছিলে আমায়। বলেছিলে, আপসেট হওয়ার কিছু নেই। তারপর তোমার কোনও ক্লাসমেটের সঙ্গে কথা বলার ভান করেছিলে। তুমি যদি...।'

শুভদীপের চোয়াল কিছুটা ঝুলে পড়েছিল। ও বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি হাত তুলে ওকে বাধা দিলাম ঃ 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। নানান, দুশ্চিন্তা মাথায় করে সেদিন আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তুমি জানো না, কীভাবে আমার এক-একটা দিন, এক-একটা রাত কেটেছিল। বেশ কয়েকদিন সন্ধেবেলা আমি কফি-হাউসে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি। তুমি আসোনি। শুভ, আমি কিন্তু তোমার বাড়িতে যেতে পারতাম। পারতাম ইউনিভার্সিটিতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো হইচই হত, অনেক ঝামেলা হত—শেষ পর্যন্ত সমাধানও হয়তো একটা হত। কিন্তু আমার আত্মসম্মানে বেধেছিল। ফাঁপা আত্মমর্যাদা নিয়ে আমি শুধু অপেক্ষাই করে গেলাম মূর্খের মতো।'

শুভ তখনও মুখ সামান্য হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছিলাম।

'তুমি তো জানো, অ্যাবরশান তখন বেআইনি ছিল। ফলে অনভিজ্ঞ অপদার্থ একটা মেয়ে অসহায়ভাবে শূন্যে হাতড়াতে লাগল। লুকিয়ে-চুরিয়ে যে কিছু করব, তাও পেরে উঠলাম না। ভাবতে পারো, তখন আমি কী পাগলামিটাই না করেছি! যা দিয়ে পেরেছি চেষ্টা করেছি, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছি। পেন, পেনসিল, স্কেল, অ্যালুমিনিয়ামের হ্যাঙার—ওঃ!'

স্মৃতিকণা নামের নির্লজ্জ মেয়েটা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের

ওপরে। ওর বিশ বছরের যৌবন উথালপাথাল হয়ে মাতালের মতো ধেইধেই করে নাচছে।

'লিলু, প্লিজ, আমি আর শুনতে পারছি না—' শুভদীপ ভাঙা গলায় অনুনয় করে বলল। গলা দিয়ে উঠে আসা কাশির দমক কোনওরকমে সামলে নিল।

আমি কিন্তু থামলাম না। একে-একে সব ওকে বললাম। মায়ের কথা, বাবার কথা। বাবা যে পাশের ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন সে-কথাও বললাম।

'...বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ঠিক করলাম, বাচ্চাটাকে নষ্ট করব না। মায়ের সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গেলাম বর্ধমানের এক দূর সম্পর্কের পিসির বাড়িতে। দোকান থেকে সিঁদুর কিনে মাথায় লাগিয়ে মিথ্যে একটা বিয়ের গল্প ফেঁদে সেখানে থেকে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, পিসির বাড়িতে আমি রাতদিনের ঝিয়ের কাজ করতাম। পিসির বড় ছেলে আমাকে নষ্ট চোখে দেখত। কী অপমানে, কী হেনস্থার মধ্যে যে ক'টা মাস সেখানে কাটিয়েছি তা শুধু আমিই জানি। বিশ বছরে সেই দিনগুলোর কথা আমি একটুও ভুলিনি। একটুও না। অথচ শেষ পর্যন্ত কী হল জানো?'

শুভ কেউটে সাপের মুখে বশ হওয়া কোলা ব্যাঙের মতো নিষ্পলকে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর ঠোঁট সামান্য কাঁপছে। আমার গল্প শুনতে-শুনতে আমার ভেতরের গল্পটাও পড়ে ফেলতে চাইছে যেন।

আমার চোখ জ্বালা করছিল। গলায় কী একটা যেন আটকে গেছে। অনেক চেষ্টা করে আবার কথা বললাম আমি, 'বাচ্চাটা মরে জন্মাল। জন্মের পর মৃত্যু নয়—মৃত্যুর পর জন্ম। আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম আমি। আর সেই সঙ্গে মা হওয়ার সাধে চিরদিনের মতো ইতি পড়ল, নটে গাছটি মুড়োল।'

শুভদীপ দু-হাতে মুখ ঢাকল। একটা যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে। তারপর কোনওরকমে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো, লিলু। এতসব আমি জানতাম না...আমি...।'

'সত্যিই তো, জানবে কী করে! তুমি তো "আপসেট হওয়ার কিছু নেই" বলেই পালিয়েছিলে—।'

শুভ এবার কাঁদতে লাগল। ওর পাঞ্জাবি পরা পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। তারই মধ্যে ও জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, 'আমাকে শাস্তি দাও। আমার বাবা কী ভয়ংকর মানুষ ছিলেন তুমি জানো না। তা ছাড়া আমি তখনও পড়াশোনা নিয়ে...।'

ওর কান্নায় আমার মন নরম হতে দিলাম না। বিশ বছরে আমি অনেক

কেঁদেছি। কেউ সে-কান্না শুনতে পায়নি।

'শুভ, সেই টেলিফোন করা রাতের ব্যাপারটা নিয়ে পরে আমি অনেক ভেবেছি। সেদিন তোমার কাছ থেকে আমি বোধহয় শুধু ভরসা চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও। পরে কী হত সেটা পরে ভাবা যেত।'

আমার তলপেটে কেউ যেন বরফের ছুরি চালাল। গোপন যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেল আমার।

'লিলু, আমি সেদিন ভুল করেছিলাম। সেদিন আমার খুব অন্যায় হয়েছিল। তুমি আমাকে শোধরানোর সুযোগ দাও...একটিবার...।'

আমি হাসলাম। আমার অভিযোগের উত্তরে শুভদীপ প্রতিবাদ করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। আর শোধরানো! তার মানে বিয়ে? শুভদীপকে? কক্ষনো না। সুস্মিতার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। না, একটি বিশেষ অঙ্গ যে-জাতের একমাত্র মূলধন, সে-জাতের কোনও প্রাণীকে বিয়ে করার সাধ আমার নেই। তবে শরীরের চাহিদার ব্যাপারটা আলাদা।

অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। শুভদীপ রুমাল বের করে চোখ, গাল, কপাল মুছছিল বারবার। আর আমার চোখ জ্বালা করছিল, তলপেট জ্বালা করছিল। স্মৃতিকণাকে আর টেবিলের ওপরে দেখতে পেলাম না।

আমি মনে-মনে ভাবছিলাম, সেই ঘটনার পর আমার মতো বিপন্ন অবস্থায় শুভ যদি কোনওদিন আমাকে ফোন করত! আমি হয়তো ওর মতোই এড়িয়ে যাওয়া কথাবার্তা বলতাম, তারপর ওকে 'বর্ধমানের পিসির' ভরসায় ছেড়ে দিতাম।

হঠাৎই খেয়াল করে দেখি শুভ কখন যেন আমার কাছে সরে এসে গায়ে-টায়ে হাত দিচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম, অপরাধবোধের খোলস ছেড়ে ধূর্ত নারীখাদকটা আবার বেরিয়ে এসেছে বাইরে। শীতের রাত, ঘরের দুটো দরজাই বন্ধ—এ-সুযোগ ছাড়ার কোনও মানে হয় না।

আমি মনে-মনে হাসলাম। 'বর্ধমানের পিসির' চেয়েও বড় শাস্তি ওকে আমি দিতে চাই। কিন্তু ওর তো সংসার আছে! একটা বউ আছে। নিশ্চয়ই সে আমার চেয়ে কমবয়েসি কোনও ফুটফুটে মেয়ে।

শুভ তখন আমার গা ঘেঁষে বসে পড়েছে। ওর অভিসারী হাতের গন্তব্যের কোনও বাছবিচার আর নেই। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ও বিড়বিড় করে বলছিল, 'সুস্মিতাকে আমি ছেড়ে দেব। নকল বিয়েতে আমার আর কোনও সাধ নেই। আমার লিলুকে আমি খুঁজে পেয়ে গেছি। তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা, তুমিই আমার শেষ ভালোবাসা। লিলু, লিলু...।'

লিলু, এ তুই কী করলি! লিলু, এ তুই কী করলি!

শুভদীপকে আমি আরও স্পষ্ট করে চিনতে পারছিলাম। বিশ বছরে ও বিশেষ শোধরায়নি।

ও আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল জোর করে। আমাকে জাপটে ধরে ওর একমাত্র মূলধন ঘষতে লাগল আমার শরীরে। আমার মুখে, গালে, ঠোঁটে, যেখানে সেখানে চুমু খেতে লাগল পাগলের মতো। আমার ডায়মন্ডহারবারের দিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেইসঙ্গে অসহায় মেয়েটার টেলিফোনের কথাও।

যখন ও প্রায় চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছে, তখন ওকে থামালাম। ও স্টিম ইঞ্জিনের মতো ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিতে লাগল।

আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আজ নয়—পরে। ফোনে বলে দেব।'

শুভদীপ আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত মানুষের চোখে আমাকে দেখল। হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল, 'কেন?'

আমি বললাম, 'এটা আমার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলার ঘর। এটা তুকতাক-মারণ-উচাটন-বশীকরণের ঘর। এ-ঘরে আর সবকিছু আছে—শুধু ভালোবাসা নেই। আজ তুমি যাও—।'

শুভ যথেষ্ট আহত হল। কিন্তু নিহত হলেও আমার কিছু করার ছিল না। নিজেকে তৈরি না করে ওর সঙ্গে কিছু করতে চাই না আমি।

'লিলু, কাল আসব?' ও আকুল গলায় জানতে চাইল।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, 'না, কাল নয়, পরশু। সময়টা পরে আমি বলে দেব।'

'কাল নয় কেন?' বাচ্চাদের মতো বায়না করল শুভ। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ওর প্রশ্নের উত্তরে হাসলাম আমি। বললাম, 'অপেক্ষার আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না বলে—।'

বিশ বছর ধরে আমিও হয়তো অপেক্ষা করেছি। অপেক্ষার আনন্দ থেকে আমিও বঞ্চিত হতে চাই না।

অপ্রসন্ন মন নিয়ে শুভদীপ চলে গেল। আমি ওকে 'টা-টা' করে বিদায় জানালাম।



শুভদীপ চলে যাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত নানান বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। দেওয়ালের একেবারে নীচের তাক থেকে একটা প্রাচীন পুথির কপি

বের করলাম। নেপালের দরবার পাঠাগারের একটি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য পুথি 'গুহ্যসূত্র'—এটা তারই কপি।

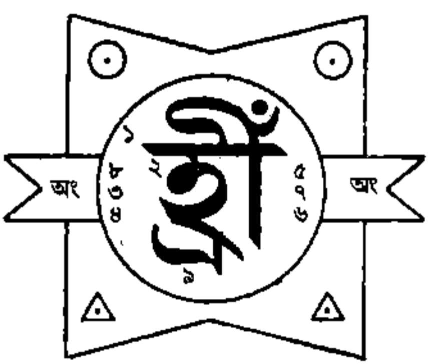
পুথির পাতা উলটে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করলাম, কাগজে নোট নিলাম। তারপর বের করে নিলাম আরও দুটি বই ঃ 'গর্ভপ্রবেশ' ও 'সৃষ্টিশাস্ত্র'। সেগুলোর কয়েকটা বিশেষ পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে পড়ার পর পেয়ে গেলাম আমার আকাঙ্ক্ষিত সমাধান ঃ বন্ধ্যা নারীর নিশ্চিত গর্ভসঞ্চারের হদিস। একবার এক মক্কেলের জন্যে এই টোটকা কাজে লাগিয়েছিলাম। তাতে ফলও পাওয়া গিয়েছিল।

এবারে আমার নিজের পালা।

একটা সাদা কাগজে যাবতীয় তথ্য-আচার লিখে নিতে লাগলাম ঃ

**মন্ত্র ঃ 'ওঁ হ্‌ং গং নং ষং ফং সং খং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ'**

*দু-চামচ মধু, এক চামচ পোস্ত, পোয়াটাক দুধ, তিল পরিমাণ আফিম ও ধুতুরার দুটি বিচি গুঁড়ো করে ভালো করে মিশিয়ে একটি শুচি কাচপাত্রে রাখবে। দ্রব্যটিকে শুদ্ধ করে একটি কাকের পালক ও একটি প্যাঁচার পালক দিয়ে তিনবার করে স্পর্শ করবে। তারপর দ্রব্যটিকে উপরোক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করবে। অভিমন্ত্রিত করার সময় নীচের যন্ত্রটি অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে চোখ বুজে বাঁ-হাতের অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করে রাখতে হবে। এই আচারের পর গর্ভকামী যুবতী দ্রব্যটি সেবন করবে এবং বীর্যবান পুরুষের সঙ্গে পূর্ণমিলনে লিপ্ত হবে। মিলনকালে মন্ত্রটি নিবিষ্টমনে জপ করবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।*




গর্ভসঞ্চার যন্ত্র

বইগুলোতে এর পরেও লেখা ছিল পুত্রসন্তান লাভের জন্য কী-কী নিয়ম মানতে হবে, আর কন্যাসন্তানের জন্যেই বা কী নিয়ম। সেসব আমার কোনও দরকার নেই। কারণ, আমি চাই কিছু একটা হোক—তা সে ছেলে, মেয়ে বা হিজড়ে যা-ই হোক, আমার কাজ চলে যাবে।

শুভদীপ এরপর যেদিন আসবে, সেদিন আমাকে তৈরি থাকতে হবে আগে থেকেই। মা-কে আর কাজের মেয়েটাকে দেশবন্ধু পার্কে ভাগবত পাঠ শুনতে পাঠিয়ে দেব, যাতে বাড়ি খালি থাকে। তারপর আমি, শুভ, আর অশুভ—শুধু এই তিন শক্তির খেলা।

•

পরদিন সকালে শুভদীপ ফোন করল।

'লিলু, কেমন আছ?'

'ভালো। তুমি?'

'তোমার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছি—।'

'আমিও বিশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি।' হেসে ওকে বললাম।

'আমিও। ডায়মন্ডহারবারের সেই দিনটার অ্যাকশন রিপ্লের জন্যে হন্যে হয়ে ওয়েট করছি।' অন্যরকম ইঙ্গিত দিয়ে হাসল শুভ।

আমি হেসে বললাম, 'অপেক্ষার আনন্দ টের পাচ্ছ?'

'আনন্দ নয়, লিলু, যন্ত্রণা। আজ রাতে তোমার বাড়ি যাচ্ছি।' জেদি গলায় বলল ও।

'না, আজ নয়।' ওর আশায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিলাম আমি ঃ 'পরে বলব।' এই কথা বলে টেলিফোন রেখে দিলাম।

সারা দিনে আমাকে মোট তিনবার ফোন করল ও। কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম, ওর মাথা আর কাজ করছে না, শুধু শরীর কাজ করতে চাইছে।

আমি হাসলাম মনে-মনে। আপনমনেই বললাম, 'ধৈর্য ধরো, বৎস, ধৈর্য ধরো।'

তার পরদিনও শুভদীপের ফোন এল। ফোন করেই ওর প্রথম প্রশ্ন, 'কবে, লিলু?'

আমি হেসে বললাম, 'আজ রাতে।'

ও আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। গদগদ গলায় বলল, 'সোনামণি, আজ রাতে আর ছলনা কোরো না।'

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, 'তুমি ঠিক রাত আটটায় এসো।' হেসে আরও

বললাম, 'বাড়ি ফিরতে তোমার রাত হতে পারে—।'

ও উৎসাহী গলায় বলল, 'নো প্রবলেম। আমার সঙ্গে গাড়ি থাকবে।'

সেদিন সন্ধে থেকেই তৈরি হওয়ার কাজ শুরু করলাম। বেশ টের পাচ্ছিলাম, ভেতরে-ভেতরে একটা উত্তেজনা ধীরে-ধীরে জানান দিচ্ছে।

ঠিক আটটার সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

সদর দরজা খুলতেই শুভদীপকে দেখতে পেলাম। আজও যথারীতি পাজামা, পাঞ্জাবি আর শাল। নাকে এল পারফিউম আর হুইস্কির গন্ধ।

'লিলু, তোমার টানের কাছে তড়িৎ চুম্বকও হার মেনে যাবে।' মজা করে বলল শুভদীপ।

বুঝতে পারছি, ওর দণ্ড চুম্বকের অবস্থা খুব খারাপ। তাই বললাম, 'এসো, ভেতরে এসো—।'

'ভেতরে ঢোকার জন্যে আমি ছটফট করছি—' চোখ মটকে বলল ও। তারপর ঃ 'আমার কথাটার কিন্তু ডাবল মিনিং...।'

আমি হাসলাম। ওর জন্যে যে কী অপেক্ষা করে আছে তা যদি ও জানত! জানলে নির্ঘাত ও দৌড়ে পালাত এ-বাড়ির দরজা থেকে।

বাইরে ফুটপাথের লাইটপোস্টের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো কুকুর আকাশের দিকে মুখ তুলে মিহি সুরে কেঁদে উঠল। বোধহয় বেচারার শীত করছে।

আমি আবার ওকে ডাকলাম, 'এসো—।'

আমাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় শুভর বাঁ-হাত যেন অসাবধানে ঘষে গেল আমার বুকে। আমার ঘাড়ের কাছে মুখ নামিয়ে ও জড়ানো গলায় বলল, 'সুইট উইচ, আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ, লিলু।'

মনে পড়ে গেল, বিশ বছর আগে এক নির্বোধ অষ্টাদশী এই চারটে শব্দ শোনার জন্যে সমরখন্দ্ বোখারা দিয়ে দিতে পারত। দিতে পারত কেন, দিয়ে দিয়েছিল। আজ এই চারটে শব্দ চারটে লম্বা কালো শুঁয়োপোকার মতো আমার কানে কিলবিল করতে লাগল।

আমি সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম।

শুভ আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। বেপরোয়া আদর করতে লাগল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

আমি কোনওরকমে ওকে ভেতরে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলাম। নীচু গলায় বললাম, 'বাড়িতে আর কেউ নেই।'

শুভ এক ঝটকায় ওর শালটা ছুড়ে দিল একটা চেয়ারের ওপরে। পাঞ্জাবিটাও

খুলে ফেলল মসৃণভাবে। ওর পরনে শুধু স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। শীতে গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ওর পাজামার দিকে লক্ষ করে বুঝলাম জ্বর বাড়ছে, থার্মোমিটারের পারা উঠছে।

বললাম, 'তুমি একটুও পালটাওনি, শুভ...।'

'আমি তোমার ক্রীতদাস, লিলু। তোমার দেখা পেয়ে অনেকগুলো পুরোনো ফুল ফুটে গেছে আমার পোড়ো বাগানে। তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা, তুমিই আমার শেষ ভালোবাসা। সুস্মিতাকে কাটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আমি খুব সিরিয়াসলি ভাবছি।'

আমি তখন তৈরি করা 'দ্রব্যটির' কথা ভাবছিলাম। জিনিসটা বিছানার মাথার কাছে একটা টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। আমি সেটার দিকে হাত বাড়াতেই শুভ আমাকে জড়িয়ে ধরল আবার। বলল, 'আর্লি টু বেড...।'

আমি ওর বাঁধন ছাড়াতে-ছাড়াতে বললাম, 'এক মিনিট, প্লিজ, একটা ছোট কাজ বাকি আছে।'

একটা কাচের বাটিতে জিনিসটা রেখেছিলাম আমি। ঢাকা তুলে কাচের বাটিটা হাতে নিলাম। তারপর চোখ বুজে মন্ত্রপূত ডেলাটা মুখে পুরে দিলাম। কোনওরকমে চিবিয়ে সেটা গোগ্রাসে গিলতে চেষ্টা করলাম।

শুভ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ওটা কী খাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'এটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ। এটা খেলে বাচ্চা হওয়ার ভয় থাকে না।'

'লিলু, তুমি সত্যিই লাজবাব!' উৎফুল্ল হয়ে বলল শুভ।

আমি বাটিটা রেখে দিয়ে টেবিল থেকে জলের জাগ তুলে নিলাম। ঢকঢক করে জল খেয়ে কোনওরকমে গিলে ফেললাম জিনিসটা। মুখের বিস্বাদ ভাবটা কিছুতেই পুরোপুরি গেল না।

শুভ আর দেরি করতে পারল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো আদর করতে শুরু করল। আমার বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে সেই চারটে শুঁয়োপোকা ছেড়ে দিল বারবার।

আমার তলপেটে চিনচিনে ব্যথাটা হঠাৎই শুরু হয়ে গেল। গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। চোখের সামনে হাইস্পিড চলচ্চিত্র ঝিলিক মেরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আর একটা সতেরো-আঠেরোর মেয়ে উবু হয়ে বসে ওর শরীরের ভেতরকার শরীর নষ্ট করার চেষ্টা করছিল।

আমার শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পেশাদার হাতে খুলে ফেলেছে শুভ। আমার

নগ্ন শরীর দেখে ওর লালসাও যেন হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াল। ও বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আটতিরিশে এই ফিগার! লিলু, তুমি সত্যি, না স্বপ্ন?'

ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ থাকলেও আমার কেমন লজ্জা করছিল। তাই অনেক কসরত করে বেডসুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। শুভদীপের তীব্র শক্তি আমাকে কাত করে ফেলে দিল বিছানায়। ও নিজের বাকি পোশাক খুলে এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিল।

এবং আমরা শুরু করলাম।

শুভ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। আমি ওকে চুমু খেলাম। ও পাগলের মতো আমাকে চটকাতে লাগল। আর বারবার বলতে লাগল, 'লিলু...লিলু...আমার লিলু...।'

বয়েস শুভদীপের আগ্রহ আর ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্রও ভোঁতা করতে পারেনি। ওর তাড়াহুড়োয় আমার ব্যথা লাগছিল, কিন্তু সব সহ্য করলাম। ও ছন্দে নড়তে লাগল! আর আমি নিবিষ্ট মনে গুপ্ত মন্ত্র জপ করে চললাম।

বিড়বিড় করে আমার মন্ত্র আওড়ানো শুনে শুভদীপ একটু ভুল বুঝল। ও ভাবল, আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের কেরামতির অহঙ্কারে আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। খাটে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হতে লাগল।

একটু পরেই আমাকে আঁচড়েকামড়ে শীৎকার তুলে শুভদীপ খেলা শেষ করল। আমি কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে ওর চরম তৃপ্তির ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম ক্লান্ত শরীরে। শুভ কয়েকটা ভালোবাসার চুমু এঁকে দিল এখানে সেখানে। তারপর উঠে বাথরুমে গেলাম। একটু পরে ফিরে এসে শাড়ি-জামাকাপড় পরতে শুরু করলাম।

শুভ বিছানায় বসে সিগারেট টানছিল। আমাকে দেখে আবেগ মাখানো গলায় বলল, 'লিলু, নতুন করে আবার শুরু করা যায় না?'

আমি বিশ বছরের পুরোনো বমির গন্ধ পেলাম। একমনে শাড়ির কুচি ঠিক করতে লাগলাম। ওর প্রশ্নের কোনও জবাব দিলাম না।

'তোমাকে তো কতবার করে বলছি কুড়ি বছর আগে আমি...আমি ভুল করেছিলাম...অন্যায় করেছিলাম। কিছুতেই কি আমাকে ক্ষমা করা যায় না, লিলু?'

আমি শুধু হাসলাম। সেই মুহূর্তে বিশ বছরের পুরোনো রক্তের গন্ধ পেলাম। মাংস চিরে যাওয়ার যন্ত্রণা টের পেলাম।

তৈরি হয়ে নিয়ে ঘরের টিউবলাইটটা জ্বেলে দিলাম।

শুভদীপের মুখ কেমন বিবর্ণ লাগছিল। ও বিছানা ছেড়ে উঠে চেয়ারের

কাছে গেল। সিগারেটে শেষবারের মতো লম্বা টান দিয়ে ওটা ফেলার জায়গা খুঁজল। তারপর সেরকম কিছু খুঁজে না পেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। মেঝেতে ঘষে ওটা নেভাল। তারপর চেয়ার থেকে ওর শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কাল কখন দেখা হচ্ছে?'

আমি কোনও জবাব না দিয়ে ওকে তাড়া দিলাম, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। মা এখুনি চলে আসবে।'

'তোমার মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে না?'

'না। কারণ মা কে বলার মতো কোনও যোগ্য পরিচয় তোমার নেই। নাও, জলদি তৈরি হয়ে নাও।'

ও পোশাক পরে নিতে শুরু করল। তারপর আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল ঃ 'লিলু, তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি মরে যাব।'

আমি হেসে বললাম, 'তাই? তা হলে ধরে নাও আর দেখা হবে না।'

শুভদীপ কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর রুক্ষভাবে বলল, 'তা হলে আমাকে এভাবে ডাকলে কেন? শুলে কেন? নাকি তোমাকে শোওয়ার জন্য টাকা দিতে হবে?'

আমার হাসি পেল। পুরোনো জানোয়ারটা বিশ বছরের পথ ডিঙিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসছে।

ওর থুতনিতে হাত দিয়ে বাচ্চা ছেলেকে আদর করার মতো করে নেড়ে দিলাম! বললাম, 'শুভ, লাখ টাকার প্রশ্ন করেছ তুমি। সত্যি, কেন যে তোমাকে আদর করে ডাকলাম, কেন যে শুলাম, তা যদি তুমি জানতে!'

আর কথা না বাড়িয়ে ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। যাওয়ার আগে ও নাছোড়বান্দার মতো বলল, 'কাল তোমাকে ফোন করব—।'

আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজার কাছের আঁধারি জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলাম। আমি যা করছি সেটা ঠিক, না ভুল? ন্যায়, না অন্যায়?

বিশ বছর আগে ন্যায়-অন্যায়ের হিসেব কে করেছিল?

আমার গা ঘিনঘিন করছিল। তাই গ্যাস-স্টোভে গরম জল চাপিয়ে দিলাম। এক্ষুনি স্নান করতে হবে।



সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না।

পাগলের মতো কাঁদলাম। খোলা জানলা দিয়ে শীতের রাত দেখলাম,

আকাশের তারা দেখলাম। এলোমেলো গান গাইলাম। শুভকে যা-তা গালিগালাজ করলাম। বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক কষ্ট হতে লাগল। বারবার ভাবতে লাগলাম, যা করতে চলেছি তা উচিত হবে কি না।

ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহটা দুলতে লাগল। মায়ের বুকফাটা হাহাকার শুনতে পেলাম। আর শূন্য বয়েসে চলে যাওয়া খুদে দস্যিটা চিৎকার করে আমাকে চৌচির করে দিতে লাগল।

আমার চোখের জল জমাট বেঁধে বরফের কুচি হয়ে গেল। না, শুভদীপকে ক্ষমা করা যায় না।

এইভাবে দোলাচলের মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেল। তারপর আমি অনেকটা শান্ত-স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। শুভদীপ পরপর চারদিন আমাকে ফোন করেছিল, কিন্তু আমি ঠান্ডা গলায় ওকে একই কথা বলেছি। আর মনে করিয়ে দিয়েছি সুস্মিতার কথা। ও তাতে খেপে উঠেছে পাগলের মতো। তারপর থেকে আমাকে ফোন করা বন্ধ করে দিয়েছে।

কিছুদিন পরেই বুঝলাম, 'গুহ্যসূত্র', 'গর্ভপ্রবেশ' ও 'সৃষ্টিশাস্ত্র'-এর নির্দেশ ব্যর্থ হয়নি।

আরও দু-মাস যেতে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম।

আমার হিসেব অনুযায়ী চার মাস সতেরো দিন পর উপযুক্ত সময় এল। শরীরে সব ক'টা প্রয়োজনীয় লক্ষণই নজরে পড়ল আমার। তখনই কাজ শুরু করলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় একটা গোটা রাত ছাগলের মতো ছটফট করলাম। ভীষণ জ্বর এল। রক্তপাতও হল। সকালবেলা রক্তমাখা কাপড় থেকে রক্তাক্ত সাতটা সুতো ছিঁড়ে নিলাম। সেগুলোকে পরিষ্কার একটা শিশিতে ছিপি এঁটে রেখে দিলাম। তারপর ব্যথা কমানোর দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

আমার মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্তন মায়ের চোখে ধরা পড়েছিল। মায়ের চোখে নীরব প্রশ্ন থাকলেও মুখে কোনও নতুন কথা ছিল না। বিড়বিড় করে শুধু বলতে লাগল, 'তুই সাবধানে থাকিস। নিজের যত্ন নিস।'

ন'-দশ দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। শরীরে, মনে, জোর ফিরে পেলাম। তখন কাশী মিত্তির ঘাটের শ্মশানে গিয়ে দু-চিমটে ছাই আর খানিকটা মাটি নিয়ে এলাম।

একদিন রাতে আমি পুতুলটা তৈরি করতে বসলাম।

মাটি আর ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম শিরীষের আঠা আর খানিকটা সিঁদুর। তারপর বেশ মনোযোগ দিয়ে পুতুলটা তৈরি করলাম। হাত-পা-মাথা...সব।

চোখের জায়গায় দুটো লাল পুঁতি বসিয়ে দিলাম।

পুতুলটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর রাতে স্নান সেরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উত্তরদিকে মুখ করে পদ্মাসনে বসলাম। পুতুলটা দু-হাতে ধরে একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হে অন্ধকারের রাজা, প্রেতসিদ্ধ সম্রাট, শক্তি দাও। এই জড় পদার্থে তোমার তীব্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করো, প্রাণ সঞ্চার করো। শত্রুকে নাশ করো, অনুগতকে রক্ষা করো।

সাদা সরষে, কালো মরিচ আর ঘি দিয়ে একটা মণ্ড তৈরি করে রেখেছিলাম। সেটাতে আগুন দিয়ে হোম শুরু করলাম। তারপর পাশে রাখা একটা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে শত্রুনাশের মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। পুতুলটা তখন আমার অন্য হাতে স্থির।

*'সর্ববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।*
*এবমেব ত্বয়া কার্য্যসম্পদ বৈরী বিনাশনম্॥'*

জপ শেষ হলে বাঁ-হাতের অনামিকার নখ দিয়ে পুতুলটার তলপেট লম্বালম্বিভাবে চিরে দিলাম। উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম ছিপি আঁটা শিশিটা। একটা কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তমাখা সুতোগুলো বের করে নিলাম। ওগুলো গুঁজে দিলাম পুতুলটার তলপেটে। তারপর ভালো করে টিপে-টিপে চেরা জায়গাটা বন্ধ করে মসৃণ করে দিলাম। পুতুলটার তলপেটে আর কোনও ক্ষতচিহ্ন রইল না।

পরপর দু-দিন আমি উপোস করলাম। তৃতীয় দিনে আমার সরঞ্জামের তাক থেকে শালিঞ্চ গাছের শুকনো শেকড় বের করে নিলাম। সেটা গুঁড়ো করে আমার নগ্ন দেহে ছড়িয়ে দিলাম। সপ্তমুখী রুদ্রাক্ষের একটা ছোট্ট টুকরো জল দিয়ে গিলে ফেললাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। কারণ আজই সেই পবিত্র দিন। আজই শেষ হবে আমার কাজ।

সারাটা দিনে কতবার যে ঘড়ি দেখেছি মনে নেই! শেষে যখন রাত পৌনে বারোটা হল তখন ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

আজ শনিবার। পূর্ণিমার রাত। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ল অন্ধকার ঘরে, আমার নগ্ন দেহে, আর পুতুলটার ওপরে।

একটু পরে উঠে বসে একটা ছোট পিঁড়ি নিলাম। পুতুলটাকে তার ওপরে বসিয়ে তার তিন দিকে তিনটে মোমবাতি জ্বেলে দিলাম। তারপর একটা ছোট শিশি খুলে কয়েক ফোঁটা সুগন্ধি তেল ছিটিয়ে দিলাম পুতুলটার গায়ে। আর একটা ধূপকাঠি জ্বেলে দিলাম।

কপালে খানিকটা সিঁদুর আর কাজল মেখে আমি পুতুলটার সামনে ধ্যানস্থ

হয়ে বসলাম। তারপর প্রার্থনা শুরু করলাম।

একটু পরেই আমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে কেউ যেন কাটাছেঁড়া করছে আমার ভেতরটা। নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে বারবার।

হে নিরাকার কৃষ্ণশক্তি! এসো, আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো। রক্তের ঋণ শোধ হোক রক্ত দিয়ে। হে দেবী! তোমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো। তোমার অনুগতকে আশীর্বাদ করো। শত্রুকে নাশ করো। হে নিরাকার অন্ধকারের রাজা! হে অন্ধকার তন্ত্রলোকের রানি! আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো।

যন্ত্রণায় আমার তলপেট ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করলাম। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। কিন্তু আমার আকুল প্রার্থনা চলতেই লাগল। সেই সঙ্গে বিধি অনুযায়ী মন্ত্র উচ্চারণ।

সেই যন্ত্রণার মধ্যেই যেন দেখলাম, পুতুলটার হাত-পা নড়ে উঠল, কিলবিল করে উঠল।

হঠাৎই আমার শরীর এক বিচিত্র ক্লান্তি ও অবসাদে ছেয়ে গেল। ভীষণ ঘুম পেল আমার। আমি বিছানায় আবার শুয়ে পড়লাম। চাঁদের আলোয় আমার নগ্ন শরীর মাখামাখি হয়ে গেল।

তারপর ঘুমে আমার চোখ ঢুলে এল। সেই অবস্থাতেই দেখলাম, পুতুলটা যেন জীবন্ত হয়ে তীব্র লাল চোখে আমাকে দেখছে।

দিনের পর দিন যেতে লাগল। তলপেট ফুলে পুতুলটার রোগা-ভোগা চেহারা ক্রমে বেঢপ হয়ে উঠতে লাগল। একইসঙ্গে আমিও উলটোপালটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

স্বপ্নগুলো ধীরে-ধীরে দুঃস্বপ্নের চেহারা নিল। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে মন হাতড়ে শত চেষ্টাতেও সেগুলোকে আর খুঁজে পেলাম না। কোথা থেকে তিলতিল করে মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল। অবাক হলেও সন্দেহটা মন থেকে ঠেলে সরাতে পারলাম না। ওটা ক্রমে গাঢ় হতে লাগল।

আমি কাজটা ঠিক করছি তো? সত্যিই কি রক্ত দিয়েই শোধ করতে হয় রক্তের ঋণ?

মনে পড়ছে, শুভদীপ কেঁদেছিল। আমার দু-হাত চেপে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল বারবার। ভুল শোধরাতে চেয়েছিল অনুনয়ের সুরে। সত্যিই কি বিশ বছর আগের

ব্যাপারটা ওর আকস্মিক ভুল? কে জানে, বিশ বছরে ও হয়তো সত্যিই বদলে গেছে। মানুষ তো বদলায়। মানুষই তো বদলায়! আমিই হয়তো জেদের বশে একটা ভুল করতে চলেছি। নিষ্ঠুর ভুল। যে-ভুল একবার হয়ে গেলে আর শোধরানো যায় না।

সুতরাং চরম ভুল করে বসার আগে আমাকে একবার খোঁজ করে দেখতেই হবে।

কার্ডে লেখা শুভদীপের ঠিকানা নিয়ে একদিন দুপুরে সোজা চলে গেলাম ওর যোধপুর পার্কের বাড়িতে।

বাড়িটা খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না।

ওর বাড়ি দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। বড়লোকের বাড়ি কাকে বলে!

তিনতলা বাড়ি, সঙ্গে ছোট একটুকরো বাগান। বাড়ির দেওয়ালের নানা জায়গায় মার্বেল পাথরের ডিজাইন। ছাদে টিভি অ্যানটেনা আর হাওয়া-মোরগ।

আমার চোখে সানগ্লাস। মাথায় রঙিন ছাতা। পিচের রাস্তা দুপুরের রোদে জ্বলছে।

শুভ নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই। অফিসে বা ফ্যাক্টরিতে গেছে। এই সুযোগে সুস্মিতার সঙ্গে একটু আলাপ করে নেওয়া যেতে পারে। তা হলেই বুঝতে পারব, শুভদীপ সত্যিই বদলে গেছে কি না।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে লাল-সবুজ শাড়ি পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। বছর পঁচিশ বয়েস। স্বাস্থ্য মন্দ নয়। রঙ কালোর দিকেই, তবে মুখ-চোখ ভালো।

মেয়েটির কানে রুপোর দুল, আর নাকে রুপোর নাকছাবি। শাড়ির আঁচল ডানকাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে নেমেছে। দেখে কাজের লোক বলেই মনে হল।

ইশারা করে ডাকতেই মেয়েটি কাছে এল।

ওকে শুভদীপের কথা জিগ্যেস করলাম।

মেয়েটি হিন্দি মেশানো বাংলায় বলল যে, সাহেব বাড়ি নেই। ফ্যাক্টরিতে গেছে।

তখন আমি মেমসাহেবের কথা জিগ্যেস করলাম। বললাম, 'আমি সুস্মিতাজীর দোস্ত। একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। শ্যামবাজারে থাকি—।'

মেয়েটির চোখে আচমকা জল এসে গেল। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিয়ে বলল, 'আপনি জানেন না, বড় মেমসাব খুদকুশি করেছে! এই তো করিব এক মাহিনা হল।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। খুদকুশি! আত্মহত্যা!

ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে মেয়েটির হাতে দিলাম।

তারপর জিগ্যেস করলাম, 'কেন, সুইসাইড করল কেন? এরকম ভালো স্বামী, যার এত পয়সা, শান-শওকত, সে কেন হঠাৎ সুইসাইড করতে যাবে!'

তখন কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি যা বলল তার সারাংশ এই ঃ

সুস্মিতাজীর পতি মোটেই ভালো লোক নয়। বাড়িতে বসে সবসময় মদ খায়। উলটোপালটা আওরত ইয়ার-দোস্ত নিয়ে আসে। রোজ বিবির সঙ্গে হুজ্জুতি করত। অথচ বড় মেমসাহেবের পয়সাতেই তার এত বোলবোলা, দুটো বাড়ি, দুটো গাড়ি, ফ্যাক্টরি, অফিস—কী নেই! সুস্মিতাজীর মতো মালকিন হয় না—এত ভালো ছিল। লেকিন সবই তকদীর! অনেক সহ্য করেছিল, শেষ পর্যন্ত আর পারল না।

আমি ভেতরে-ভেতরে পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। আর সেইসঙ্গে স্বস্তিও পাচ্ছিলাম। তা হলে ভুল আমার হয়নি!

ওকে জিগ্যেস করলাম, সুস্মিতাজী কীভাবে খুদকুশি করেছে।

মেয়েটি ভাঙা গলায় জানাল যে, বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বড় মেমসাব তার হাত-পায়ের শিরা ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে। অনেক খুন বেরিয়েছিল। সাহেব তখন বাড়ি ছিল না। কোম্পানির কী একটা কাজে দিল্লি গিয়েছিল। চিৎকার চেঁচামেচি করে দরজা ভেঙে সবাই সুস্মিতাজীকে দেখতে পায়। থইথই রক্তের মধ্যে মেমসাব পড়ে ছিল।

ওঃ! সেই রক্ত! কিছুই তা হলে পালটায়নি! শুধু আমিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু সুস্মিতার সুইসাইডের ব্যাপারটা শুভদীপ আমাকে ফোন করে জানাল না কেন! এটা তো ওর রাহুমুক্তির সুখবর! নাকি ওর কোনও মতলব ছিল? কয়েকমাস পর সব থিতিয়ে গেলে তারপর কি ও খবরটা আমাকে জানাবে? তারপর হ্যাংলার মতো আবার বলবে, 'লিলু, নতুন করে সবকিছু আবার শুরু করা যায় না?'

না, সবকিছু আর শুরু করা যায় না। এখন শেষ করার সময়।

ওঃ! শুভ তা হলে সেই শুভই আছে! আগাপাস্তলা নিখুঁত জানোয়ার!

সুস্মিতার জন্যে আমার কান্না পেল। তলপেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

মেয়েটিকে বললাম, 'সাহেব বাড়ি ফিরলে এত সব কথা বলার দরকার নেই। শুধু বলবে, আমি খোঁজ করতে এসেছিলাম।'

'আপনার নাম?'

'বলবে শ্যামবাজারওয়ালি মেমসাব। তা হলেই তোমার সাহেব বুঝতে পারবেন।'

'এখানে নওকরি করতে আমার আর মন লাগে না, দিদি...।' মেয়েটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল।

আমি ঠান্ডা সুরে জবাব দিলাম, 'কে করতে বলেছে! ছেড়ে দাও চাকরি।'

শুভদীপের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পথে গনগনে রোদ্দুর আমার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। নাকে রক্তের আঁশটে গন্ধ পেলাম।

গন্ধটা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত আমার নাকে লেগে রইল।

পরদিন সন্ধে নাগাদ শুভদীপকে ফোন করলাম আমি।

টেলিফোনে আমার গলা পেয়ে ও একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'লিলু, কাল তুমি আমার বাড়িতে এসেছিলে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ—।'

'আমি ঠিকই আন্দাজ করেছি, তবে ভয়ে তোমাকে ফোন করিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'লিলু, থ্যাঙ্ক গড যে তোমার রাগ পড়েছে। আমি হয়তো তোমাকে দু-এক সপ্তাহ পর ফোন করতাম।'

'কেন, সুস্মিতা সুইসাইড করেছে এই খবরটা আরও থিতিয়ে গেলে তারপর আমাকে জানাতে?' আমি নির্লিপ্তভাবে বললাম।

'ওঃ, লিলু! সবসময় তুমি এত মারমুখী হয়ে থাকো কেন বলো তো?' গলার সুর অন্তরঙ্গ করে ও বলল, 'কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলো—খুব জরুরি কথাবার্তা আছে।' কথা শেষ করার আগেই হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল শুভ।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী হল!'

'ও কিছু নয়...।' আবার সেই একইরকম শব্দ। তারপরই : 'কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলো। অনেক জরুরি কথা আছে।'

'আমারও তোমার সঙ্গে অনেক জরুরি কথা আছে। আজ রাত আটটার সময় তুমি আমার বাড়িতে আসবে?'

'ন্-না। তার চেয়ে বরং তুমি আমার বাড়িতে এসো।' শুভদীপ কাহিল সুরে বলল, 'আমার শরীর ভালো নেই।'

'তোমারও তা হলে শরীর খারাপ হয়!' আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'আমার কথাটার ডাবল মিনিং আছে কিন্তু—।'

'আঃ, লিলু, প্লিজ, ঠাট্টা কোরো না। আমার শরীরটা ভালো নেই। তুমি রাত আটটায় চলে এসো। তুমি এলে কোনও প্রবলেম হবে না।' দোতলার দক্ষিণ দিকটায় আমি থাকি।

আমি হাসলাম। বললাম, 'প্রবলেম কী করে হবে! প্রবলেম তো সুইসাইড করেছে!'

হেঁচকি তোলার মতো শব্দ শোনা গেল আবার। শুভ বলল, 'লিলু, প্লিজ, রাত আটটায় এসো কিন্তু। এখন রাখছি—।'

রাত আটটায় ওর বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রচণ্ড গুমোট কেটে গিয়ে বাতাস বইতে শুরু করেছে। ওদের বাগানের গাছের পাতা শব্দ করে এপাশ-ওপাশ দুলছে। আকাশে তারা ফুটেছে বটে, তবে চাঁদ খানিকটা মেঘে ঢাকা।

এক অচেনা বিষণ্ণতা ছেয়ে যাচ্ছিল আমার মনে। শুভদীপের ওপরে মনটা নরম হয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল সুস্মিতার কথা, বিশ বছর আগেকার কথা, আর বেঢপ নগ্ন পুতুলটার কথা।

কলিংবেল বাজাতেই গতকালের শ্যামলা মেয়েটি দরজা খুলে দিল। আমাকে সানগ্লাস ছাড়া দেখেও ও সহজে চিনতে পারল। বলল, 'বড়সাহেব দোতলার ঘরে আছে। সাহেবকে কাল বলেছি, আপনি এসেছিলেন।'

আমি হেসে ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে। তারপর এগিয়ে গেলাম দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে।

দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় শুভদীপ ছিল। বিছানায় কাত হয়ে বসে টিভি দেখছিল। আমাকে দেখেই রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে টিভি অফ করে দিল। সোজা হয়ে উঠে বসতে-বসতে ক্লিষ্ট হাসল। বলল, 'আরে, এসো এসো...বোসো...।'

আমি টিভির প্লাগ পয়েন্টের সুইচটা অফ করে দিলাম। ঘরের ভেতরটায় একপলক চোখ বুলিয়ে নিলাম।

সর্বত্র বড়লোকী ছাপ। সবকিছুই সাজানো, ফিটফাট।

আমি শুভদীপকে খুঁটিয়ে দেখলাম। প্রায় পাঁচ মাস পর ওকে আমি দেখছি। এর মধ্যে ও তেমন কিছু একটা পালটায়নি। অন্তত ওর বাইরেটা পালটায়নি।

কিন্তু ওর ভেতরটা যে পালটে যাচ্ছে সে-খবর আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে!

আমি একটা শৌখিন মোড়া টেনে নিয়ে ওর বিছানার কাছে বসলাম। ওর

মুখে ক্লান্তি শ্রান্তির পাণ্ডুর ছাপ।

'শুভ, তোমাকে কয়েকটা জরুরি কথা বলার আছে—।'

শুভ হেসে বলল, 'তোমার মাত্র কয়েকটা কথা বলার আছে? আর আমার তোমাকে অনেক কথা বলার আছে।'

কথা শেষ করেই ও হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করল। জোর করে ঢোক গিলে গলা দিয়ে উঠে আসা কোনও জিনিসকে রুখে দিল।

'শুভ, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো—।'

ও আমাকে প্রায় বাধা দিয়ে বলল, 'ভাবতেই পারছি না, তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার বেডরুমে বসে গল্প করছ!'

ঠান্ডা গলায় বললাম, 'আরও অনেক কিছুই তুমি ভাবতে পারবে না।'

হঠাৎই ও পেট খামচে ধরল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। তারপর আমার দিকে একটু মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি ঘরে বসেই ওর বমি করার শব্দ শুনতে পেলাম।

একটু পরেই ও মুখ-টুখ ধুয়ে ফিরে এল। ক্লান্ত পা ফেলে বিছানায় গিয়ে বসল।

'কী, তোমার শরীর খারাপ না কি?'

'হ্যাঁ, কয়েক মাস ধরেই এরকম হঠাৎ-হঠাৎ পেট ব্যথা করছে, বমি পাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। একটু পরেই আবার সব ঠিকঠাক। কী যে হয়েছে কিছু বুঝতেই পারছি না। ডাক্তার দেখিয়েছি। বলছে, কিছু হয়নি। হয়তো নতুন টাইপের কোনও ভাইরাল ইনফেকশান। কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়েছে, কিন্তু তাতে...।'

বুঝলাম, কাজ শুরু হয়েছে। আর কেউ এই শরীর খারাপের রহস্য বুঝতে পারবে না।

আমি নিষ্ঠুর হেসে বললাম, 'ডাক্তার দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার কী হয়েছে আমি বলে দিচ্ছি।'

শুভ যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে অবাক চোখে আমাকে দেখল ঃ 'তুমি আমাকে ভালো করে দাও, লিলু।'

'এখন ভগবানও তোমাকে ভালো করতে পারবে না। শোনো, শুভ, কাল আমি এ-বাড়িতে এসেছিলাম। সুস্মিতার কথা সব শুনেছি।'

'কে বলেছে? আশা?'

'আশা কি ভালোবাসা, কী নাম আমি জানি না—তবে তোমাদের কাজের মেয়েটিই সব বলেছে।'

শুভদীপ বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'সুস্মিতা নিজের দোষে মরেছে।

ওর মাথার দোষ ছিল।'

'হ্যাঁ, মাথার দোষ তো ছিলই, নইলে তোমার মতো পাবলিককে বিয়ে করে! যাকগে, এবারে জরুরি কথাগুলো শোনো—।'

ওকে মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপারগুলো খুলে বললাম।

শুভদীপ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ঃ 'লিলু, আমার কাছে উইচও যা, স্যান্ডউইচও তাই। তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না, একটুও ঠাট্টা করছি না। তোমাকে তো আগেও বলেছি, আমি কী করে দিন চালাই। আর আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি তুকতাকের জিনিসপত্রও দেখেছ—।'

শুভ ওর তলপেটে হাত বোলাতে লাগল। একটা বালিশ কোলে টেনে নিয়ে আরাম করে বসতে চাইল।

ওকে বললাম, 'শুয়ে পড়ো, তা হলে আরাম পাবে।'

ও কী ভেবে সত্যিই খাটের মাথার দিকটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক ঠেলে।

তখন ওকে পুতুলটার কথা বললাম।

ও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

নিস্তব্ধতা আমাদের ডুবিয়ে দিল।

তারপর ও হঠাৎ উঠে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'তুকতাক, মারণ, উচাটন—তন্ত্রমন্ত্র! হুঁঃ! এসব বুজরুকি যারা বিশ্বাস করে তারাই ওতে ভয় পায়। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।'

আচমকা ওয়াক তুলল শুভদীপ। মুখ কুঁচকে গেল ওর। জোর করে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল।

'কিন্তু আমি ওসবে বিশ্বাস করি, শুভ। আর অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করাই। ক'-মাস ধরে তোমার গা-বমি, পেট ব্যথা, গা-ব্যথা, সব কি মিথ্যে? অবশ্য পুতুলটার কথা তখন তুমি জানতে না।'

'ওসব কাকতালীয় ব্যাপার।' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ও বলল।

আমি মোড়া থেকে উঠে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর একটা হাত ধরলাম। নরম গলায় বললাম, 'শুভ, আজ শুধু তোমাকে সত্যি কথাই বলব। আর ক'-দিন পরেই এসব তন্ত্রমন্ত্রে তুমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। কারণ, বাচ্চাটা তখন নড়বে-চড়বে, হাত-পা ছুড়বে—তুমি নিশ্চয়ই টের পাবে।'

এক ঝটকায় আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিল শুভ। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে।

এমন সময় আশা আমার জন্যে জলখাবারের ট্রে নিয়ে এল। একটা টি-টেবিলে মিষ্টির প্লেট, চা-বিস্কুট ইত্যাদি সাজিয়ে দিয়ে ও চলে গেল।

ও চলে যেতেই শুভদীপ চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার ওসব নোংরা কথা আমি শুনতে চাই না। আমার গা ঘিনঘিন করছে। তুমি চটপট এগুলো খেয়ে চলে যাও...প্লিজ...।'

আমি টেবিলের কাছে গিয়ে একটা মিষ্টি মুখে দিলাম। সেটা খেতে-খেতে হাসলাম, বললাম, 'বিশ বছর আগে আমিও ঠিক এইরকম হাত-পা ছোড়া নড়াচড়া টের পেয়েছিলাম। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, বাচ্চার বদলে...।'

'তুমি এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরোও! এই মুহূর্তে!' রাগে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠল শুভ। ও বিছানা থেকে নেমে এক পা এগিয়ে এল আমার দিকে।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, 'আর এগিয়ো না। আমাকে সুস্মিতা পাওনি। একটু বেচাল দেখলেই তোমার হাল আরও খারাপ করে ছাড়ব।'

বেশ বুঝতে পারছিলাম, শুভদীপের চোখ ওর দেখা লীলাকে আর একটুও চিনতে পারছিল না।

'তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও!' হুমকি দিয়ে বলল ও।

'হ্যাঁ, যাব। এ সময়ে তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'আউট! কোনও কথা আমি শুনতে চাই না! আউট!' আঙুল তুলে ও দরজা দেখিয়ে দিল আমাকে।

আর-একটা মিষ্টি নিয়ে মুখে দিলাম আমি। আজ তো মিষ্টিমুখ করারই দিন!

লক্ষ করলাম, শুভর চুল এলোমেলো, দু-চোখে ভয়।

আমি দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পুতুলটার সব কথা ওকে বলা দরকার।

'একটা কথা তোমাকে এখনও বলিনি—।'

'তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।'

'চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই, শুভ। শোনো, পুতুলটা হচ্ছে অনেকটা অর্ধনারীশ্বর। ওটার ওপরের পোরশানটা মেয়ে, আর নীচের পোরশানটা ছেলে—।'

শুভ বিভ্রান্ত নজরে দেখতে লাগল আমাকে। আমার কথা ও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।

'পুতুলটার পক্ষে মা হওয়া কী কষ্টের এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ঠিক

একইরকম কষ্ট তোমারও হবে।'

শুভদীপ থম মেরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা এখনও ওর কাছে বোধহয় স্পষ্ট হয়নি। পরে বুঝবে। দশ মাস দশ দিন যখন পূর্ণ হবে।

ওকে একটা চুমু ছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলাম।

ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার পা কাঁপছিল, মাথা টলে যেতে চাইছিল।

জ্বালাধরা চোখ নিয়ে আমি স্মৃতিকণাকে দেখতে পেলাম। আমার পাশে-পাশে নাচতে-নাচতে চলেছে। তীব্র উল্লাসের নাচ।

শুনতে পেলাম, বাবা কপাল চাপড়ে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে।

মা জলভরা চোখে আমার সামনে এসে ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'বেশ করেছি! এতদিনে বিশ বছরের ঋণ শোধ হল।'

অন্ধকার পিচের রাস্তা থেকে তাপ উঠছিল। বাড়ি ফিরে আমাকে স্নান করতে হবে।

এমন সময় পেছন থেকে শুভদীপের বুক-ফাটা চিৎকার শুনতে পেলাম-যন্ত্রণা আর আতঙ্কের চিৎকার। সে-চিৎকারে বুক কেঁপে ওঠে।

হঠাৎই মনে হল, চিৎকারটা বোধহয় আমার কল্পনা।

কারণ, এখনও তো দশ মাস দশ দিন হয়নি।

# অপরূপ অন্ধকার

বিশ্বনাথকে গোপন খবরটা দিয়েছিলেন ওঁরই বন্ধু সন্দীপন।

তবে সেটা মোটেই সহজে দেননি। ওঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক চাপাচাপি করতে হয়েছিল, সঙ্গে ঘুষ দিতে হয়েছিল এক প্যাকেট বিদেশি সিগারেট। তারপর একটু-একটু করে ব্যাপারটা ফাঁস করেছিলেন সন্দীপন।

ফাঁস করেছিলেন আরও একটা কারণে। বিশ্বনাথের রোজকার হেনস্থার কথা শুনে সন্দীপনের মনটা নরম হয়েছিল। বন্ধুর দুঃখ-কষ্ট দাগ কেটেছিল মনে। তাই গোপন কথাটা আর গোপন রাখতে পারেননি।

শুনে থ' হয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। এরকমটাও হয়!

'হয় মানে!' চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন সন্দীপন, 'হচ্ছে! এই তো আমি জলজ্যান্ত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তারপরেও তুমি অবিশ্বাস করবে?'

না, শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করতে পারেননি বিশ্বনাথ। কিন্তু অভিনব ধাক্কাটা সামলাতে সময় লেগেছিল। আর সেই বেসামাল অবস্থাতেই একটা গোপন ইচ্ছে মনের জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল।

সন্দীপনকে আর কিছু বলেননি বিশ্বনাথ। শুধু একটা ঝিম ধরা ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

সেদিন রাতে ছেলের বউ পারমিতা যখন ওঁর সামনে খাবারের থালা রেখে দিয়ে চলে গেল তখন বিশ্বনাথ বিরক্ত হতেও ভুলে গেলেন। সন্দীপনের কথাগুলো ওঁকে এমনই মশগুল করে রেখেছিল।

খানিকক্ষণ পর খেয়াল হতেই থালায় সাজানো পদগুলো দেখতে পেলেন। তিনটে রুটি, বেগুনপোড়া, একটা সবজি, আর একটা ছোট্ট বাটিতে দই।

ওঁর মতো ষাট পেরোনো বৃদ্ধের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে এই ধরনের মেনুই নাকি ডাক্তারদের পরামর্শ।

বিশ্বনাথের মনে হল, পাশেই ডাইনিং স্পেসে গিয়ে পারমিতা আর আলোকের পাতটা দেখে আসেন। ডাক্তাররা কোন ধরনের মেনু সাজেস্ট করেছেন বত্রিশ আর সাতাশের স্বামী-স্ত্রীর জন্য। আর ডাইনিং স্পেসের পাশের বারান্দায় গিয়ে দেখে আসেন, আলোকের পোশা অ্যালসেশিয়ান ভিক্টরের জন্য কোন মেনু বরাদ্দ হয়েছে!

স্ত্রী রেণুকণা বেঁচে থাকলে বলতেন, 'ছেড়ে দাও! এসব ছোটখাটো ব্যাপার

নিয়ে কিছু বোলো না। সবাই তোমাকে ছোট ভাববে। তার চেয়ে বরং একটু না হয় স্যাক্রিফাইস করলে...।'

স্যাক্রিফাইস! আলোক আর পারমিতা জানে এই শব্দটার মানে?

রেণুকণার কথা মনে পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের জমাট অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

দীর্ঘশ্বাসের আর দোষ কী! রেণুকণা চলে যাওয়ার পর গত পাঁচ বছর ধরে এটা বিশ্বনাথের গা সওয়া হয়ে গেছে।

বেশ মনে পড়ে, আলোকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ও কলেজ থেকে বি. এসসি. পাশ করে বেরোনোর পর-পর।

এমনিতে ছোটবেলা থেকেই ও বেশ আদরে-আদরে মানুষ হয়েছে—একমাত্র সন্তান হলে সাধারণত যেমনটা হয়। তবে ও যতই বড় হয়েছে ওর মধ্যে জেদ আর স্বার্থপর ভাব ততই মাথাচাড়া দিয়েছে।

বিশ্বনাথ ব্যাপারটা ভীষণ অপছন্দ করতে শুরু করেছিলেন।

রেণুকণা আলোককে যেমন স্নেহ করতেন, তেমন শাসনও করতেন। তবে দুটোর মাত্রা বোধহয় সঠিক অনুপাতে ছিল না। অথবা বোধহয় ভাবতেন, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু হয়নি।

আলোকের সঙ্গে যেদিন বিশ্বনাথের প্রথম সরাসরি সংঘর্ষ বাধে সেদিনটা বিশ্বনাথ ভোলেননি। কারণ, দিনটা ছিল আলোকের জন্মদিন। তখন ও থার্ড ইয়ারে পড়ে।

বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নেমতন্ন করেছিল আলোক। আর ভ্যাপসা গরমের মধ্যে সারাটা দিন ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাত পুড়িয়ে ছ-সাত পদ রান্না করেছিল রেণুকণা। ফ্রায়েড রাইস, চাইনিজ আলুর দম, চিলি চিকেন, আরও কত কী!

জন্মদিন আসার দিনসাতেক আগে থেকেই মায়ের কাছে বায়না করেছিল আলোক। বলেছিল, 'মা, কলেজে এবারই আমাদের লাস্ট ইয়ার—এরপর বন্ধুরা কে কোথায় ছিটকে যাবে। এবারের বার্থডেটা একটু জোরদার করতে হবে। আমার খুব ক্লোজ পাঁচ-ছ'জন বন্ধুকে সেদিন নেমন্তন্ন করব—রাতে এখানে খেতে বলব।'

রেণুকণা হেসে রাজি হয়েছিলেন। কারণ, আলোকের সেই কোন সাত বছর

বয়েসে বেশ ঘটা করে ওর জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় সব বছরেই শুধু ওরা তিনজন। আর রেণুকণার হাতে তৈরি পায়েস, সঙ্গে মাংস, কিংবা চিংড়ি মাছের মালাইকারি।

তাই সেবার খাওয়াদাওয়ার আয়োজনটা ভালোই হয়েছিল। বিশ্বনাথ নিজের হাতে চুটিয়ে বাজার করেছিলেন।

সন্ধেবেলা আলোকের পাঁচজন বন্ধু এসে হাজির হল। তিনজন ছেলে, দুজন মেয়ে। ওদের পোশাক বেশ আধুনিক ফিটফাট। চেহারাও টগবগে, তরতাজা। মুখে হাসি লেগেই আছে। আর হাতে গিফ্‌টের প্যাকেট।

বিশ্বনাথ আর রেণুকণার সঙ্গে বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিল আলোক। ওরা সবাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করল।

বিশ্বনাথের ব্যাপারটা ভালো লেগেছিল। যদিও যুগ এখন অনেক এগিয়ে গেছে, চারপাশটা অনেক আধুনিক, তা সত্ত্বেও এই সেকেলে অভ্যাসটা বিশ্বনাথকে তৃপ্তি দিয়েছিল।

সারা সন্ধে ধরে আলোকের ঘরে ওরা হইহুল্লোড় করল। সাউন্ড সিস্টেমে চড়া আওয়াজে গান বাজিয়ে নাচল। গোটা ফ্ল্যাটে আনন্দ আর খুশির পাগলা হাওয়া উদ্দামভাবে ছুটে বেড়াতে লাগল।

পাশের ঘরে বসে বিশ্বনাথ আর রেণুকণা উৎসবের এই মেজাজটা বেশ ভালোই উপভোগ করছিলেন। কয়েকটা গানের সঙ্গে রেণুকণা গুনগুন করে গলাও মেলাচ্ছিলেন।

বিশ্বনাথের বয়েসটাও পিছিয়ে যাচ্ছিল দ্রুতবেগে। তিনি রেণুর হাত চেপে ধরে একটা গোপন ইশারা করলেন, তারপর হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কিন্তু রাতের খাওয়াদাওয়ার পরেও ওদের হইহুল্লোড় চলতে লাগল।

বিশ্বনাথের ভুরু কুঁচকে গেলেও ব্যাপারটা অতটা গায়ে মাখেননি। শুধু ঘড়ির কাঁটা দশটা পার হতেই রেণুকণাকে বললেন, 'দশটা বেজে গেছে... এখনও এরকম শোরগোল হচ্ছে...আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন এবার মাইন্ড করতে পারে...।'

রেণু বললেন, 'তুমি গিয়ে একবার আলোকে বলো না...।'

বিশ্বনাথ বেঁকে বসলেন। রেণুকণাকেই বললেন দায়িত্বটা নিতে। কিন্তু রেণুও গাঁইগুঁই করে বিশ্বনাথের কোর্টে বল পাঠাতে চাইলেন।

এইভাবে বেশ কয়েকবার বল চালাচালির পর বিশ্বনাথ হেরে গেলেন।

ব্যাজার মুখে উঠে দাঁড়ালেন। রওনা হলেন আলোকের ঘরের দিকে।

ওর ঘরে যেতে-যেতে মনে-মনে রিহার্সাল দিচ্ছিলেন বিশ্বনাথ। ঠিক কীভাবে কথাটা বলবেন আলোকে? ঘরের বাইরে ইশারায় ডেকে নেবেন? তারপর চাপা গলায় বলবেন, 'আলো, রাত হয়েছে—এবার বন্ধুদের বাড়ি যেতে বলো।'

নাঃ, এটা একটু শাসনের মতো শোনাচ্ছে। ছেলে বড় হয়েছে। ওর ইগো এতে হার্ট হতে পারে।

তার চেয়ে এরকম করে বললে হয় ঃ 'আলো, সাউন্ড সিস্টেমের আওয়াজটা একটু আস্তে করে দাও। অন্য ফ্ল্যাটের লোকজন হয়তো ডিসটার্ব্‌ড হচ্ছে...।'

হ্যাঁ, এটা অনেক বেটার। এ-কথা বললে আলোক মোটেই বিশ্বনাথের ওপরে রাগ করবে না।

সুতরাং রিহার্সাল দেওয়া সংলাপটা একরকম মুখস্থ করে বিশ্বনাথ আলোকের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের বাইরের বারান্দার আলোটা নেভানো ছিল। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের আলো আর শব্দ চলকে পড়ছে বাইরে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছেলেকে ইশারা করে ডাকার জন্য আলোর এলাকায় মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন বিশ্বনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর ভেতরকার ছন্দ-তাল সব গরমিল হয়ে গেল।

কারণ, যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

মিউজিক সিস্টেমের ঝংকারের তালে-তালে ছ'টা ছেলেমেয়ে উদ্দামভাবে নাচছে। মেঝেতে ওদের এলোমেলো পা ফেলার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছিল, পায়ের সঙ্গে মাথার তেমন সুষম যোগাযোগ নেই।

আলোককে দুপাশ থেকে ধরে রেখেছে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি রোগা, লম্বা, থুতনিতে এক চিলতে দাড়ি। আর মেয়েটি মাথায় খাটো, ফরসা মুখের দুপাশে কোঁকড়া চুলের ঢল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, গায়ে লাল রঙের থ্রি-কোয়ার্টার হাতা টপ, পায়ে স্কিন-টাইট জিন্‌স।

আলোককে ওরা ধরে রেখেছে কারণ আলোক ঠিকঠাক অবস্থায় নেই। ও চোখ বুজে জিভটা লম্বা করে বাইরে বের করে রেখেছে। আর ওর জিভের সামনে লকলক করছে ছোট্ট একটা সবুজ সাপ। সাপটাকে আলোকের জিভের কাছাকাছি ধরে রেখেছে কালো মাথায় কদমছাঁট চুল একটি ছেলে। ছেলেটির চুলের ডানপাশটা সাপটার মতোই সবুজ। আর হাতে চামড়ার দস্তানা।

বেসামাল নাচের তালে-তালে আলোকের জিভ এপাশ-ওপাশ সরে যাচ্ছিল।

আর সাপটাও জিভের নিশানা ঠিক রাখতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছিল।

বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মতো সবুজ হিলহিলে সাপটা আলোকের জিভে ছোবল মারল।

ছোবল এসে পড়ল বিশ্বনাথের বুকেও। যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ভেজা কাপড় নিংড়ানোর মতো ওঁর হৃৎপিণ্ডটা অমানুষিক শক্তিতে মোচড় দিচ্ছিল কেউ, আর টপটপ করে রক্ত ঝরছিল।

পৃথিবীর যত বয়েস বাড়ছে ততই সে আধুনিক হয়ে উঠছে। পৃথিবীর বয়েস আসলে যেন কমছে। কিন্তু বিশ্বনাথের বুকের ভেতরটা হুহু করছিল।

একটু-আধটু নেশা করা হয়তো দোষের নয়। কিন্তু তাই বলে সাপের ছোবল!

ছোবলটা জিভে পড়ার পরই পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল আলোক। ওর শরীরটা বেপরোয়াভাবে ছটফট করতে লাগল। ব্যাপারটা যন্ত্রণার না আনন্দের সেটা আলোকের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বুঝতে চাইলেন বিশ্বনাথ। কিন্তু পারলেন না।

শুধু দেখলেন, আলোকের দুপাশের ছেলেটা আর মেয়েটা শক্ত করে আলোককে চেপে ধরে আছে। আর আলোকের ঠোঁটের কোণ থেকে লালা ঝরছে। একটা তৃপ্তির গোঙানিও যেন শোনা যাচ্ছে ওর মুখ থেকে।

ভাঙা বুক নিয়ে সরে এসেছিলেন বিশ্বনাথ। অন্ধকার বারান্দায় শুরু হয়ে গিয়েছিল ওঁর নতুন রিহার্সাল। রেণুকণাকে গিয়ে এখন কী বলবেন? বলবেন সাপের ছোবলের কথা? রেণুকণার সমস্ত আনন্দ আর সুখ শেষ করে দেবেন এক ছোবলে?

না, বিশ্বনাথ সেটা পারেননি। ফিরে এসে মিথ্যে কথা বলেছিলেন স্ত্রীকে: 'আলো বলল, একটু পরেই ওরা চলে যাবে...।'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার সেই শুরু।

রেণুকণা বিশ্বনাথের কাছ থেকে আলোককে আড়াল করেছেন। আর বিশ্বনাথ পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে আলোর কালো দিকগুলো লুকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

এইভাবে দুজনে গোপনে সাপের ছোবল খেয়ে চলেছেন বরাবর।

সময় বদলে যাচ্ছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আলোকও। কিন্তু বিশ্বনাথ আর রেণুকণা নিজেদের বদলে ফেলতে পারছিলেন না মোটেই। যখনই ওরা শক্ত হয়ে কোনও একটা রুক্ষ সিদ্ধান্তের কথা ভাবছিলেন, তখনই ম্যাজিকের মতো ছোট্টবেলার আলোক হাসিমুখে আধো-আধো কথা নিয়ে ওঁদের সামনে এসে

দাঁড়াচ্ছিল। আর সেই স্নেহের তাপে বরফের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত গলে জল হয়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে।

শেষ পর্যন্ত ওঁরা আড়ালে শুধু চোখের জল ফেলেছেন।

আলোক বড় হয়ে উঠছিল আর চারপাশের উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে দিব্যি নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছিল।

ওকে ব্যাবসা করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। সে-টাকা নষ্ট হলেও কোনও প্রশ্ন করেননি ছেলেকে—কোনও জবাবদিহি চাননি। শুধু রেণুকণার কাছে আড়ালে আক্ষেপ করেছেন।

আলোক ওর ইচ্ছেমতো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আউটিং-এ গেছে। সারা রাত ধরে নাইটক্লাবে গিয়ে হুল্লোড় করেছে। কিংবা বাড়িতে ইয়ার দোস্তদের ডেকে রঙ্গিলা পার্টির আয়োজন করেছে।

একইসঙ্গে আলোকের পোশাক-আশাক, চুলের ছাঁট ইত্যাদি পালটে গিয়েছিল।

কখনও লম্বা-লম্বা চুল, এক কানে দুল, বুড়ো আঙুলে সোনার আংটি নিয়ে ও হাজির হয়েছে বিশ্বনাথের সামনে। আবার কখনও-বা জুলপি-হীন কদমছাঁট, হাতে রিস্ট ব্যান্ড, গলায় সরু চেন—তার লকেটে কঙ্কালের মাথা। আবার কোনওদিন নাভি পর্যন্ত খোলা থ্রি-কোয়ার্টার হাতা ফিনফিনে কাপড়ের জামা, বুকে নানান রঙের উল্কি, ডানবুকের নিপ্‌লে আটকানো সোনার রিং।

এইভাবে ছেলেটা ধীরে-ধীরে অচেনা হয়ে যাচ্ছিল বিশ্বনাথের কাছে। আলোক থেকে স্রেফ লোক হয়ে যাচ্ছিল।

জীবনের শেষ ক'টা বছর রেণুকণার বেশ কষ্টে কেটেছিল। চাপা গলায় আপনমনে প্রায়ই বলতেন, 'আমাদের সেই আগের সময়টাই ছিল ভালো—যখন আর কেউ ছিল না...শুধু তুমি আর আমি...।'

কথাটা বলতে গিয়ে রেণুকণার গলা ধরে যেত। তিনি সবসময় বিশ্বনাথকে যেমন ছেলের কাছ থেকে আড়াল করতেন, একইসঙ্গে নিজেও ছেলের জীবন থেকে সরে থাকতে চাইতেন। গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকের মতো ওঁরা আলোকের জীবনযাপন দূর থেকে দেখতেন।

আলোক একটা ওষুধকোম্পানিতে প্রথম চাকরি নিয়েছিল। তারপর অত্যন্ত কম সময়ে উঠে গেল ওপরদিকে। হঠাৎই একদিন ও একটা এসি প্রিমিয়াম গাড়ি কিনে ফেলল—গাড়িটার রং ছিল চকচকে কালো— ছ'টা দরজা। আর তার সপ্তাহদুয়েক পরেই একটা সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। রেণুকণাকে ডেকে বলল, 'মাম, এ হল পারমিতা। আজ থেকে আমার সঙ্গে

থাকবে—।[1]

ঘটনাটা রেণুকণাকে নতুন করে তেমন ধাক্কা দেয়নি। আধুনিক টিভি প্রোগ্রামের দৌলতে সবাই জানে যে, শাঁখা-সিঁদুর-বিয়ে বহুবছর ধরে মাথায় উঠেছে। এখন শুধু থাকাথাকির যুগ। যতদিন পোষায় একসঙ্গে থাকো। তারপর ইচ্ছে হলে একা চলে যাও।

কিন্তু বিশ্বনাথ বা রেণুকণা ব্যাপারটাকে 'বিয়ে' বলেই ভেবেছেন। পারমিতা আজও বিশ্বনাথের চোখে আলোকের 'স্ত্রী'।

আলোকের বিয়ের—অথবা, ওইরকম কিছুর—বছরখানেক পর রেণুকণা চলে গেলেন। চলে যাওয়ার সময় নিজে যেমন কষ্ট পাননি, তেমনিই কাউকে কষ্ট দেননি। রাতে ঘুমিয়েছিলেন। সকালে সেই ঘুম আর ভাঙল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সিভিয়ার সেরিব্রাল অ্যাটাক। হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যা ছিলই—সম্ভবত সেটাই ঘুমের মধ্যে লাগামছাড়া হয়ে গেছে।

রেণুকণা চলে যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন না—তাই কিছুই গুছিয়ে যেতে পারেননি। বিশ্বনাথকে আচমকা ফাঁকা মাঠে একা দাঁড় করিয়ে চলে গেলেন। ঢেউয়ের দাপটে লাট খাওয়া মানুষের মতো বিশ্বনাথের সব ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি হতবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

তার পর থেকে পাঁচটি বছরে সবকিছুই কেমন বদলে গেল।

ফ্ল্যাটের সবচেয়ে ছোট ঘরটায় বিশ্বনাথের ঠাঁই হল। সরকারি গবেষণা সংস্থা 'ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট' থেকে সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে রিটায়ার করলেন এবং ছোটবেলার মতো বেকার হয়ে গেলেন।

টিভি দেখে, রেণুকণার কথা ভেবে, আর বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলেন বিশ্বনাথ। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কমিয়ে দিলেন। চারপাশের জীবন থেকে ধীরে-ধীরে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে তিনি যেন কোনও চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় রইলেন। একটা অপ্রয়োজনীয় জীবনকে বয়ে বেড়ানোর ক্লান্তি আর গ্লানি বিশ্বনাথকে কুরে-কুরে খেতে লাগল।

সামনে রাখা থালার দিকে হাত বাড়ালেন। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে খানিকটা বেগুনপোড়া মুড়ে নিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'দ্যাখো রেণু, কপালপোড়া দিয়ে রুটি খাচ্ছি—'

গ্রাসটা মুখে পুরে দিলেন। একইসঙ্গে চোখ ফেটে জল এল। খাবারটা চিবিয়ে ঢোক গিলতে কষ্ট হল।

রেণুকণা ওঁর বুকের ভেতর থেকে বকুনি লাগালেন ঃ 'কী ছেলেমানুষের

মতো করছ! কী খেলে সেটা বড় কথা নয়—শরীর রাখাটাই বড় কথা। ভুলে যাও কেন, তোমার বয়েস হয়েছে? নাও, খেয়ে নাও...কেঁদো না, লক্ষ্মীটি ...।'

গলা ব্যথা করলেও খাওয়া শেষ করলেন বিশ্বনাথ। অনেকটা জল খেয়ে গলা সাফ করে তবেই ঠিকঠাক শ্বাস নিতে পারলেন আবার। পারমিতার ছকে দেওয়া নিয়ম মতো এঁটো থালা আর গ্লাসটা টয়লেটের কাছে ওয়াশবেসিনের নীচে রেখে দিলেন। তারপর বেসিনে হাত-মুখ ধুচ্ছেন, হঠাৎই একটা চাপা গরগর শব্দ শুনে বেসিনের সামনের আয়নার দিকে তাকালেন।

আলোকদের বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্টর।

লোমে ঢাকা ভারী শরীর। গলার কাছটায় লোমগুলো এত ঘন যে, গলার বেল্‌ট্‌টা লোমে ডুবে গেছে। দুটো হলদে চোখ কী তীব্র! কপাল থেকে ছাই রং নেমে এলেও পরে সেটা গাড় হয়ে ছুঁচলো মুখের কাছে কালো হয়ে গেছে। চোয়াল দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। নাকের ডগাটা কুঁচকে ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত বের করে রেখেছে বলে হিংস্র আর ভয়ংকর লাগছে।

তার সঙ্গে ওই গরগর শব্দ।

রোজকার রুটিন থেকে বিশ্বনাথ জানেন, ভিক্টর এখন টয়লেটে যাবে। পারমিতা ট্রেনিং দিয়ে ওকে এটা অভ্যেস করিয়েছে। টয়লেট ব্যবহার করার সময় ভিক্টর একা থাকতে চায়—আশপাশে লোকজন চায় না। অর্থাৎ, বিশ্বনাথকে এখন টয়লেটের কাছ থেকে সরে যেতে হবে।

বিশ্বনাথ সরে এলেন।

ভিক্টরের কাছাকাছি হতে ওঁর ভয় করে। কারণ, মাসকয়েক আগে ভিক্টর ওঁর হাতে কামড়ে দিয়েছিল। আলোক আর পারমিতার কাছে সে-ঘটনা জানানোর পর ওদের যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল!

আলোকের কথাগুলো মনে পড়তেই বিশ্বনাথের কান গরম হয়ে উঠল। অপমান আর ধিক্কারের জ্বালা নতুন করে ছুঁচ ফোটাল বুকে।

ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ। আজ আর বই পড়তে কিংবা টিভি দেখেতে ইচ্ছে করল না।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা হাত মাথার ওপরে রেখে অন্ধকার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আলোক আর পারমিতার কাছে বিশ্বনাথের পরিচয় প্রয়োজনহীন নিষ্কর্মা একজন বাড়তি মানুষ। বিশ্বনাথ থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী! বিশ্বনাথ যে বেঁচে আছেন সেটা কেউ টের পায় না। আবার চলে গেলেও কেউ

যে ওঁর অভাব টের পাবে তাও মনে হয় না।

সবমিলিয়ে এক হতচ্ছাড়া জীবন।

সেইজন্যই সন্দীপনের কথাটা মনে পড়ছিল বারবার।

সত্যিই তো! যে-জীবনটা অবহেলা আর অপমানে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে সেটাকে একটু বদলে নিলে ক্ষতি কী!

বিশ্বনাথের ইচ্ছে হল, এই মুহূর্তে সন্দীপনকে একটা ফোন করেন। কিন্তু উপায় নেই। বেস ফোন আলোকদের ঘরে। আর বিশ্বনাথের মোবাইল ফোন নেই।

কিন্তু সন্দীপনের আছে।

এই নতুন 'চাকরি'টা নেওয়ার পরই বোধহয় তিনি মোবাইল ফোন কিনেছে।

কমিউনিটি পার্কে রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের আড্ডায় সন্দীপন বিশ্বনাথের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। কারণ, দুজনের জীবনে অনেকটা মিল আছে।

সন্দীপন বিপত্নীক। ওর এক ছেলে। ছেলে যেমন একরাশ মেয়েবন্ধু জুটিয়ে ফূর্তিফার্তা করে, ছেলের বউও একই টাইপের। দুজনে একেবারে যেন রাজযোটক। সন্দীপন ওদের সঙ্গে কোনওরকমে টিকে আছেন।

সেইজন্যই বিশ্বনাথের সঙ্গে সন্দীপনের সুখ-দুঃখের কথা হয় বেশি।

আজ সন্ধেবেলা পার্কে বসে সন্দীপনের কাছে ব্যাপারটা শোনার পর বিশ্বনাথ হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটা ভয়ংকর ধাক্কা খেয়েছিলেন।

কিন্তু যতই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছেন ততই মনে হচ্ছে, সন্দীপন ঠিকই করেছেন।

প্রথমত এই 'চাকরি'টা নিলে একটা কাজের মধ্যে থাকা যাবে। আর দ্বিতীয়ত, আর্থিক টানাপোড়েনের জায়গাটা অনেক নরম আর সহজ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এখন যে-জীবনে বিশ্বনাথ হাঁটছেন—হাঁটছেন কি না কে জানে!—তার ডাকনাম হয়তো 'জীবন', কিন্তু পোশাকী নাম যে 'মরণ' সেটা ক'জন বুঝবে!

বিশ্বনাথ ভেবে দেখলেন, মরে থাকা মানুষ আর মরতে পারে না। তাই ঠিক করলেন, কাল রাস্তায় বেরিয়ে সন্দীপনকে ফোন করবেন।

বাড়িটার বাইরের চেহারাটা যে ছদ্মবেশ সেটা বোঝা গেল ভেতরে ঢোকার পর। বাইরেটা যেমন জরাজীর্ণ, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো, ভেতরটা ততটাই উলটো—ঝকঝকে, স্মার্ট। এটাই 'শট্স অ্যান্ড বিক্স'-এর অফিস।

রাস্তার ফোনবুথ থেকে সন্দীপনকে ফোন করে একটা কোম্পানির নাম আর একটা সেল ফোনের নম্বর নিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। তারপর দুরুদুরু বুকে সেই নম্বরে ফোন করেছেন।

'হ্যালো...''শট্‌স অ্যান্ড কিক্‌স''?'

'ইয়েস।' একটা মেয়েলি গলা উত্তর দিল, 'আপনি কে বলছেন?'

বিশ্বনাথ নাম বললেন।

'এই ফোন নাম্বারটা আপনাকে কে দিয়েছেন—রেফারেন্সটা কাইন্ডলি বলবেন?'

বিশ্বনাথ সন্দীপনের নাম-ঠিকানা বললেন।

সঠিক রেফারেন্স না দিতে পারলে কথাবার্তা যে সেখানেই শেষ সেটা সন্দীপন বারবার করে বিশ্বনাথকে বলে দিয়েছেন। বলেছেন যে, ওরা স্রেফ 'রং নাম্বার' বলে লাইন কেটে দেবে।

ও-প্রান্তে মেয়েটি একটু সময় নিচ্ছিল। বোধহয় কম্পিউটারের ডেটাবেস-এ সন্দীপনের নাম-ঠিকানাটা ক্রসচেক করে নিচ্ছিল।

একটু পরেই ঃ 'ও. কে., মিস্টার বোস, বলুন কীভাবে আপনাকে আমরা হেল্‌প করতে পারি—।'

বিশ্বনাথ বেশ চেষ্টা করে বললেন, 'আমি সি. ভি. অপারেশান করাতে চাই।'

এ-কথা শুনে মেয়েটির যান্ত্রিক গলা একটুও কাঁপল না। ও বলল, 'আপনার ফুল পোস্টাল অ্যাড্রেস দিন আর আপনার মায়ের বিয়ের আগের পদবী বলুন।'

বিশ্বনাথ নিজের পুরো ঠিকানা বললেন। তারপর আমতা-আমতা করে জানতে চাইলেন, 'আমার মায়ের মেইডেন সারনেম? মা তো বহু বছর আগে মারা গেছেন...তাঁর বিয়ের আগের...।

মেয়েটি বিশ্বনাথকে বাধা দিয়ে বলল, 'একটা-দুটো অফবিট পারসোনাল ইনফরমেশান আমরা ডেটাবেস-এ স্টোর করে রাখি, মিস্টার বোস। আমাদের কোনও পেশেন্ট ওভার দ্য ফোন কোনও ইনফরমেশান চাইলে আমরা তাঁর টেলিফোনিক পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার ছাড়াও দু-একটা পারসোনাল ইনফো ক্রসচেক করে নিই—সেইজন্যেই আপনার মায়ের মেইডেন সারনেমটা দরকার। যদি বাই চান্স কেউ আপনার টি-পিন নাম্বারটা জেনেও যায়, সে আপনার নাম করে ফোন করেও আমাদের কাছ থেকে আপনার কোনও প্রাইভেট ইনফো বের করতে পারবে না।' একটু দম নিল মেয়েটি।

তারপর বলল, 'দিস ইজ অ্যাবসোলিউটলি ফর প্রোটেকশান অফ ইয়োর প্রাইভেসি, মিস্টার বোস। আই হোপ য়ু উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ...।'

বিশ্বনাথ বুঝলেন, কিন্তু একইসঙ্গে অবাকও হলেন। এত সতর্কতা কীসের জন্য?

একটু পরেই ওঁর মনে হল, অপারেশানটা হয়তো ইল্লিগাল—তাই এত সাবধান হতে চায় ওরা।

বিশ্বনাথ ওঁর মায়ের বিয়ের আগের পদবি বললেন।

তখন মেয়েটি ওঁকে একটা নম্বর দিয়ে বলল, 'এটা আপনার রেফারেন্স নাম্বার। আমাদের অফিসের রিসেপশানে এসে এই রেফারেন্স নাম্বারটা বলবেন, আর আপনার ফোটো আই-ডি কার্ড দেখাবেন। তা হলেই আপনাকে একজন এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে। আপনার দেখা করার সময় হল সন্ধে সাতটা থেকে ন'টা। যদি আজ থেকে ঠিক সাতদিনের মধ্যে আপনি যোগাযোগ না করেন তা হলে আপনার সমস্ত রেকর্ড্‌স আমাদের ডেটাবেস থেকে অটোমেটিক্যালি ইরেজ্‌ড হয়ে যাবে। তখন আপনাকে পুরো কেসটা রিওপেন করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার, মিস্টার বোস?'

এত কথা বলার সময় মেয়েটির গলায় এতটুকু ওঠা-পড়া হয়নি। মনে হচ্ছিল, টেলিফোনে মেয়েটি পড়া মুখস্থ বলছে।

এরপর মেয়েটি বিশ্বনাথকে 'শট্‌স অ্যান্ড কিক্‌স'-এর ঠিকানা দিল। তারপর বলল, 'উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট ইন ইয়োর পসিব্‌ল নিউ লাইফ, মিস্টার বোস। থ্যাংক য়ু ফর কলিং। হ্যাভ আ নাইস ডে।'

টেলিফোনে কথা বলার পর বেশ কয়েকদিন তীব্র দোটানায় ভুগেছেন বিশ্বনাথ। অপারেশান করাবেন—না কি করাবেন না? রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রেণুকণার সঙ্গে অনেক কাল্পনিক তর্ক-বিতর্ক করেছেন, নিজের সঙ্গেও অনেক লড়াই করেছেন। কারণ, এই সি. ভি. অপারেশানটা পারমানেন্ট—রিভার্সিব্‌ল নয়। একবার অপারেশান হয়ে গেলে আর ফেরা যায় না।

বিশ্বনাথ অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এলেন, তিনি আর ফিরতে চান না।

সুতরাং বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে যাওয়ার কোনও ঝটকা টের পেলেন না বিশ্বনাথ। বরং মনে হল, সামনেই নতুন জীবন।

বাড়িটার রং চটে গেছে, নানান জায়গায় ফাটল। তার কোনও-কোনও জায়গা থেকে উঁকি মারছে বট-অশ্বথের চারা। রাস্তার ভেপার ল্যাম্পের কটকটে

আলোয় বাড়িটাকে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা ভিখারি মনে হচ্ছে।

বাড়ির সদর দরজার মাথায় ছোট্ট ইলেকট্রনিক সাইনবোর্ড। তাতে ইংরেজি হরফে লেখা ঃ 'শট্‌স অ্যান্ড কিক্‌স'। তার নীচে ছোট-ছোট হরফে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ঃ 'ড্রাগ অ্যাবিউজ ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ।'

চারপাশে ড্রাগের নেশা কীরকম জাঁকিয়ে বসেছে সেটা বিশ্বনাথ ভালোই জানেন। সরকার ড্রাগ অ্যাবিউজের সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত। খবরের কাগজ কিংবা টিভি চ্যানেল খুললে ড্রাগের বিষয়ে খবর অন্তত শতকরা দশ ভাগ। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকেই ঝাঁকে-ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা ড্রাগের খপ্পরে পড়ছে। সেটা সামাল দিতে সরকার যে-স্পেশাল নারকোটিক্‌স ডিপার্টমেন্ট খুলেছে তারা দিন-রাত হিমশিম খাচ্ছে। সেইসঙ্গে নাজেহাল হচ্ছে পুলিশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতির সমস্যা থেকেই এই সমস্যাটা মাথাচাড়া দিয়েছে। আর অর্থনীতির সমস্যার শিকড়ে রয়েছে তীব্র বেকার সমস্যা।

না, এতসব জটিলতা বিশ্বনাথ বোঝেন না। তিনি শুধু দেখছেন, চারপাশের ছেলেমেয়েরা দিন-দিন কেমন উচ্ছৃংখল বেপরোয়া হয়ে উঠছে, নিত্যনতুন নেশার পিছনে পাগলের মতো ছুটছে। ওদের সামনে নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঝকঝকে তকতকে একটা অফিসের মুখোমুখি হলেন বিশ্বনাথ। চারপাশে শুধু কাচের দেওয়াল, শৌখিন রাবার উডের ফার্নিচার, ল্যাপটপ কম্পিউটার আর টেলিফোন। কোথাও-কোথাও মিহি সুরে ফোনের রিং বাজছে—এ ছাড়া এয়ার কন্ডিশান্ড অফিসটায় আর কোনও শব্দ নেই।

সব পার্টিশান কাচের হওয়ায় অফিসের ভেতর অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

বিভিন্ন কাচের দেওয়ালে যেসব স্লোগান আর পোস্টার লাগানো রয়েছে তাতে মনে হবে 'শট্‌স অ্যান্ড কিক্‌স'-এর আসল কাজ হল ড্রাগের মারাত্মক নেশা ছাড়ানো। প্রতিটি পোস্টারে ওদের লোগো—'এস', 'এ', 'কে' অক্ষর তিনটে সুন্দর জড়ানো কায়দায় লেখা।

বিশ্বনাথের অবাক লাগছিল। মনে হচ্ছিল এটাও আর-একটা ছদ্মবেশ।

রিসেপশানে অনেক লোকের ভিড়। বেশিরভাগই কমবয়েসি ছেলেমেয়ে—সঙ্গে ওদের বাবা-মা কিংবা গার্জেন। ওঁরা সত্যি-সত্যি হয়তো ছেলেমেয়ের ড্রাগের নেশা ছাড়াতে এসেছেন।

ওই ভিড়ের মধ্যে দুজন বয়স্ক মানুষকে দেখে বিশ্বনাথের সন্দেহ হল।

ওঁরা দুজন সি. ভি. অপারেশানের জন্য আসেননি তো!

কে জানে, 'শট্‌স অ্যান্ড কিক্‌স' হয়তো ড্রাগের দু-দিকেই কাজ করে ঃ ড্রাগের নেশা ধরানো এবং ছাড়ানো।

রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ফুটফুটে দেখতে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। লম্বা-লম্বা নখে একই রঙের নেইলপালিশ। কানের লতিতে বিশাল মাপের দুটো রুপোলি রিং। ওর পিছনের দেওয়ালে জ্বলন্ত সিগারেটের ওপরে লাল কাটা চিহ্ন দেওয়া একটা পোস্টার।

রিসেপশানে বিশ্বনাথ নিজের নাম লেখা স্লিপ জমা দিয়ে বিশ্বনাথ দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পালা আসতেই রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ওঁর নাম ধরে ডাকল।

বিশ্বনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে মেয়েটির কাছে গেলেন। নিজের রেফারেন্স নম্বর বললেন, ফটো আই-ডি কার্ড দেখালেন।

মেয়েটি ভাবলেশহীন মুখে ল্যাপটপের বোতাম টিপতে লাগল। কালো কিবোর্ডের ওপরে ওর নড়েচড়ে বেড়ানো লাল নখগুলোকে ফুলের পাপড়ি বলে মনে হচ্ছিল।

ল্যাপটপের পরদায় মেয়েটি কী দেখল কে জানে! শুধু চোখ তুলে বিশ্বনাথের দিকে কয়েকপলক তাকাল। তারপর বলল, 'আপনি বসুন, মিস্টার বোস। আপনাকে নিতে লোক আসবে।'

তারপরই মেয়েটি কিবোর্ডের বোতাম টেপায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বেশিক্ষণ বসতে হল না। সাদা অ্যাপ্রন পরা একটি ছেলে অফিসের ভেতর থেকে হেঁটে আসছিল রিসেপশানের দিকে। কাচের দরজা ঠেলে সে রিসেপশান জোনে এল। রিসেপশানিস্টের কাছে গিয়ে চাপা গলায় কী যেন জিগ্যেস করল। উত্তরে রিসেপশানিস্ট চোখের ইশারায় বিশ্বনাথকে দেখিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটি স্মার্টভাবে চলে এল বিশ্বনাথের কাছে। নীচু গলায় বলল, 'মিস্টার বোস?'

বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে উঠে দাঁড়ালেন।

'কাইন্ডলি আমার সঙ্গে আসুন—।'

ছেলেটির সঙ্গে এগোলেন বিশ্বনাথ। ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। চোখে আধুনিক পলিমার লেন্সের চশমা। ফ্যাকাসা, রোগা চেহারা। এতই রোগা যে, চোয়াল এবং কণ্ঠা বিশ্রীভাবে নিজেদের জাহির করছে। তবে ছেলেটির মাথার চুল অস্বাভাবিক ফোলানো-ফাঁপানো। ওর রোগা চেহারার সঙ্গে ভীষণ বেমানান

লাগছে। ওর পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁকড়া চুলগুলো নড়ছে।

ছেলেটির সঙ্গে অনেকগুলো কাচের দরজা পেরোলেন বিশ্বনাথ। তারপর একটা পরদা ঘেরা কাচের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ছেলেটি বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসল ঃ 'ভেতরে যান, মিস্টার বোস। ডক্টর মালাকার আপনার জন্যে ওয়েট করছেন।'

হাত বাড়িয়ে কাচের দরজা ঠেলে খুলল ছেলেটি। চোখের ইশারায় বিশ্বনাথকে ভেতরে যেতে ইশারা করল।

বিশ্বনাথ যখন ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকছেন তখন ছেলেটি চাপা গলায় বলল, 'অল দ্য বেস্ট, স্যার—।'

ছেলেটি 'স্যার' বলায় বিশ্বনাথ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন। ছেলেটি মুচকি হেসে চলে গেল।

এতক্ষণ বিশ্বনাথের বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। যদিও জেদটা মনের ভেতরে ভালোমতোই জাঁকিয়ে বসেছিল। ছেলেটির বলা 'স্যার' শব্দটা বিশ্বনাথকে যেন নতুন এক ভরসা দিল। নতুন এক মর্যাদাও যেন অনুভব করলেন।

ভাবার সময় আর বেশি ছিল না। শক্ত পায়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন বিশ্বনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে ডক্টর মালাকার ওঁকে খুব চেনা আত্মীয়ের মতো অভ্যর্থনা জানালেন।

'আরে, আসুন...আসুন, বিশ্বনাথবাবু...' একগাল হেসে দু-হাত বাড়িয়ে বিশ্বনাথের হাত চেপে ধরলেন মালাকার ঃ 'বলুন, কেমন আছেন? সব কুশল মঙ্গল তো!'

বিশ্বনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে কাঠ-কাঠ হাসলেন। নীচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো আছি—।'

ডক্টর মালাকার কি অন্য কোনও সূত্রে ওঁকে চেনেন? এমনভাবে ভদ্রলোক কথা বলছেন যেন কতদিনের চেনা!

'বসুন, বসুন—'একটা শৌখিন রিভলভিং চেয়ারের দিকে ইশারা করলেন ডক্টর মালাকার। তারপর একই ঢঙে উচ্চারণ করলেন, 'হুম। তো আপনি ভ্যাম্পায়ার হতে চান? মানে, সি. ভি. অপারেশান করাতে চান—মানে, যেটাকে আমরা কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার বলি...।'

বিশ্বনাথ চেয়ারে বসলেন বটে, কিন্তু ওঁর গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মালাকার তাঁর চেয়ারে বসে হাসি-হাসি মুখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোধহয় উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন।

আশ্চর্য! কী সহজে কথাগুলো বললেন মালাকার! যেন ব্যাপারটা রোজকার দাড়ি কামানোর মতোই মামুলি।

ঠান্ডা ঘরের মধ্যেও ঘেমে গেলেন বিশ্বনাথ। অবাক চোখে মালাকার এবং তাঁর অফিসটাকে দেখতে লাগলেন। যেন পুরোটাই অন্য কোনও গ্রহের ব্যাপার।

ডক্টর মালাকার বেশ মোটাসোটা। কোমরের বেল্টের ওপর থেকে মাঝারি মাপের ভুঁড়ি উপচে পড়ছে। মাথায় মসৃণ টাক—শুধু কানের ওপরটায় কয়েক খাবলা কাঁচাপাকা চুল। আর কানের পাশ দিয়ে অনেকটা গালপাট্টার মতন পাকা জুলপির জঙ্গল নেমে এসেছে।

মালাকারের রং ফরসা—তবে কিছুটা রোদে পোড়া। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। ছোট মাপের ভুরু। তার নীচেই মেটাল ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। দু-দিকে ফোলা গালের মাঝে নাকটা বক্সারদের মতো থ্যাবড়ানো। গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। থুতনির নীচে দু-থাক চর্বি। সবমিলিয়ে মুখে একটা কমিক ভাব আছে। ফলে এই লোক যে সি. ভি. অপারেশন করেন সেটা ভাবাটা বেশ কঠিন।

মালাকারের চেম্বারটা মাপে বেশ বড়। দেখে ডক্টর্স চেম্বার বলেই মনে হয়। দু-দেওয়াল জুড়ে 'এল' কাউন্টার। তাতে বেশ কয়েকটা মোটা-মোটা বই আর কাগজপত্র রাখা। তার পাশেই একটা এলসিডি মনিটারওয়ালা কম্পিউটার। মনিটারে কারসর দপদপ করছে।

কাউন্টারের বাঁদিকে প্রচুর ডাক্তারি যন্ত্রপাতি। অপারেশানের জন্য সেগুলো ব্যবহার হয় কি না বিশ্বনাথ ঠিক বুঝতে পারলেন না। তার ঠিক ওপরেই কাচের দেওয়ালে একটা ইলেকট্রনিক ক্যালেন্ডার—তাতে আজকের তারিখটা লাল রঙে জ্বলছে।

ডক্টর মালাকারের সামনে রাবার উডের বড়সড় টেবিল। টেবিলের একপাশে ল্যাপটপ কম্পিউটার। হয়তো বিশ্বনাথ ঘরে ঢোকার আগে মালাকার এই কম্পিউটারেই কাজ করছিলেন।

কম্পিউটারের পাশে একটা বেঁটেখাটো প্ল্যাস্টিকের স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডের একইঞ্চি ওপরে একটা ডাম্বেল আকৃতির রোটর শূন্যে ঝুলছে। আর স্ট্যান্ডের একপাশে লেখা 'এস. এ. কে'।

এ ছাড়া টেবিলে পড়ে আছে রঙিন কয়েকটা পেন, দুটো মোবাইল ফোন, আর চার-পাঁচটা খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন।

মালাকার আবার জিগ্যেস করলেন, 'আপনি সি. ভি. অপারেশানটা করাতে চান তো, বিশ্বনাথবাবু?'

বিশ্বনাথ মাইক টেস্ট করার মতো গলাখাঁকারি দিয়ে গলা টেস্ট করলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, চাই...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...।'

উত্তর শুনে মালাকার হাসলেন, বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল! আপনার মতো কনফিডেন্ট পেশেন্ট আমরা খুব বেশি পাই না। বেশিরভাগই দোটানায় ভোগে।'

বিশ্বনাথ অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর কী করতে হবে সেটা ডক্টর মালাকার তাড়াতাড়ি বলে ফেললেই ভালো। সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়েই গেছে তখন আর দেরি করে লাভ কী!

সন্দীপন এখানকার কনট্যাক্ট নম্বর বিশ্বনাথকে দিয়েছেন, আর দু-চার লাইনে অপারেশানটার কথা বলেছেন। এও বলেছেন, 'আর বেশি জানতে চেয়ো না। ওরা পুরো ব্যাপারটাই কনফিডেনশিয়াল রাখতে বলেছেন। তুমি আগে ডিসাইড করো কী করবে—তারপর ওখানে গেলে ওরাই সবকিছু তোমাকে ডিটেইল্‌সে বলে দেবে...।'

এখন সেই ডিটেইল্‌স শোনার পালা।

ডক্টর মালাকার টেবিলে রাখা ল্যাপটপের কিবোর্ডে আঙুল চালালেন। এলসিডি পরদার দিকে কয়েক সেকেন্ড আড়চোখে তাকালেন। তারপর বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসলেন।

'বিশ্বনাথবাবু, আমরা আপনার একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবনটা বদলে দেব—নতুন থ্রিলিং জীবনের দরজা খুলে দেব আপনার সামনে।' টেবিলের ওপরে ঝুঁকে এলেন মালাকার : 'না, না—এগুলো মোটেই সেল্‌স টক নয়। এগুলো হার্ড রিয়েলিটি। তা ছাড়া অপারেশানের জন্যে আমরা তো পয়সা নেব—সো য়ু শুড নট বি গ্রেটফুল টু আস। ইট্‌স আ প্রফেশনাল ডিল। আপনি যা চান—আমরা দেব।

'আপনি তো জানেন, এই টুয়েন্টি সেকেন্ড সেঞ্চুরিতে টেকনোলজি বুম যেমন হয়েছে তেমনই হয়েছে অ্যাডিক্‌শান বুম—স্ম্যাক বুম। এখনকার ইয়াং জেনারেশানের টুয়েন্টি এইট পার্সেন্ট অ্যাডিক্‌টেড। মদ, গাঁজা, চরস, হ্যাশিশ, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, মরফিন, মিথাড্রেন, মেস্কালাইন—এরকম কত নাম আর বলব! এর কোনওটা স্টিমুল্যান্ট, কোনওটা নারকোটিক, আবার কোনওটা বা হ্যালুসিনোজেন। এরকম আরও অনেক টাইপ আছে। কিন্তু লাস্ট পনেরো কি বিশ বছরে আরও অনেক নতুন-নতুন নেশা ইনট্রোডিউস্‌ড হয়ে গেছে...।'

ডক্টর মালাকারকে বাধা দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, 'হ্যাঁ—যেমন সাপের ছোবল।'

হাসলেন মালাকার ঃ 'ঠিকই বলেছেন। তবে সাপের ছোবলেই ব্যাপারটা থেমে থাকেনি। সাপের পাশাপাশি চালু হয়েছে পাহাড়ি কাঁকড়াবিছে, গিরগিটি আর বেজির কামড়—এ ছাড়া যদিও খুব রেয়ার এবং কস্ট্‌লি, কেউ-কেউ নেশার জন্যে অ্যামেরিকার অ্যারো-পয়জন ফ্রগের বিষ ডাইলুট করে ব্যবহার করে। আপনি জানেন কি না জানি না—বহুবছর আগে কাফ সিরাপ আর ঘুমের ট্যাবলেটও এসব কাজে ব্যবহার হত—'

বিশ্বনাথ মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, তিনি শুনেছেন।

ডক্টর মালাকার ভুরু উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু এখন সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে কোন নেশা জানেন?'

বিশ্বনাথ জানেন। সন্দীপনের কাছে শুনেছেন। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। ডক্টর মালাকারের কাছ থেকেই উত্তরটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'ভ্যাম্পায়ারের ছোবল।' চোখ বড়-বড় করে বললেন মালাকার, 'এটাই এখন ট্রেন্ডি। বড়লোকের নেশা করা ছেলেমেয়েরা এই ছোবলের জন্যে পাগল। বুঝতেই পারছেন, এই নেশাটা কস্ট্‌লি—তাই একটু অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরাই এই নতুন নেশায় হ্যাবিচুয়েটেড...। চলতি কথায় এটাকে আমরা বলি "ভি-স্টিং"। আফটার সি. ভি. অপারেশান স্টিং প্রোভাইড করাটাই হবে আপনার প্রফেশান। তাতে খুব একটা খারাপ ইনকাম হবে না আপনার। তা ছাড়া বোনাস হিসেবে কতকগুলো বাড়তি সুবিধে পাবেন...থাক—সেগুলো পরে জানবেন।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখে হাত বোলালেন মালাকার ঃ 'মোট কথা, আমি আপনাকে বলছি, আফটার অপারেশান, দিস নিউ লাইফ ইজ গোয়িং টু বি ভেরি-ভেরি ইন্টারেস্টিং। রিয়েলি ইট ইজ—কারণ, এ পর্যন্ত আমরা কোনও কমপ্লেইন পাইনি।'

টেবিলে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সেইসঙ্গে কেঁপে উঠে নড়তে লাগল টেবিলের ওপরে।

ডক্টর মালাকার ফোনটা তুলে কথা বললেন। 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ,' করে কিছুক্ষণ কথা বলে শেষে বললেন, 'হ্যাঁ, পেশেন্টের সঙ্গে ফাইনাল কথা বলে অপারেশানের ডেট ফিক্স করে নিচ্ছি। ও. কে.।'

মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে ওটা টেবিলে আবার রেখে দিলেন মালাকার। তারপর স্থির চোখে তাকালেন বিশ্বনাথের দিকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মিস্টার বোস, লেট আস নাউ কাম ডাউন টু বিজনেস। লেট মি টেল য়ু দ্য ফ্যাক্ট্‌স অ্যান্ড ফিগার্‌স অ্যাবাউট দ্য সি. ভি. অপারেশান...।'

ডক্টর মালাকার বলে গেলেন, বিশ্বনাথ শুনে গেলেন।

অপারেশানটার জন্য খরচ দু-ঘণ্টা সময়, আর চল্লিশ হাজার টাকা। তবে হিসেব করলে অপারেশানটা মোটেই কস্ট্লি নয়। কারণ, অপারেশানের পরে বিশ্বনাথ যখন 'শট্স অ্যান্ড কিক্স'-এর মাধ্যমে নেশার ক্লায়েন্ট পাবেন, তখন ক্লায়েন্টপিছু এক-একটা রাতের জন্য তিনি পাবেন একহাজার টাকা। তার মধ্যে সার্ভিস চার্জ হিসেবে 'শট্স অ্যান্ড কিক্স' কেটে নেবে থার্টি পার্সেন্ট। সুতরাং, অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, মাত্র আটান্ন রাতের কাজ পেলেই বিশ্বনাথের অপারেশানের খরচ উঠে আসবে। তা ছাড়া অপারেশানের পর বিশ্বনাথ কিছু নতুন-নতুন ক্ষমতার মালিক হবেন। সেগুলো এত অ্যাট্রাক্টিভ যে, ডক্টর মালাকার সেগুলোকে বোনাস বলেই ভাবেন।

'আমাদের এই অপারেশান বা রিলেটেড ব্যাপারগুলো কিন্তু অ্যাবসোলিউটলি কনফিডেনশিয়াল। আমাদের যে-এগ্রিমেন্ট তৈরি হবে তার একটা মেজর কন্ডিশানই হচ্ছে সিক্রেসি। কারণ, জেনে রাখুন, এই সি. ভি. অপারেশানটা পানিশেব্ল আন্ডার ইন্ডিয়ান পিনাল কোড। যদি অপারেশানের পরে আমাদের সিক্রেট পুলিশ কিংবা সিকিওরিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট আপনার খোঁজ পায়... যদি জানতে পারে যে, আপনি কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। তা ছাড়া ভ্যাম্পায়ারের ছোবল দিয়ে নেশা করা বা করানো—দুটোই ইল্লিগাল।' মালাকার আবার চওড়া হাসলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটো ভুঁড়ির ওপরে রাখলেন। একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন, ইল্লিগাল হলে এই কাজটা আমরা করছি কেন। করছি কারণ, এই অপারেশানটা বায়োটেকনোলজির একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট। তা ছাড়া আমরা ভালো কাজও তো করছি! এই যে, কত ছেলেমেয়েকে ড্রাগের সর্বনাশা নেশা থেকে বাঁচাচ্ছি! আসলে একগাদা পুণ্যের সঙ্গে ছিটেফোঁটা পাপ মিশে থাকলে ওটা হিসেবের মধ্যে আসে না।

'মোট কথা, মিস্টার বোস, আপনি এখন ''এস এ সি''র টপ সিক্রেট জোনে ঢুকে পড়েছেন। এবার আপনাকে এগ্রিমেন্ট ফর্ম আর বন্ড সই করতে হবে। তারপর আপনার রুটিন মেডিকেল চেক-আপ করা হবে। এই ইসিজি, ইইজি, ব্লাডপ্রেশার, ইউএসজি এইসব আর কী।

'এবারে বলুন, আপনি কবে অপারেশানটা করাতে চান?...'



বিশ্বনাথ যে সি. ভি. অপারেশানটা করিয়েছেন সেটা আলোক বা পারমিতা টের পেল না। কারণ, অপারেশানটা এমন যে, অপারেশানের পর ঘণ্টাতিনেক

রেস্ট নিলেই রুগি চাঙ্গা হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। ফলে বিশ্বনাথও অপারেশানের পর 'শর্ট্স অ্যান্ড কিক্স' থেকে দিব্যি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসি ট্রলি বাস ধরে বাড়ি চলে এসেছেন। ওরা কেউ কিছু টের পায়নি।

তবে ভিক্টর বিশ্বনাথকে দেখে একটু যেন বাড়তি গরগর করেছিল। তাতে ভয় পেয়ে সাততাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

বিশ্বনাথের কেমন যেন গা গুলোচ্ছিল। তাই রাতে আর কিছু খাননি। ডক্টর মালাকার বলেছেন, ক'টা দিন ঠান্ডা নরম জিনিস খেতে—তার সঙ্গে দুধ বা ফলের রস।

তেতো হাসি আঁকা হয়ে গেল বিশ্বনাথের ঠোঁটে। দুধ বা ফলের রস! মালাকার তো আর জানেন না ও-দুটো জিনিসের বন্দোবস্ত করতে গেলে অকর্মণ্য বেকার বুড়ো বাপের জন্য আলোর যা বাজেট সেটা ছাড়িয়ে যাবে!

ডক্টর মালাকার বন্ধুর মতো সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনাথকে। সাতদিন বিশ্রাম। তারপর 'এস এ কে'-তে গিয়ে ডক্টর মালাকারের কাছে পোস্ট অপারেশনাল চেক-আপ। এই রুটিন চলবে টানা বত্রিশ দিন। তারপর বিশ্বনাথ নতুন জীবনের জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবেন।

যেহেতু অপারেশানটা রিভারসিব্‌ল নয় সেহেতু মালাকার বারবার করে বলেছেন, নতুন জীবন নিয়ে কখনও কোনওরকম আক্ষেপ না করতে। এও বলেছেন, '...আপনার যা বয়েস তাতে দুঃখ বা আক্ষেপ হলেও খুব বেশিদিন সেটা আপনাকে সইতে হবে না। সবসময় অপটিমিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলবেন, বিশ্বনাথবাবু। ইট উইল বি গুড ফর ইয়োর নিউ লাইফ।'

আলোক আর পারমিতার জীবন ওদের ছন্দে চলছিল। আর বিশ্বনাথ থেকেও-না-থাকার ঢঙে দিন কাটাতে লাগলেন। শুধু অপারেশানের উপসর্গগুলো ওঁকে কষ্ট করে সইতে হচ্ছিল। দাঁতে আর মাড়িতে অসহ্য ব্যথা, কান ভোঁ-ভোঁ করা, মাথা ঘোরা, গলা শুকিয়ে আসা। মালাকার ওঁকে মোবাইল নম্বর দিয়েছেন। বলেছেন, 'দরকার মনে করলেই আমাকে ফোন করবেন। আমার ফোন চব্বিশ ঘণ্টা অন থাকে—।'

অপারেশানের সময় স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বনাথের কোনও জ্ঞান ছিল না। তবে অপারেশানের আগে ডক্টর মালাকার সংক্ষেপে সহজে ব্যাপারটা ওঁকে মোটামুটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

বিশ্বনাথের ক্যানাইন টুথ বা শ্বদন্ত দুটো আধুনিক কৌশলে রিস্ট্রাকচার্ড করা হয়েছে। ফলে দাঁত দুটো এখন আরও চোখা হয়েছে। আর ও-দুটোর

ভেতরে সূক্ষ্ম চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে। ওর লালা গ্রন্থির মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছে একটা স্পেশাল ভ্যাম্পায়ার সিরাম গ্ল্যান্ড। এ ছাড়া নার্ভাস সিস্টেমটাকেও রিমডেল করে ভাইটালাইজ করা হয়েছে। আর মাস্‌ল স্ট্রেংথ অনেক বাড়ানো হয়েছে—সেই সঙ্গে কমানো হয়েছে যন্ত্রণা অনুভবের ক্ষমতা।

ডক্টর মালাকারের ভাষায়, '...পুরো ব্যাপারটাই একটা হাই-টেক ইনট্রিকেট কোঅর্ডিনেটেড অপারেশান। গত পাঁচ দশকে বায়োটেকনোলজির ফেনোমেনাল বুম না হলে এই অপারেশানটা শুধুমাত্র কল্পবিজ্ঞানের বইয়ে পাওয়া যেত—বিজ্ঞানের বইয়ে নয়।'

বিশ্বনাথ বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলেন, 'অপারেশানের পর আমি তা হলে কী হব? মানুষ, না ভ্যাম্পায়ার?'

'দুটোই—।' হেসে বলেছেন মালাকার, 'য়ু উইল হ্যাভ দ্য বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস।'

তারপর তাঁর সে কী মজার হাসি!

হতভম্ব বিশ্বনাথের চোখের সামনে সন্দীপনের মুখটা ভেসে উঠেছিল। সন্দীপন বলেছিলেন, তিনি বেশ মজায় আছেন। কোনও সমস্যা নেই। যেহেতু এই সিক্রেট অপারেশানটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করাটা স্ট্রিক্‌টলি বারণ, তাই সন্দীপন সব খুলে বলতে পারছেন না। শুধু বিশ্বনাথের দুরবস্থা দেখে বন্ধু হিসেবে মনে কষ্ট পেয়েছেন বলেই পথের নিশানাটুকু জানিয়েছেন।

অপারেশানের সাতদিন পর থেকেই বিশ্বনাথ পরিবর্তনগুলো টের পেতে লাগলেন।

আগে অন্ধকারে সময় কাটাতে খুব একটা পছন্দ করতেন না। কারণ, একরাশ বিষণ্ণতা মনটাকে ঘিরে ফেলত। রেণুকণার সঙ্গে মনে-মনে কথা বলা শুরু করে দিতেন—সেই কথার বেশিরভাগটাই ছিল আক্ষেপের।

কিন্তু এখন ধীরে-ধীরে সব কেমন পালটে যাচ্ছে। অন্ধকারের আকর্ষণ ক্রমশ টের পাচ্ছেন বিশ্বনাথ। সন্ধের পর নিজেদের ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে উঠে সময় কাটাতে বেশ লাগে। খুব প্রয়োজন না হলে ঘরের আলো জ্বালেন না। আর সেই অন্ধকারে চোখ মেলে কত না নতুন-নতুন রূপ দেখতে পান বিশ্বনাথ। ওঁর চোখের সামনে জমাট অন্ধকার কেমন সুন্দর-সুন্দর ছবি তৈরি করে। তখন রেণুকণার সঙ্গে কথা বলেন বিশ্বনাথ। আক্ষেপের নয়—আনন্দের কথা। যেমন, আর কিছুদিন পর থেকেই বিশ্বনাথের টাকাপয়সার টানাপোড়েন আর থাকবে না। তখন অনেকটা নিজের মতো করে বাঁচতে পারবেন। রাস্তার

হোটেল-রেস্তরাঁয় ইচ্ছেমতো ভালো-মন্দ কিছু খেতে পারবেন। কোনও দুঃস্থ মানুষকে পাঁচটা টাকা ভিক্ষে দিতে পারবেন। কমিউনিটি পার্কে খেলতে আসা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের লজেন্স বা চকোলেট বিলি করতে পারবেন।

বিশ্বনাথের খুশি-খুশি ভাব দেখে রেণুকণা খুশি হন। নিশ্চিত হন।

ঘ্রাণশক্তিও কি খানিকটা বেড়ে গেছে বিশ্বনাথের? পারমিতার ঠিকে কাজের লোক যখন রান্নাঘরে রান্না করে তখন ঘরে বসেও সে-রান্নার গন্ধ তিনি পান কেমন করে? ভিক্টরের গন্ধও বা মাঝে-মাঝে নাকে আসে কেন?

আগে তো এমন আসত না!

নতুন এই ক্ষমতাগুলোকে বিশ্বনাথ উপভোগ করছিলেন আর বত্রিশ দিন শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ডক্টর মালাকারের রুটিন চেক-আপ চলছিল। প্রতিটি চেক-আপের পর তিনি দিলখোলা ঢঙে হেসে বলেন, 'য়ু আর হিলিং আপ এক্সিলেন্ট্লি। আই অ্যাম রিয়েলি সারপ্রাইজ্ড।'

ডক্টর মালাকার একদিন বললেন, 'আপনার হিলিং আপ প্রসেস শেষ হয়ে গেলে আমাকে মোবাইলে মাঝে-মাঝে ফোন করবেন। আমি আপনাকে প্রথম ক্লায়েন্ট দেব। আর ভি-স্টিং-এর প্রসেসটাও ভালো করে বুঝিয়ে দেব। ও. কে.?

বিশ্বনাথ বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে, 'এস এ কে' থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

কিন্তু বিশ্বনাথের দাঁত নিয়ে কৌতূহল ছিল। রোজ সকালে ওয়াশ বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজার সময় শ্বদন্ত দুটোকে পরখ করেন। দেখেন তার ওপরের মাড়ির অবস্থাটা। চোয়াল নাড়িয়ে দাঁতে-দাঁতে আলতো করে ঠোকাঠুকি করেন। না, তেমন ব্যথা আর নেই।

শুধু এতেই থামেননি বিশ্বনাথ। লুকিয়ে-লুকিয়ে কামড় দিয়েছেন বিছানার তোশকে। সেটা যে শুধু দাঁতের জোর পরীক্ষার জন্য তা নয়। দাঁত কেমন যেন সুড়সুড় করছিল কামড় দেওয়ার জন্য—কুকুরছানাদের যেমন করে।

অস্বীকার করে লাভ নেই, তোশকে কামড় দিয়ে একটু যেন তৃপ্তিও পেয়েছেন। যদিও জিভে তোশকের স্বাদটা মোটেই ভালো ঠেকেনি।



সেরে ওঠার বেশ কিছুদিন পর প্রথম ক্লায়েন্টের ডাক পেলেন বিশ্বনাথ। ডক্টর মালাকার বিশ্বনাথকে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন 'এস এ কে'-র স্পেশাল

সেল'-এ। ওরাই ক্লায়েন্টদের ফাইল মেইনটেইন করে।

স্পেশাল সেল-এর কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে ক্লায়েন্টের ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন।

শশিভূষণ দে স্ট্রিটের একটা অন্ধকার বাঁকে দাঁড়িয়ে একটা পুরোনো তিনতলা বাড়ি। বাড়ির একতলায় একটি মলিন মিষ্টির দোকান। তার রং-চটা সাইনবোর্ডে কী লেখা আছে একমাত্র ভগবানই জানেন। দোকানের ময়লা শো-কেসের বেশিরভাগটাই খালি। যে-ক'টা মিষ্টি চোখে পড়ছে সেগুলো মনে হয় বেশ পুরোনো। দোকানের দেওয়ালে ঝুল-কালির ছোপ। একটি নাদুসনুদুস লোক খালি গায়ে শো-কেসের পিছনে বসে আছে।

এই মিষ্টির দোকানটাই বিশ্বনাথের ল্যান্ডমার্ক। এই দোকানেই ক্লায়েন্ট ব্রতীন সরকারের খোঁজ করতে হবে।

খোঁজ করলেন বিশ্বনাথ। তারপর দোকানের পাশের ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

সিঁড়িতে ওঠার আগে বাঁ-দিকে একটা তালিমারা কাঠের দরজা। তাতে নতুন রং করা হয়েছে। দরজার পাল্লায় একচিলতে কম্পিউটার প্রিন্টআউট আঠা দিয়ে সাঁটা। তাতে ব্রতীন সরকার নামটা ছাপা রয়েছে।

দরজায় টোকা মারলেন বিশ্বনাথ। একইসঙ্গে স্পেশাল সেল-এর নির্দেশ মনে পড়ল ঃ 'ভি-স্টিং-এর কাজটা সারতে আড়াই মিনিট মতো লাগে। কোনও অবস্থাতেই ক্লায়েন্টের সঙ্গে পাঁচমিনিটের বেশি কাটাবেন না। মনে রাখবেন, যে-সার্ভিসটা আমরা ক্লায়েন্টদের প্রোভাইড করছি সেটা অ্যাবসোলিউটলি ইল্লিগাল। সিক্রেট পুলিশ কিংবা সিকিওরিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের হাত থেকে আপনাকে বাঁচতে হবে। আপনি যে-কাজে যাচ্ছেন সেটা একটা কাজ। এখানে পারসোনাল রিলেশানের কোনও জায়গা নেই।,

দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে পঁচিশ-ছাব্বিশের ছিপছিপে এক ফরসা যুবক। মাথার চুল কদমছাঁট। দু-গালে কুণ্ডলী পাকানো সাপের উল্কি। বাঁ ভুরুর শেষে একটা ছোট আংটি।

ব্রতীনের চোখ ঢুলুঢুলু। তবে সেটা নেশার জন্য নাও হতে পারে। কারণ, বিশ্বনাথ কোনওরকম গন্ধ পেলেন না।

ওর গায়ে লাল স্যান্ডো গেঞ্জি, আর পরনে সাদা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট— যাকে সবাই থ্রি-কিউ বলে।

'কী চাই?' ভারী গলায় প্রশ্ন করল ব্রতীন।

স্পেশাল সেল-এর বলে দেওয়া কোড নম্বরটা বললেন বিশ্বনাথ।

ঠোঁটে হাসল ব্রতীন। ওর চোখের মণি প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হল। ঘষা নার্ভাস গলায় বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন—।'

পাশের কোনও ঘর থেকে কড়াইয়ে ফোড়ন দেওয়ার 'ছ্যাঁক' শব্দ পেলেন বিশ্বনাথ। ওঁর বুকের ভেতরটাও কেমন যেন 'ছ্যাঁক' করে উঠল। সামনেই প্রথম পরীক্ষা। বিশ্বনাথ ঠিকঠাক পারবেন তো?

রান্নার গন্ধ নাকে গিয়ে ব্রতীনের ঘরে ঢুকলেন।

ছোট্ট অগোছালো ঘর। চারপাশে কড়া সিগারেটের গন্ধ। রঙিন জামা-প্যান্ট এখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। একটা ছোট্ট টেবিল বইপত্রে পাহাড় হয়ে রয়েছে। খাট বিছানা প্রায় লন্ডভন্ড। তার ওপরে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, তিনটে রঙিন সলিউব্‌ল প্লাস্টিকের প্যাকেট আর বেশ কয়েকটা একশো টাকার নোট এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। একদিকের দেওয়ালে দড়িতে একরাশ জামাকাপড় ঝুলছে। তার পাশেই মাঝারি মাপের একটা শৌখিন আয়না।

ব্রতীন ঘরের মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল। বোধহয় ওরও এটা প্রথমবার।

বিশ্বনাথ কাঁপা হাতে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে খিল এঁটে দিলেন। তারপর ব্রতীনের দিকে হাত বাড়ালেন ঃ 'টাকাটা?'

বাইটের ফি-টা আগে চেয়ে নেওয়াটাও নিয়মের মধ্যেই পড়ে। স্পেশাল সেল থেকে এটা বিশ্বনাথকে বারবার করে বলে দেওয়া হয়েছে।

ব্রতীন বিছানার ওপরে হুমড়ি খেয়ে খামচে-খামচে একশো টাকার নোটগুলো তুলে নিল। কাঁপা হাতে খসখস শব্দ করে গুনে নিল। তারপর বিশ্বনাথের দিকে এগিয়ে দিল ঃ 'ওয়ান থাউজ্যান্ড...।'

বিশ্বনাথ টাকাটা গুনে পকেটে রাখলেন। টাকাটা নেওয়ার সময় ওঁর কানদুটো কেমন গরম হয়ে উঠল। মনে হল যেন, পৃথিবীর আদিম ব্যাবসায় নেমে পড়েছেন। টাকার বিনিময়ে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করা।

'কনভার্টেড ভ্যাম্পায়াররা এরকম এজেড হয় নাকি?' ব্রতীন নার্ভাসভাবে জিগ্যেস করল।

বিশ্বনাথ ওর দিকে তাকাতেই খেয়াল করলেন, ব্রতীন ওঁকে খুঁটিয়ে দেখছে।

বিশ্বনাথ ধীরে-ধীরে নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠছিলেন। নিজেকে বুড়ো

ভাবতে এখনও রাজি নন। তাই ব্রতীনের কথার 'এজেড' শব্দটা ওঁকে একটু খোঁচা দিয়েছিল।

'তা আপনি কি পঁচিশ-ছাব্বিশের টগবগে ইয়াং লেডিকে আশা করেছিলেন নাকি?'

ব্রতীন এই পালটা প্রশ্নে মোটেই আহত হল না। বরং সরলভাবে বলল, 'না, আমি তো ঠিক জানি না...মানে, আগে কখনও বাইট নিইনি...তাই। আপনি কিছু মাইন্ড করবেন না, প্লিজ...।'

ছেলেটার কথায় বিশ্বনাথের কেমন যেন মায়া হল। বুঝতে পারলেন, এটাই ওর ভার্জিন বাইট। বিশ্বনাথের আরও কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বললেন না। স্পেশাল সেল-এর নির্দেশ মনে পড়ল ঃ 'ক্লায়েন্টদের সঙ্গে প্রফেশন্যাল প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও নয়। ডোন্ট ওয়েস্ট আ সিঙ্গল মোমেন্ট। ইট ইজ অ্যান ইমপরট্যান্ট সেফটি রুল...।'

বিশ্বনাথ চোখ থেকে চশমটা খুলে পকেটে ভরে নিলেন। তারপর ব্রতীনের কাছে এগিয়ে গেলেন।

টের পেলেন ঘামতে শুরু করেছেন। বুকের ভেতরে হাপর চলছে। রেণুকণার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এরকমই হাপর চলেছিল ওকে প্রথম জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার সময়।

ব্রতীন ঠিক বুঝতে পারছিল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কী ওর করার আছে। ওর চোখের নজরে কেমন যেন একটা হতবুদ্ধি ভাব ছায়া ফেলছে। একজন কিশোরীর মতো অস্বস্তি নিয়ে ও ভার্জিন বাইটের জন্য অপেক্ষা করছিল।

ব্রতীন মাথাটা ডানদিকে সামান্য হেলিয়ে দিল। বিশ্বনাথ ওর কণ্ঠার হাড় দেখতে পেলেন। বাঁ কানের লতির ইঞ্চিতিনেক নীচে ফরসা কোমল জায়গাটায় মনোযোগ দিয়ে তাকালেন। এইরকম জায়গায় ঠোঁট রেখে রেণুকণাকে আদর করেছেন অসংখ্যবার। কখনও-কখনও মৃদু দংশনও করেছেন।

আজ রেণুকণার বদলে একজন পুরুষ। আর দংশনটাও বিষাক্ত।

আর দেরি করলেন না বিশ্বনাথ। ব্রতীনের দু-কাঁধে হাতের ভর রেখে মুখ নীচু করলেন। ঠোঁট ছোঁয়ালেন ঘাড় আর কাঁধের জোড়ের কাছটায়। তারপর ঠোঁট ফাঁক করে শ্বদন্ত উঁচিয়ে ধরলেন।

ঠিক তখনই আড়চোখে আয়নাটার দিকে কেন তাকিয়েছিলেন কে জানে! সেখানে দেখা গেল একজন সুঠাম প্রৌঢ়ের মুখ। হাঁ করার ফলে মুখের চারপাশে

কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বাঁ-গালে একটা ছোট তিল।

সবই ঠিক ছিল—শুধু একটা জায়গায় বিশ্বনাথ ধাক্কা খেলেন। আয়নার প্রৌঢ়ের চোখে তৃষ্ণা মেটানোর আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে।

বিশ্বনাথ আর ভাবতে চাইলেন না। ওঁর নাকে ব্রতীনের ঘামের গন্ধ আসছিল। সেই গন্ধটাই কোন অজানা কৌশলে ফেরোমোনের কাজ করছিল যেন। বিশ্বনাথকে টানছিল।

আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দাঁত বসালেন।

ছোট্ট করে 'আঃ!' শব্দ করল ব্রতীন। যন্ত্রণা আর আমেজে ওর চোখ বুজে গেল।

ভালো করে কামড় দিলেন বিশ্বনাথ। বুঝতে পারলেন, ভ্যাম্পায়ার সিরাম গ্ল্যান্ডে চাপ পড়ছে। একইসঙ্গে টের পেলেন, কামড়টা তোশকের তুলনায় অনেক—অনেক ভালো লাগছে। একটা উত্তেজনার ঢেউও যেন খেলা করছে বিশ্বনাথের শরীরে।

ব্রতীনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন। দুটো পুরুষ শরীর ক্রমে জট পাকিয়ে যেতে লাগল। কেউ দেখলে ভাববে, সমকামী টানে শক্ত লাগা দুটো মানুষ।

আবার কামড় বসালেন বিশ্বনাথ। তারপর আবার।

স্পেশাল সেল-এর এটাই নিয়ম। মোট তিনবার। বোধহয় নেশাটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য।

দ্বিতীয় কামড়ের পরেই রক্তের নোনা স্বাদ পেলেন। এই স্বাদটা যতটা জঘন্য লাগার কথা ততটা লাগল না। বরং ব্রতীনের ঘাড় থেকে মুখ তোলার পর দাঁতে এবং ঠোঁটে লেগে থাকা রক্ত জিভ দিয়ে দিব্যি চেটেপুটে মুছে নিলেন।

বিশ্বনাথের হাতের বাঁধনে ব্রতীন এলিয়ে পড়েছিল। বিশ্বনাথ অনায়াসে ওর শরীরটা তুলে নিয়ে বিছানায় ঢেলে দিলেন। পকেট থেকে চশমাটা বের করে চোখে দিলেন। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে আসা স্টিকিং প্লাস্টার এঁটে দিলেন ব্রতীনের ক্ষতচিহ্নের ওপরে।

শরীরটা একটু দুর্বল লাগছিল। মাথাটাও যেন ঝিমঝিম করছিল খানিকটা। এগুলো বাইটের আফটার এফেক্ট। স্পেশাল সেল তাই বলেছিল।

নিজেকে সামলাতে দশ কি পনেরো সেকেন্ড সময় নিলেন। বিছানায় শিশুর মতো অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা ব্রতীনের দিকে একবার তাকালেন। ঘুমন্ত

ছেলেটার মুখ দিয়ে তৃপ্তির একটা 'উঁ-উঁ' শব্দ বেরিয়ে আসছে।

বিশ্বনাথ হঠাৎই অবাক হলেন। গায়ের শক্তি কি বেড়ে গেছে? নইলে ব্রতীনকে এত সহজে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন কীভাবে? ডক্টর মালাকার তো গায়ের জোর বেড়ে যাওয়া নিয়ে কোনও কথা বলেননি! তা হলে কি এটা হিসেবের বাইরের কোনও ঘটনা? সি. ভি. অপারেশানের পর যে-যে পরিবর্তনগুলো হওয়ার কথা তার বাইরেও কি কিছু-কিছু হয়ে যায়? ব্যাপারটা কি চান্স ফ্যাক্টর, না হিউম্যান ফ্যাক্টর?

বিশ্বনাথ আর সময় নষ্ট করলেন না। চুপিসারে ব্রতীনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজাটা আলতো করে টেনে ভেজিয়ে দিলেন। তারপর চলে এলেন রাস্তায়।

ওঁর প্রথম বাইটের অ্যাডভেঞ্চার বেশ নিশ্চিন্তেই শেষ হল বলা যায়। তাই বাড়ি ফেরার পথে বিশ্বনাথ হালকা মনে রেণুকণার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকিতে মেতে উঠলেন। শুধু ওঁর মুখের ভেতরে একটা আঁশটে গন্ধ লেগে ছিল। গন্ধটা বিশ্বনাথের খুব একটা খারাপ লাগছিল না।

তিতলির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা বিশ্বনাথের জীবনে একটা অলৌকিক ঘটনা। আর দেখা হলও এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। চৌরঙ্গি এলাকার বারগুলো তখন সবে সন্ধে শুরু করেছে। প্রতিটি বারের বাইরে লাল-নীল-সবুজ নিওন সাইন। তার পাশেই হলোগ্রাম ছবিতে প্রায়-নগ্ন ক্যাবারে নাচের বিজ্ঞাপন। হলোগ্রাম-নর্তকী সুরের ঝংকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শরীরের নানান প্রত্যঙ্গ নাচিয়ে চলেছে। আলো আর সুরের মেলা জাঁকিয়ে বসেছে রাস্তাটায়।

বিশ্বনাথ আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। চারপাশের প্রাপ্তবয়স্ক জগৎ দেখছিলেন।

বারগুলোর বাইরে মানুষজনের জটলা। কেউ হাসি-ঠাট্টায় মেতে আছে। কেউ চাপা গলায় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে, কেউ-বা ঢলানি সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে অসভ্যতায় মেতেছে।

আনমনা হাঁটতে-হাঁটতে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামটা সবে ছাড়িয়েছেন, হঠাৎই দেখলেন একটা গাড়ি ছুটে এসে একটা গাড়ির গায়ে রুক্ষভাবে ধাক্কা মারল। ধাতু আর প্লাস্টিক ভেঙে পড়ার শব্দ হল। তারপর চেঁচামেচি।

জায়গাটায় আলো বেশি ছিল না। কিন্তু বিশ্বনাথের দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাটা ওঁর দিনকেদিন জোরালো হয়েছে। চশমা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছেন সপ্তাহদুয়েক আগেই। আলোক আর পারমিতা এতে অবাক হলেও কোনও মন্তব্য করেনি।

বিশ্বনাথ দেখলেন, প্রথম গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে চট করে রাস্তায় বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। তারপর পাশের একটি সরু রাস্তা ধরে প্রাণপণে ছুট লাগাল।

পিছনের গাড়ির দরজা খোলা-বন্ধের শব্দ হল। তিনটি লোক নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। নেমেই ধাওয়া করেছে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালানো মেয়েটিকে।

বিশ্বনাথের ভেতরে একটা ভ্যাম্পায়ার জেগে উঠল। তিনি ছুটলেন লোকগুলোর পিছনে।

শরীরের এই জোর কোথা থেকে পেলেন সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি মালাকার। শুধু বলেছেন, 'দেখুন, এটাকে আমরা বলি এক্স-ফ্যাক্টর। হিউম্যান ফ্যাক্টর, চান্স ফ্যক্টর, আননোন ফ্যাক্টর—এইসব মিলেমিশেই এক্স-ফ্যাক্টর তৈরি। তবে এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই—শুধু বলব, এনজয় ইয়োর নিউ লাইফ, বাট প্লে ইট সেফ। বুঝতেই তো পারছেন...!'

এখন সেই এক্স-ফ্যাক্টর নিয়েই ছুটছিলেন বিশ্বনাথ।

রাস্তার দুপাশে পুরোনো আমলের বড়-বড় বাড়ি। তার সীমানায় বিশাল-বিশাল অন্ধকার গাছ। গাছের অচেনা ফুলের গন্ধ বিশ্বনাথের নাকে আসছিল।

রাস্তা নির্জন বলে ছুটন্ত পায়ের শব্দ দিব্যি শুনতে পাচ্ছিলেন। এ ছাড়া আরও শব্দ কানে আসছিল। কুকুরের ঘেউঘেউ, গাছের পাতার খসখস, রাতপোকার ডাক। অপারেশানের পর থেকে এরকম কত সূক্ষ্ম শব্দই যে শুনতে পান!

সত্যি, এই জীবনটা একদম নতুন—মানে, নতুন ধরনের।

গত দু-মাসে বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করেছেন বিশ্বনাথ। তাই হাতে টাকাও এসছে ভালোই। আর যতই টাকা এসেছে বিশ্বনাথের স্বাধীনচেতা মন ততই মাথাচাড়া দিয়েছে। আলোক আর পারমিতার শাসন থেকে অল্প-অল্প করে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে।

এখন খুশিমতন বাইরে বেরোন, পছন্দসই খাবার মাঝে-মধ্যে কিনে খান, হলে গিয়ে সিনেমাও দেখে ফেলেন টুকটাক।

আলোক বা পারমিতার বেশিরভাগ অভিযোগেরই কোনও উত্তর দেন না।

এক কান দিয়ে ঢোকান, অন্য কান দিয়ে বের করে দেন। আর ভিক্টরকে একটু সামলে চলেন। কারণ, এখন ওঁকে দেখলেই ভিক্টর কেমন যেন লোম খাড়া করে চাপা গরগর শব্দ করতে থাকে। ঠোঁট পিছনে টেনে ধারালো দাঁতের পাটি হিংস্রভাবে মেলে ধরে।

যত যা-ই হোক, নতুন জীবনটার মধ্যে যে একটা রোমাঞ্চ আছে সেটা বিশ্বনাথ স্বীকার করেন।

এখন, অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটে যেতে-যেতে, সেই রোমাঞ্চটাই টের পাচ্ছিলেন।

একটু পরেই রাস্তাটা একটা গলির মুখে এসে পড়ল। আর তখনই লোক তিনটে মেয়েটাকে ধরে ফেলল।

মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। রাস্তার আলোয় ওর ভয় পাওয়া ফরসা মুখ ঝলসে উঠল।

বিশ্বনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বড়-বড় শ্বাস নিতে লাগলেন।

এতক্ষণ একটা ঝোঁকের মাথায় ছুটে এসেছেন। বয়েসটার কথা ভাবেননি। এখন যেন হঠাৎই খেয়াল হল, ওরা তিনজন, আর বিশ্বনাথ একা।

লোক তিনটে তখন মেয়েটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আর মেয়েটা প্রতিবাদ আর যন্ত্রণার চিৎকার করে উঠছিল বারবার।

রেণুকণা যে পাশেই ছিলেন বিশ্বনাথ টের পাননি। হঠাৎই শুনলেন ওঁর চাপা ফিসফিসে গলা ঃ 'কী হল, যাও—মেয়েটাকে বাঁচাও...।'

'ওরা তিনজন—আর আমি একা...।' কাতর গলায় মিনমিন করে বললেন বিশ্বনাথ।

খিলখিল করে হাসলেন রেণুকণা ঃ 'আরে পাগল! ওরা মানুষ—আর তুমি ভ্যাম্পায়ার! এই নতুন জীবনটাকে ভালো কাজে লাগানোর চেষ্টা করো। যাও!'

এই আদেশের পর আর কোনও কথা চলে না।

বিশ্বনাথ চোখের পলকে ছুটে চলে গেলেন জটলার কাছে। সামনে যে-লোকটাকে পেলেন তার হাত ধরে এক টান মারলেন।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বিশ্বনাথের দিকে ঘুরে তাকাল। এবং বিশ্বনাথের চেহারা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

কোন আক্কেলে এই বুড়োটা এই সংঘর্ষে নাক গলাচ্ছে?

বিশ্বনাথের বুকে সজোরে ধাক্কা দিল লোকটা। কাঁচা খিস্তি দিয়ে বলে উঠল, 'আবে সুড্ডা লাল্লু, ফোট। সালা রাস্তা মাপ—নইলে দোকানের ঝাঁপ খুলে

দেব।'

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা একটা ছুরি বের করে ফেলেছে লোকটা।

রাস্তার আলোয় ওকে ভালো করে দেখলেন বিশ্বনাথ।

এমনিতে ভদ্রলোকের মতো চেহারা, তবে কুতকুতে চোখে শয়তানির ছাপ রয়েছে। চোয়াল চওড়া, কাঠের মতো শক্ত। মুখ থেকে অশ্রাব্য গালিগালাজ আর মদের গন্ধ বেরোচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছিল, এসব কাজে লোকটা পুরোনো পাপী।

মেয়েটা বাকি দুজনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল আর 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' বলে চিৎকার করছিল। দুজনের একজন পিছন থেকে মেয়েটাকে কষে জাপটে ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছিল।

অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু বিশ্বনাথের নজরে পড়েছিল। এও খেয়াল করেছিলেন, এত হইচই সত্ত্বেও কোনও লোক অকুস্থলে এসে হাজির হয়নি। বরং দু-একজন রাতচরা মানুষ যা চোখে পড়ছিল তারা চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছিল।

প্রথম লোকটা বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করে ছুরিসমেত হাত চালাল। ছুরির ধারালো ডগাটা বিশ্বনাথের বুক ছুঁয়ে গেল।

গায়ের জামাটা চিরে গেল কিনা বিশ্বনাথ বুঝতে পারলেন না, তবে একটা জ্বালা টের পেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। সামনে গলা বাড়িয়ে লোকটার ছুরি ধরা হাতে ভয়ংকর এক কামড় বসালেন। বাইটের নিয়ম মতো একটা কামড় বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড। কিন্তু এখন বিশ্বনাথ নিয়ম-টিয়ম সব ভুলে গেলেন। কচ্ছপের কামড়ের মতো চোয়াল চেপে রইলেন—যেন মেঘ না ডাকলে ছাড়বেন না।

লোকটা কিছুক্ষণ ঝটপট করল। কামড় ছাড়ানোর জন্য হাতটা একবার ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

তারপরই লোকটা ফুটপাতের ওপরে খসে পড়ল। যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে-চিৎকার জড়িয়ে গিয়ে আলতো হয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে গেল।

বিশ্বনাথ অদ্ভুত ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও!'

বাকি দুজনের মধ্যে যার হাতে কাজ কম ছিল সে একটা ছোট টর্চ বের

করে বিশ্বনাথকে তাক করে বোতাম টিপল।

আসলে লোকটা বোতাম টিপেছিল কৌতূহল আর বিস্ময়ে। কারণ, আধো-আঁধারিতে বিশ্বনাথকে দেখে ওর কমজোরি প্রৌঢ় বলেই মনে হয়েছিল। তার সঙ্গে মোকাবিলায় সঙ্গীর এই হাল লোকটা মানতে পারছিল না।

কিন্তু টর্চের আলো বিশ্বনাথের মুখের ওপরে পড়তেই পলকে সবকিছু মেনে নিল।

বিশ্বনাথের ঠোঁটের কোণ থেকে রক্তের রেখা গড়িয়ে নেমে এসেছে থুতনির দিকে। বুকের কাছে জামাটা রক্তে ভেজা। মানুষটার চোখে অমানুষিক দৃষ্টি। আর ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে থাকায় রক্ত মাখা দাঁত দেখা যাচ্ছে, সেইসঙ্গে জিভেরও খানিকটা।

ফুটপাতে পড়ে থাকা সঙ্গীর দিকে ঘুরে গেল টর্চের আলো। আর সেই মুহূর্তে বিশ্বনাথ ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রাণের মায়া ভুলে।

ওই যে মাথার ভেতরে রেণুকণা বলছিলেন, '...নতুন জীবনটাকে ভালো কাজে লাগানোর চেষ্টা করো...।'

ভয় পাওয়া লোকটা হাত বাড়িয়ে আক্রমণটা ঠেকাতে চেষ্টা করেছিল। বিশ্বনাথ পাগলের মতো ওর ডানহাতের কড়ে আঙুলটা কামড়ে ধরলেন। দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন শত্রুর ডানহাত। এবং এক ঝটকায় হাতটাকে বেঁকিয়ে দিলেন অন্যদিকে।

'মটাস' শব্দ হল একটা। বিশ্বনাথ আঙুল ভাঙার শব্দ আগে কখনও শোনেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা।

এবার লোকটার চিৎকারের পালা।

ওর হাত থেকে টর্চ ছিটকে পড়ল। সাঁড়াশি দিয়ে গলা চেপে ধরা শুয়োরের মতো বীভৎস আর্তনাদ করে উঠল। ছুটও লাগাল একইসঙ্গে।

নিজের অজান্তেই বিশ্বনাথ দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে গেলেন সামনের দিকে। তিননম্বর লোকটা বুঝল গল্প শেষ। তাই একটুও দেরি না করে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে পালাল।

বিশ্বনাথ বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছে নিলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। লজ্জায় গ্লানিতে একেবারে মরে যাচ্ছিলেন। পাগলের মতো এসব কী করলেন তিনি? ওই তো লোকটা পড়ে রয়েছে ফুটপাতে! বেঁচে আছে, না মরে গেছে? যদি সিক্রেট পুলিশ দেখে ফেলে এখন!

বিশ্বনাথ কী এক লজ্জায় মেয়েটার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। বোকার

মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠান্ডা বাতাস ওঁকে ঘিরে খেলা করতে লাগল। বাতাস বলছিল, শীত আসছে। বিশ্বনাথের গা শিরশির করছিল। একইসঙ্গে হালকা মদের গন্ধ নাকে আসছিল। বুঝলেন, মেয়েটা নেশা করেছে।

'শিগগির পালিয়ে চলুন! পুলিশ দেখতে পেলে কেলেঙ্কারি হবে।'

মেয়েটার কথায় বিশ্বনাথ যেন জেগে উঠলেন। মেয়েটা ওঁর হাত ধরে টান মারল ঃ 'শিগগির ছুট লাগান! এদিকে—।'

অন্ধকার রাস্তা ধরে দৌড়তে শুরু করল মেয়েটি। আর ওর পিছন-পিছন বিশ্বনাথ।

একটু পরেই ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল।

মেয়েটার গাড়িটা জায়গামতো দাঁড়িয়ে। তবে যে-গাড়িটা ওঁকে ধাক্কা মেরেছিল সেটাকে দেখা গেল না।

ঝটপট গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল মেয়েটি। উলটোদিকের দরজাটা খুলে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল বিশ্বনাথকে ঃ 'কুইক!'

বিশ্বনাথ সিটে বসে দরজা বন্ধ করেছেন কি করেননি এক হ্যাঁচকায় গাড়িটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তারপর ফাঁকা রাস্তা ধরে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে চলল।

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই মেয়েটি বলল, 'থ্যাংক্স ফর সেভিং মাই লাইফ।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর : 'আমার নাম তিতলি। আপনার?'

'বিশ্বনাথ। আপনাকে ওরা অ্যাটাক করেছিল কেন?'

'সে অনেক ব্যাপার—পরে কখনও বলব।' হঠাৎ বিশ্বনাথের জামার দিকে নজর গেল তিতলির ঃ 'আরে! আপনার জামাটা তো রক্তে ভিজে গেছে! শিগগির নার্সিংহোমে চলুন—একটা ব্যান্ডেজ-ফ্যান্ডেজ বেঁধে না দিলে...।'

বিশ্বনাথ সামান্য কাত হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। রুমালটা বাঁ-হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। চাপা শান্ত গলায় বললেন, 'না, না, সেরকম কিছু হয়নি। জাস্ট একটু চিরে গেছে।'

কাটা জায়গাটা এখন বেশ চিড়বিড়-চিড়বিড় করছিল। ছুরিটা ধারালো হওয়ায় প্রথমটা কিছু টের পাননি। তবে জ্বালাটা সহ্য করতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। পুরোনো জীবন হলে এই জ্বালাই হয়তো অসহ্য ঠেকত। তা ছাড়া বিশ্বনাথ জানেন, এই কাটা-ছেঁড়া নিয়ে নার্সিংহোমে যাওয়া মানেই সিক্রেট পুলিশকে নেমন্তন্ন করা।

'শিয়োর আপনার কষ্ট হচ্ছে না?' তিতলি উদ্বেগের গলায় জানতে চাইল আবার।

'উঁহু। একদম না...।'

তিতলি সন্দেহের চোখে কয়েক পলক বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে রইল।

তিতলির ফরসা মুখের ওপরে রাস্তার আলো পড়ছিল, সরে যাচ্ছিল। বিশ্বনাথ ওকে খুঁটিয়ে দেখলেন।

বয়সে কুড়ি কি বাইশ। গোল টলটলে মুখ। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত—মাথা নাড়লেই এপাশ-ওপাশ নড়ছে। চুলের একটা পাশ বোধহয় সোনালি রং করা।

তিতলির গলায় ফ্লুওরেসেন্ট পুঁতির মালা—আধো-আঁধারিতে লাল-নীল-সবুজ রং জ্বলছে। কানে একই ধরনের দুল। গায়ে কালো পোশাক। কবজিতে প্লাটিনামের ব্রেসলেট আর ঘড়ি। ডানহাতের আঙুলে পাশাপাশি একইরকম দুটো আংটি।

উইন্ডশিল্ডের সামনের তাকে রাখা ছিল একটা পারফিউমের শিশি। সেটা বঁ-হাতে তুলে নিল তিতলি। 'শ্-শ্-শ্' শব্দ করে নিজের গায়ে পারফিউম স্প্রে করল। তারপর সামনের রাস্তার দিকে আড়চোখে নজর রেখে দেখল বিশ্বনাথের দিকে ঃ 'পারফিউম নেবেন?'

বিশ্বনাথ হকচকিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'না—না।' পারফিউমের কড়া গন্ধে বিশ্বনাথের অস্বস্তি হচ্ছিল।

'ওইরকম তিনটে ইয়াংম্যানের সঙ্গে এরকম ম্যাজিকের মতো লড়ে গেলেন কেমন করে?'

ওর কথাতেই জবাব দিলেন বিশ্বনাথ, 'সে অনেক ব্যাপার—পরে কখনও বলব।'

পারফিউমের শিশিটা তাকে ফিরিয়ে দিল তিতলি ঃ 'চমৎকার। আমার কথায় আমাকেই দিলেন!'

'আমার দেওয়ার মতো কিছু নেই—।'

'তা হলে কি শুধু নেওয়া বাকি?'

'সেটাই বা পারছি কই?'

হেসে ফেলল, তিতলি ঃ 'আপনার কথাবার্তা বেশ ইন্টারেস্টিং। আপনার সঙ্গে আমার জমবে।'

বিশ্বনাথ ওর কথা বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

'আপনি কি ভি-স্টিং প্রোভাইডার?' আচমকা প্রশ্ন করল তিতলি।

'হ্যাঁ—, এক সেকেন্ড সময় নিয়ে স্পষ্ট জবাব দিলেন বিশ্বনাথ। মেয়েটা তা হলে লড়াইয়ের সময় বিশ্বনাথকে ভালোভাবেই লক্ষ করেছে!

'আমি আগে কখনও কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার দেখিনি। আমার এক বন্ধু বাইট নেয়—আমি কখনও নিইনি। একবার চেখে দেখলে হয়!'

'নেশা করা খারাপ...।'

'এটা কি বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ?' ব্যাঙ্গর সুরে কথাটা বলে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল তিতলি।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'নেশা করা খারাপ তো সো হোয়াট? আমার এই লাইফটাও তো খারাপ! যদিও তার জন্যে কোনও স্ট্যাটিউটরি ওয়ার্নিং দেওয়া ছিল না...।'

মেয়েটার লাইফটা খারাপ?

বিশ্বনাথ নিজের জীবনের কথা ভাবলেন—রেণুকণা চলে যাওয়ার পরের জীবনের কথা। সেটাকে মোটেই ভালো বলা যায় না। বরং ডক্টর মালাকারের দেওয়া এই নতুন জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে খারাপ লাগছে না।

'আপনাকে কোথায় নামাব?'

'যেখানে খুশি। তবে থাকি শ্যামবাজারে—নিউ টাউন, ফেজ ফোর-এ।'

ব্রেকে চাপ দিল তিতলি, গাড়ির মুখ ঘোরাল : 'চলুন, শ্যামবাজারেই আপনাকে নামিয়ে দিই। আমার হাতে কোনও কাজ নেই...।'

'থ্যাক্‌ংস।'

'আশ্চর্য।' ভুরু উঁচিয়ে তাকাল : 'আপনি আমার জীবনদাতা—আর বলছেন ''থ্যাক্‌ংস''!'

'অভ্যেস সহজে মরতে চায় না।' বুকের জ্বালাটা হঠাৎ খোঁচা দিল। বিশ্বনাথ যন্ত্রণায় চোখ বুজলেন একবার।

'আমি কোথায় থাকি জিগ্যেস করলেন না তো?'

'আমার বয়েস বাষট্টি। ছাব্বিশ হলে জিগ্যেস করতাম—।'

খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল তিতলি। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

বিশ্বনাথ চুপ করে ওকে দেখতে লাগলেন।

'ওঃ, আপনি তো দারুণ কথা বলেন! বাষট্টি উলটে ছাব্বিশ...' হাসির দমকে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল তিতলি, 'এনিওয়ে, আমি থাকি লালা লাজপত রায় সরণিতে। আর আমার বয়েস বাইশ—ওলটালেও একই থাকে।'

'এত রাতে চৌরঙ্গিতে কী করছিলেন?' কৌতূহল বিশ্বনাথকে কাঁটা ফোটাচ্ছিল।

'সেসব কথা পরে হবে—' মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ওড়াল তিতলি : 'দিন, আপনার ফোন নাম্বার দিন।'

'আমার পারসোনাল কোনও ফোন নেই।'

তিতলি এক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকাল বিশ্বনাথের দিকে। তারপর সহজভাবে বলল, 'তা হলে আমার মোবাইল নম্বরটা লিখে নিন—।'

বিশ্বনাথের কাছে কাগজ-পেন ছিল না। তাই রাস্তার ধারে গাড়ি সাইড করল তিতলি। গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে পেন আর কাগজ বের করে রাস্তার আলোতেই ফোন নম্বর লিখে দিল।

কাগজের টুকরোটা বিশ্বনাথের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'ফোন করবেন কিন্তু!'

বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

'প্রমিস?' বিশ্বনাথের ডানহাতের পাতাটা নিজের মুঠোয় নিয়ে আন্তরিকভাবে জানতে চাইল।

বিশ্বনাথ অদ্ভুত মেয়েটার চোখে তাকালেন। বললেন, 'গড প্রমিস।'

আবার গাড়ি ছোটাল তিতলি।

গাড়ির গতি আর দুরন্ত বাঁক নেওয়ার মধ্যে একটা খুশির ছাপ খুঁজে পেলেন বিশ্বনাথ। বুকের জ্বালাটা তখন আর টের পাচ্ছিলেন না।

বেশ মনে আছে, ব্রতীনকে সার্ভিস দিয়ে আসার পর রাতে ভালো করে দাঁত মেজেছিলেন। সেদিন রাতে কিছু খেতে ইচ্ছে করেনি। আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিলেন বিছানায়। তারপর রেণুকণার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছিলেন।

'আমি আজ যা করে এলাম সেটা কি পাপ?'

'কে বলেছে পাপ! হঠাৎ এসব আজেবাজে কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?'

'না...মানে...একটা অল্পবয়েসি ছেলেকে নতুন একটা নেশায় নামিয়ে দিলাম...।'

'তুমি না গেলে, "শর্টস অ্যান্ড কিকস" অন্য কোনও সি. ভি.-কে পাঠাত। তাছাড়া ব্রতীন তো আর মরে যায়নি। বরং কিছুটা আনন্দ পেয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ রেণুকণার যুক্তির কাছে হেরে গেছেন।

কিন্তু আজ? আজ কী বলবেন রেণু?

আজ রাতে বাড়িতে এসে কলিংবেল বাজাতেই আলোক বিরক্তভাবে দরজা খুলে দিল।

'কী যে তোমার একটা বাজে অভ্যেস হয়েছে! নিশাচর প্রাণীর মতো রাত করে বাড়ি ফেরা!' তারপরই রক্তে ভেজা শার্টটা চোখে পড়ল ওর : 'কী ব্যাপার? রক্ত কিসের?'

বিশ্বনাথ শুধু ছোট্ট করে বললেন, 'গুণ্ডারা অ্যাটাক করেছিল—।'

'চমৎকার!' আলোক ঠোঁটের কোণ দিয়ে কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে শূন্যে হাত নাড়ল : 'এখন সিক্রেট পুলিশের ঝুটঝামেলা সামলাবে কে?'

'কোনও ঝুটঝামেলা হবে না...।' নীচু গলায় কথাটা বলে ছেলের কাছ থেকে সরে গেলেন বিশ্বনাথ। তিতলির মুখটা চোখের সামনে ভাসছিল। অপলকে সেটাই দেখছিলেন।

আশ্চর্য! যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক, বিশ্বনাথের আঘাত নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই তার—বরং পুলিশি ঝামেলার ভয়ে সে অনেক বেশি ব্যতিব্যস্ত।

আর যাকে তিনি চেনেন না জানেন না সে বলেছিল, '...শিগগির নার্সিংহোমে চলুন...।'

একদলা থুতু এসে গেল মুখের ভেতরে। নিজের ঘরের দিকে যেতে-যেতে আড়চোখে দেখলেন পারমিতা ওদের শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে ঘেন্না এবং বিরক্তি।

নিজের ঘরে ঢোকার পর নতুন জীবনের অলৌকিক শ্রবণক্ষমতায় শুনতে পেলেন পারমিতার কথা, 'বুড়োটা দেখছি লায়েক হয়ে গেছে!'

জামা-টামা খুলে কাটা জায়গাটা ভালো করে পরখ করলেন। না, বিশেষ কিছু হয়নি—ইঞ্চিচারেক সামান্য চিরে গেছে। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে। তবে চিড়চিড়ে জ্বালাটা এখনও আছে।

তুলো দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করলেন বিশ্বনাথ। তারপর অ্যান্টিসেপটিক হিলার স্প্রে করে দিলেন। জ্বালাটা বেশ কমে গেল।

রাতে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে আবার রেণুকণার সঙ্গে কথা-যুদ্ধ।

ব্রতীনের বেলায়—বা ব্রতীনের মতো আরও অনেক ক্লায়েন্টের বেলায়—রেণুকণার যুক্তির কাছে কাবু হয়ে গেছেন বিশ্বনাথ।

কিন্তু আজ?

রেণুকণা বরাবর শান্ত, বুদ্ধিমতী। মৃত্যুর আগেও—পরেও। আজ বিশ্বনাথকে সুন্দর ঠান্ডা যুক্তি শোনালেন রেণুকণা।

একটা বাইশ বছরের মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে বিশ্বনাথ যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। তা ছাড়া ফুটপাতে পড়ে যাওয়া লোকটা যে মরে গেছে সে-কথা কে বলেছে! লোক তিনটে যেরকম ক্রিমিনাল টাইপের তাতে মনে হয় তারা এর আগে প্রচুর খুন-জখম-ডাকাতি করেছে। অনেক আগেই ওদের মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত ছিল। আক্ষেপ এটাই যে, দুটো গুণ্ডা প্রাণে বেঁচে পালিয়েছে।

ব্যস। বিশ্বনাথ আবার ঠুঁটো জগন্নাথ।

সুতরাং পরদিন সকালে যখন রাস্তায় বেরোলেন তখন বিশ্বনাথ পালকের মতো হালকা। বড় রাস্তার মোড়ে সিক্রেট পুলিশের দুজন অফিসারকে দেখে মোটেই ঘাবড়ে গেলেন না। বরং ওদের একজনকে সময় জিগ্যেস করে ঘড়ি মেলালেন। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে একটা পাবলিক ফোন বুথে ঢুকে পড়লেন।

কাগজের চিরকুটটা দেখে তিতলির নম্বর ডায়াল করলেন বিশ্বনাথ। ও-প্রান্তে 'হ্যালো' শোনামাত্রই বললেন, 'বাইশ, কেমন আছ?'

'হু ইজ ইট?' ঘুমজড়ানো স্বরে তিতলি জিগ্যেস করল।

'বাষট্টি বলছি—।'

সঙ্গে-সঙ্গে চিনে ফেলার খিলখিল হাসি। তারপর : 'ও, আপনি!'

'কী করছ এখন, বাইশ?'

'ঘুমোচ্ছি—।'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলা যায় না কি?'

'যায় বলছি তো!' আবার হাসি।

'আমাকে ফোন করতে বলেছিলে কেন?'

'আজ দুপুরে আমার এখানে খাবেন। আমরা খেতে-খেতে গল্প করব।'

'ওখানে আর কে-কে আছে?'

'কেউ না। আমি একা থাকি—আমার আর কেউ নেই...।'

তিতলির গল্পটা জানতে ইচ্ছে করল বিশ্বনাথের। মনে পড়ল, কাল রাতে ও বলেছিল, '...সে অনেক ব্যাপার...।'

বিশ্বনাথ যেতে রাজি হলেন। তিতলি ওকে বলে দিল কীভাবে ওর ফ্ল্যাটটা চিনে নেওয়া যাবে। তারপর জিগ্যেস করল, 'শিয়োর আসছেন তো? প্রমিস?'

বিশ্বনাথ হেসে বললেন, 'গড প্রমিস—।'

বাড়ি ফিরে বিশ্বনাথ শেভ করলেন। অনেক বাছাবাছির পর একটা শার্ট-

প্যান্ট পছন্দ করে পরে নিলেন। বহুদিন পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন। মুখে পাউডার, ক্রিম লাগালেন। তারপর অযত্নে পড়ে থাকা একটি পারফিউমের শিশি খুঁজে বের করে জামায় বেশ কয়েকবার স্প্রে করলেন।

মনের ভেতরে একটা খুশি ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এমন খুশি যে-খুশি সবাইকে ক্ষমা করতে শেখায়। হয়তো সেইজন্যই বেরোনোর সময় পারমিতার ভ্রূকুটি আর ভিক্টরের গজরানিকে ক্ষমা করে দিলেন।

পারমিতার দিকে না তাকিয়েই আলতো করে বললেন, 'একটু বেরোচ্ছি। দুপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন...।'

পারমিতার দিকে না দেখলেও বুঝতে পারলেন বউমা কী নজরে গলগ্রহ অকর্মণ্য শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তিতলির ফ্ল্যাটে পৌঁছতে খুব একটা অসুবিধে হল না বিশ্বনাথের। কলিংবেল বাজাতেই দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ পেলেন। ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখার জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় গেল বোধহয়। তারপর দরজা খুলে গেল, সামনে তিতলি।

'আমার দেরি হয়নি তো, বাইশ?' বিশ্বনাথ হেসে জিগ্যেস করলেন।

'একটুও না। আসুন, ভেতরে আসুন—।'

ফ্ল্যাটের ভেতরে পা দিলেন বিশ্বনাথ। চারপাশটা দেখে মনে হল স্বর্গ। কিন্তু স্বর্গটা নরকের মতো লন্ডভন্ড, অগোছালো।

আসার সময় বিশ্বনাথ বাইশটা লাল গোলাপ দিয়ে একটা সুন্দর তোড়া তৈরি করিয়েছিলেন। সেটা তিতলির হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা নাও। বাইশকে বাইশটা গোলাপ দিয়ে অভিনন্দন।'

তিতলি তোড়াটা দু-হাত বাড়িয়ে নিল। লম্বা শ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকল। বলল, 'আঃ দারুণ। বেশিক্ষণ শুঁকলে নেশা হয়ে যেতে পারে।'

তিতলির সঙ্গে বসবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বিশ্বনাথ। চারপাশে ভালো করে নজর বোলাতে লাগলেন।

ঘরের সর্বত্র বিস্তর খরচের ছাপ। সোফা সেট, চায়ের টেবিল, ক্যাবিনেট সবই স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। তার সঙ্গে অতি আধুনিক ট্যাপেস্ট্রি। ডিজিটাল প্লেট টিভি, সারাউন্ড থিয়েটার, ওয়াল-স্ক্রিন টেলিফোন—কী নেই ঘরে! কিন্তু

সব জিনিসই এলোমেলোভাবে রাখা। ওদের ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখার জন্য কেউ সময় দেয়নি। আর ধুলোও ছড়িয়ে আছে নানান জায়গায়।

বিশ্বনাথ লক্ষ করলেন, দেওয়ালে মাস্টারদের গোটাতিনেক ওরিজিন্যাল অয়েল পেইন্টিং। ঘরের এক কোণে ব্রোঞ্জের একটা মডেল। আর জানলায় রঙিন সুতোর বল দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ধরনের ঝুলন্ত পরদা।

সারা ঘরে মোলায়েম একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। বিশ্বনাথ কয়েকবার নাক টেনে ঘ্রাণ নিলেন। তারপর একটা সোফায় বসে পড়লেন। তাকালেন তিতলির দিকে।

ঘরটার মতো তিতলিও অগোছালো, কিন্তু ওকে দারুণ লাগছিল বিশ্বনাথের।

বোধহয় একটু আগে স্নান করেছে। কানের দুপাশে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো যে ভিজে সেটা বোঝা যাচ্ছে। গায়ে একটা গোলাপি শার্ট, পায়ে সাদা পাজামা। গলায় সরু প্লাটিনামের চেন, কানের লতিতে সরষের মতো দুটো প্লাটিনামের ফুটকি।

তিতলি জিগ্যেস করল, 'কাটা জায়গাটা কেমন আছে?'

'ঠিক আছে।' বিশ্বনাথ বুকে দুবার আলতো চাপড় মেরে প্রমাণ দিলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'তুমি ফুল ভালোবাসো?'

'কেন বাসব না! সবাই ভালোবাসে।' ফুলের তোড়াটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল তিতলি ঃ 'তা ছাড়া আমার হাতে তো বেশি সময় নেই! তাই আমার সবকিছু ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।'

'কেন, সময় বেশি নেই কেন? তুমি তো সবে বাইশ!'

মলিন হাসল তিতলি। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বিশ্বনাথের মুখোমুখি বসে পড়ল। বিশ্বনাথ কাল রাতের পারফিউমের গন্ধটা পেলেন। সেইসঙ্গে সিগারেটের গন্ধও।

'বলছি। আগে একটু কফি খান।' চট করে উঠে পড়ল। হেসে বলল, 'আমি রান্নাবান্না কিছু জানি না। শুধু চা আর কফি বানাতে পারি।'

'তা হলে দুপুরে খাব কোথায়? বাইরে?'

'না, এখানে। কাছেই একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ আছে। বেশ ভালো। ওখানে ফোন করে বলে দিয়েছি। একটা নাগাদ খাবার এসে যাবে। একমিনিট বসুন, কফিটা করে নিয়ে আসি—।'

প্রায় পাঁচমিনিট পরে কফির কাপ আর বিস্কুট ট্রে-তে সাজিয়ে হাজির হল। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রাখতেই বিশ্বনাথের চোখে পড়ল কফির কাপের পাশেই

বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট আর শৌখিন লাইটার।

সোফায় বসে বিশ্বনাথের হাতে কফির কাপ এগিয়ে দিল তিতলি। নিজেও নিল। কফির কাপে কয়েক চুমুক দেওয়ার পরই সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিল। বিশ্বনাথের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল : 'লাইক আ স্মোক?'

মাথা নেড়ে 'না' জানালেন বিশ্বনাথ। আগে সিগারেটের নেশা ছিল। রেণুকণা তাই নিয়ে দিনরাত আপত্তি করতেন। রেণুকণা মারা যাওয়ার পর ওই নেশাটা ছেড়ে দিয়েছেন।

তিতলি মাথা নীচু করে সিগারেট ধরাল।

'নিন, কফি খান। বোধহয় তেমন ভালো হয়নি।'

'তা কেন? ভালোই তো হয়েছে!' কাপে লম্বা চুমুক দিলেন বিশ্বনাথ।

'কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ারের লাইফ আপনার কেমন লাগছে?' ধোঁয়া ছেড়ে জিগ্যেস করল তিতলি।

'আগের লাইফের চেয়ে অনেক ভালো...।'

'আগের লাইফ মানে?'

কফি খেতে-খেতে বিশ্বনাথ তার আগের লাইফের গল্প বলতে লাগলেন।

বাষট্টির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বাইশ সেই গল্প শুনতে লাগল। শুনতে-শুনতে এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, সিগারেটটা কখন ছোট হয়ে গেছে খেয়ালই করেনি। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই চমকে জেগে উঠল তিতলি।

কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বনাথ তখনও গল্প বলেছিলেন। হঠাৎ, কী মনে হল কে জানে! তিতলির কাছ থেকে চেয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তিতলিও একটা ধরাল।

রেণুকণার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বনাথের চোখে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখ মুছলেন। ঘষা গলায় বললেন, 'এখনও আমি মনে-মনে ওর সঙ্গে কথা বলি। ও-ই আমার কথা বলার লোক।'

সব শোনার পর তিতলি অনেকক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'বাষট্টি, আমার ওসব প্রবলেম নেই। কারও সঙ্গে রিলেশান থাকলে— তারপর সেটা কেটে গেলে, তবে না তাকে মিস করব...।'

বিশ্বনাথ ওর গলায় বাষট্টি শোনামাত্রই চোখ তুলে তাকালেন। ওর কথার পিঠে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কারও রিলেশান হয়নি...সেটা ভাবা যায় না। তুমি এত সুন্দর...।'

'আপনি দেখছি ছাব্বিশের মতো কথা বলছেন!'

'সরি।' ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন বিশ্বনাথ। একটু থেমে বললেন, 'ঠিকই বলেছ। একটা বয়েসের পর সত্যি কথা বলতে নেই—বেমানান লাগে—।'

'আমি কিন্তু হার্ট করতে চাইনি। জাস্ট একটু মজা করছিলাম—।'

'আগের প্রশ্নটা আবার করতে পারি?' অনুমতি চাওয়ার ঢঙে বললেন বিশ্বনাথ।

'কোন প্রশ্ন?'

'কারও সঙ্গে রিলেশান হয়নি কেন?'

একটু ইতস্তত করে তিতলি বলল, 'আপনাকে সত্যি কথাটা বলছি। কাল আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তা না হলে আজ এত কথা কার সঙ্গে বলতাম!' মাথার চুলে হাত বোলাল। ভঙ্গিটা বিশ্বনাথের ভালো লাগল। আরও মনে হল, একটা বয়েসের পর এই ভালো লাগাটা অন্যায়।

তিতলি সময় নিচ্ছিল। এপাশ-ওপাশ তাকাল অকারণেই। তারপর খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলার ঢঙে আলতো স্বরে বলল, 'সেই ছোটবেলায় একজনের সঙ্গে রিলেশান হয়েছিল। তখন আমি পনেরো। ও-ই আমাকে আমার শরীরটাকে চিনিয়েছিল। ও ছাড়া আমাকে আর কেউ ভালোবাসত না—আমার বাবা-মাও না।'

বিশ্বনাথের দিকে চোখ ফেরাল। চোখের কোণে হিরের কণা।

'কেন? বাবা-মা নয় কেন?'

'বাবা মেয়ে চায়নি। আমার জন্মের পর যখন আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়েছিল...।' আবার জানলার দিকে তাকাল তিতলি।

বিশ্বনাথ ওর মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

চট করে বিশ্বনাথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ঃ 'এসব কথা আপনাকে বলছি...এগুলো ভীষণ পার্সোনাল...মানে...।'

বিশ্বনাথ বুঝলেন তিতলির ভেতরে একটা লড়াই চলছে। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। বিশ্বনাথ সুবোধ ছাত্রের মতো অপেক্ষা করে চললেন।

একসময় মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'টু হেল উইথ সো কল্‌ড সিক্রেট্‌স!' মুখ তুলল, ঠোঁট কামড়াল। তারপর ঃ 'আমাদের রিলেটিভ্‌সরা সবাই আমাকে আর মা-কে দেখতে এসেছে। আমার এক মাসি হঠাৎ বাবাকে লক্ষ করে বলল, ''কী সুন্দর দেখতে হয়েছে না! ঠিক মন্দিরার মুখটা যেন

বসানো। কী দারুণ লাগছে, তাই না!''

'মন্দিরা আমার মায়ের নাম। বাবা ''মণি'' বলে ডাকত। তো মাসির কথা শুনে বাবা সেই কথাটা বলেছিল...।'

'কী কথা?' আড়ষ্ট গলায় জানতে চাইলেন বিশ্বনাথ।

'বাবা মাসিকে বলেছিল, ''পরীক্ষায় ফেল করলে যেমন লাগে আমার ঠিক সেরকম লাগছে।'' কথাটা শুনে মা নাকি সবার সামনে কেঁদে ফেলেছিল।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'আমি বড় হওয়ার পর বাবার সঙ্গে মায়ের একদিন তুমুল ঝগড়া লেগেছিল। বাবা রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন মা হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে...কথাগুলো...বলেছিল আমাকে...।'

চোখে জল জমে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিতলি চোখ না বুজে জোর করে তাকিয়ে রইল। জলের ফোঁটা ওর গালে গড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সিগারেটটা বিশ্বনাথের তেতো লাগছিল। ওটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তিতলিও কখন যেন হাতের সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে দিয়েছে।

বিশ্বনাথ নরম গলায় জিগ্যেস করলেন, 'মা ভালোবাসত না?'

'বাসত—' ধরা গলায় তিতলি বলল

'তারপর?'

'আমার জন্মের পর থেকে মায়ের সঙ্গে বাবার রিলেশানটা ধীরে-ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বেশ কয়েক বছর পর মায়ের মনে হল, আমার জন্যেই এমনটা হচ্ছে—আমি নাকি অপয়া।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মুখ ভার করে বসে রইল। তারপর ঃ 'কী আর বলব! বাবার বাইরের টান ছিল...মা সেটা জানত। আমি তো ছোট ছিলাম...অতসব বুঝতাম না। মা বলত, ''পরীক্ষায় ফেল করার পর থেকে তোর বাবার বাইরের নেশা বেড়েছে। এখনও বুঝিসনি তুই অপয়া!'' আমি আস্তে-আস্তে বুঝতে শিখছিলাম...। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে মনে-মনে অনেক দূরে চলে গেলাম...একা হয়ে গেলাম...।

'তারপর...পনেরোর পা দিলাম। ও এল, চলেও গেল। ব্যস, গল্প শেষ!'

বিশ্বনাথের দিকে মুখ তুলে হাসল তিতলি। চোখে তখনও জল। জল মুছল। তারপর দু-হাত শূন্যে ঘুরিয়ে আনন্দের ভঙ্গি করে বলল, 'দুর! ওসব পুরোনো কথা ভেবে কোনও লাভ নেই। হাতে বেশি সময় নেই, বাষট্টি।' তাই আমি লাইফের সবরকম দেখতে চাই...।'

বিশ্বনাথের মনে হল, তিতলি এখন আর মুখ খুলবে না। তাই স্বাভাবিক গলায় ফিরে আসার চেষ্টা করে বললেন, 'কেন লাইফ কি সিনেমা নাকি? যেখানে সবরকম মশলা পাওয়া যায়?'

'না তো কী!' একলাফে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বিশ্বনাথ দেখছিলেন, মেয়েটা কেমন পালটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ওর একটু আগের কষ্টমাখা মুখটাকে বদলে ফেলতে চাইছে একপলকে।

'কাল রাতে লোকগুলো তোমাকে অ্যাটাক করেছিল কেন?' সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে গেলেন বিশ্বনাথ।

'ওসব পরে হবে। চলুন, আপনাকে আগে ফ্ল্যাটটা ভালো করে দেখাই—' তিতলি ওর শোওয়ার ঘরের দিকে রওনা হল। বিশ্বনাথকে আসার জন্য ইশারা করে বলল, 'ফ্ল্যাটটা নেহাত খারাপ না—কী বলেন!'

'দারুণ ভালো—' ফ্ল্যাটের তারিফ করলেন বিশ্বনাথ, 'শুধু একটু অগোছালো—।

'হ্যাঁ। জাস্ট লাইক মাই লাইফ।'

এরপর ওরা দুজনে এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে দেখতে লাগল।

বিশ্বনাথ ফ্ল্যাটের মার্বেল করা মেঝেতে বেশ সহজভাবেই ঘোরাফেরা করছিলেন। ওঁকে মোটেই অতিথি বলে মনে হচ্ছিল না।

ড্রইংরুম, ডাইনিং স্পেস, বেডরুম, গেস্টরুম—সবই ঝকঝকে, সর্বত্র বিলাসের আদর মাখানো।

বিশ্বনাথ তিতলির বিছানা দেখলেন, আধুনিক খাট দেখলেন, জামাকাপড় রাখার শৌখিন আলনা দেখলেন, এয়ারকুলার দেখলেন, দেখলেন পড়াশোনার টেবিল-চেয়ার। কিন্তু টেবিলে বইপত্রের বদলে পড়ে আছে সিগারেটের প্যাকেট, মদের বোতল, স্ম্যাকের পুরিয়া।

বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল বিশ্বনাথের। ওর দিকে তাকিয়ে অকারণেই জিগ্যেস করলেন, 'এসব নেশার জিনিস কার?'

'কার আবার? য়ু গেস।' থুতনি উঁচিয়ে বিদ্রোহী সুরে বলল তিতলি।

বিশ্বনাথ চুপ করে গেলেন। সামনের খোলা জানলার দিকে তাকালেন। সামনের বাড়ির দেওয়ালে রোদ পড়েছে। কার্নিশে দুটো চড়ুই।

ওরা আবার ড্রইংরুমে এসে পড়ল। সোফায় অলসভাবে বসে নানান গল্প শুরু করল।

সন্ধের মুখে বিশ্বনাথ তিতলির ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে

তিতলি 'আবার আসবেন কিন্তু' বলছিল। হঠাৎই ও 'একমিনিট—' বলে ছিটকে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই একটা গোলাপ নিয়ে ফিরে এল। বলল, 'আপনার দেওয়া বাইশটা থেকে একটা নিয়ে এলাম—আমার জীবনদাতার জন্যে। এটা রাখুন—।'

বিশ্বনাথ হেসে বললেন, 'কোনও মানে হয়!'

অথচ বিশ্বনাথ কল্পনায় একটা সাদা কার্ড দেখতে পাচ্ছিলেন—ফুলটার বোঁটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আর কার্ডে গোটা-গোটা হরফে লেখা : 'বাযট্টিকে বাইশ।'

ফুলটা পকেটে নিয়ে এক অনুপম ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে এলেন।

দিনগুলো কীভাবে কাটছিল বিশ্বনাথের ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না।

ক্লায়েন্টদের ভি-স্টিং দেওয়ার কাজ যেমন চলতে লাগল তারই সঙ্গে চলল তিতলিকে নিয়ে ব্যস্ততা।

প্রথম দিন ওর ফ্ল্যাট থেকে ফিরে প্রায় সারা রাত গোলাপটাকে নিয়ে কত কী না ভেবেছেন বিশ্বনাথ! রেণুকণার সঙ্গেও অনেক কথা বলেছেন।

রেণুকণা বলেছেন, 'দ্যাখো, ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্যের ব্যাপার নয়—তোমাকে খুশি দেখলেই আমি খুশি। এর বেশি আমি কিছু চাই না...।'

পরদিন রাস্তায় বেরিয়ে ফোনবুথ থেকে তিতলিকে ফোন করেছিলেন বিশ্বনাথ।

আজ সকালে বাইরে বেরিয়েও বিশ্বনাথের মনে হল, বাইশকে ফোন করলে কেমন হয়।

সঙ্গে-সঙ্গে ফোন বুথ। নম্বর ডায়াল। ক্রি-রি-রিং। এবং 'হ্যালো'।

'বাইশ, কেমন আছ?'

'ভালো। সবে ঘুম থেকে উঠছি।'

'এখন দশটা বাজে—।'

'অনেক রাতে শুয়েছি যে।'

'আমিও। তুমি এত রাত পর্যন্ত কী করছিলে?'

'ভাবছিলাম। আর নেশা করে বুঁদ হয়ে ছিলাম। এখনও হ্যাং-ওভার কাটেনি...।'

'নেশা করা খারাপ।'

'আবার গোরু রচনা! আমার সবচেয়ে খারাপ নেশাটা করতে ইচ্ছে করছে—

দারুণ জমবে।'

'সেটা কী?'

'আহা! জানেন না যেন!' একটু হাসল। তারপর : 'ভি-স্টিং...বাইট। এখনও পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে মারাত্মক নেশা। টিভিতে বলছিল...।'

'নেশা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।'

'ওঃ! মাই গুডনেস!'

'যাকগে—আজ কী আমাদের দেখা হচ্ছে?'

'অফ কোর্স...সন্ধেবেলা চলে আসুন...।'

বিশ্বনাথ একলহমা চিন্তা করে নিলেন। ঠিক করলেন, বিকেলে কমিউনিটি পার্কে বেড়ানো আর আড্ডা দেওয়ার পর অনায়াসে তিতলির ফ্ল্যাটে যাওয়া যেতে পারে।

'যাব। সাতটা নাগাদ। অসুবিধে হবে?'

খিলখিল হাসি। তারপর : 'ভদ্রতা লিমিট ছাড়িয়ে গেলে তাকে ন্যাকামি বলে। অফ কোর্স সাতটায় আসবেন...।'

'ছাড়ছি তা হলে...।'

'না, না—একটা জরুরি কথা আছে।' সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'কী?'

'কাল রাতে একটা লোক ফোন করেছিল। ফোনে থ্রেট করছিল...।'

'চেনা?'

'না—।'

'তো আগে জানালেই পারতে...।'

'কী করে জানাব?'

বিশ্বনাথ যেন হঠাৎই বুঝতে পারলেন, ওঁর কোনও ফোন নেই।

তিতলি তক্ষুনি ওঁর মনের কথাটা উচ্চারণ করল, 'আপনি একটা মোবাইল ফোন কিনে নিন—আজকেই।'

'ঠিক বলেছ।'

'সেদিন রাতে আপনাকে সামনে পেয়ে আজেবাজে সব ভাট বকে গেছি। হেভি বোর করেছি। কিছু মাইন্ড করবেন না।'

'সে তো আমিও বেশ লম্বা অটোবায়োগ্রাফি রিডিং পড়ে শুনিয়েছি।' একটু থামলেন। তারপরে ঃ 'এবার আজকের কথা বলো...।'

'সাতটায় মনে করে আসবেন। আমরা আজ গাড়ি নিয়ে যেদিকে-দু-চোখ-

যায় ঘুরতে বেরোব। রাস্তায় কোথাও ডিনার করে নেব।'

'তাই হবে। কিন্তু ওই ফোনটার কথা শুনে ভয় করছে...।'

হাসল তিতলি। বলল, 'ভয় পাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।...মনে থাকে যেন। সাতটায়।'

তিতলি 'বাই' বলে লাইন কেটে দিল।

বিশ্বনাথ চিন্তা করে দেখলেন, ওঁর এখন যা আর্থিক অবস্থা তাতে অনায়াসেই একটা মোবাইল ফোন কেনা যায়।

সন্ধেবেলা তিতলির ফ্ল্যাটে রওনা হওয়ার আগে সত্যি-সত্যিই একটা মোবাইল ফোন কিনলেন। বাড়তি টাকা দিয়ে নম্বরটা এমন বাছলেন যেন বাইশ আর বাষট্টি সংখ্যা দুটো নম্বরে পাশাপাশি থাকে। দোকানদারের কাছ থেকেই মোবাইলের প্রাথমিক কলাকৌশল শিখে নিলেন।

বাস স্টপেজ থেকে এসি চেয়ার কারে ওঠার আগে দুটো গোলাপ কিনলেন বিশ্বনাথ। দুটোই তিতলিকে দেবেন—তারপর একটা ফিরিয়ে নেবেন নিজের জন্য।

তিতলির ফ্ল্যাটে পৌঁছে মোবাইল ফোন আর গোলাপ দেখিয়ে ওকে চমকে দিলেন বিশ্বনাথ। গোলাপ দুটো ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে একটা আমি যাওয়ার সময় নিয়ে যাব...আমার জন্যে...।'

বিশ্বনাথকে ভেতরে ডেকে নিল তিতলি। মোবাইল ফোনের নম্বর নিয়ে ওঁকে ঠাট্টা করল।

ওকে নয়ন মেলে দেখতে লাগলেন বিশ্বনাথ।

কালো আর ছাই রঙের ছক কাটা ছোট হাতার একটা টপ পরেছে। তার বুকের কাছটায় লাল হরফে লেখা : 'আই অ্যাম মিং'। পরনে হলদে প্যান্ট, তাতে কালি ছেটানোর মতো কালো-কালো স্পট। গলায় অন্যরকম একটা চেন, কানের লতিতে ঝুরির মতো দুল, হাতে ব্রেসলেট।

বাইরের সন্ধের সঙ্গে মেয়েটা বেশ মানিয়ে গেছে। ওকে ঘিরে একটা সুগন্ধী বাতাস খেলে বেড়াচ্ছিল।

তিতলি আর দেরি করল না—বিশ্বনাথকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ও যে গাড়ি চালানোয় বেশ পটু তা আগের দিনই টের পেয়েছিলেন বিশ্বনাথ। আজও ওকে লক্ষ করছিলেন। কী সহজ অনায়াস ভঙ্গিতে স্টিয়ারিং, ব্রেক, ক্লাচ,

অ্যাকসিলারেটর নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে!

বিশ্বনাথকে প্রথমে একটা গেম্‌স পারলারে নিয়ে গেল তিতলি।

বিশাল মাপের তিনতলা পারলার। তাতে নানান ধরনের চোখধাঁধানো খেলা। চারপাশে রঙিন আলো। লোকজনের ভিড়। চারটে ট্রান্সপারেন্ট এলিভেটর ব্যস্তভাবে ওঠা-নামা করছে। মাঝে-মাঝে মেগাফোনে নানারকম অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। সারি-সারি ক্যাশ-কাউন্টার থেকে ইলেকট্রনিক স্মার্ট কার্ড কুপন বিক্রি হচ্ছে। কোনও নির্দিষ্ট গেমের স্লটে কার্ডটা টানলেই গেমের চার্জ বিয়োগ হয়ে যাবে।

এলিভেটরে দোতলায় উঠে 'নাইন স্টিক্‌স' নামে একটা খেলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। ন'টা রং-বেরঙের লাঠি পাশাপাশি দাঁড় করানো আছে। প্রায় ছ'-সাত মিটার দূর থেকে একটা বড় মাপের বল গড়িয়ে দিতে হবে লাঠিগুলোর দিকে। লাঠিগুলোর মধ্যে একটা কাঠের, আর বাকিগুলো হলোগ্রাম ইমেজ। কিন্তু দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। পাঁচবার বলটা গড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে খেলোয়াড়। তার আসল কাজ হল, কাঠের লাঠিটায় বল লাগানো। সেটায় ধাক্কা লাগলেই 'ঠক' করে শব্দ হবে। প্রথম তিনটে থ্রো-র মধ্যে আসল লাঠিটা হিট করতে পারলে পাওয়া যাবে পুরস্কার।

হইহই করে খেলায় নেমে পড়ল তিতলি। বিশ্বনাথকেও নামিয়ে দিল। একবার এই খেলা, আর একবার সেই খেলায় নাম দিয়ে বিশ্বনাথকে পাগল করে দিল। ওর সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ করতে-করতে বিশ্বনাথও যেন বাইশ হয়ে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পর গেম্‌স পারলার থেকে ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। বেশ কিছু টাকা প্রাইজমানি হিসেবে পেয়েছে তিতলি। ও খুশিতে বিশ্বনাথকে একটা আলতো ধাক্কা দিয়ে বলল, 'বাযট্টি, আপনি ভীষণ পয়া। দেখলেন, কত টাকা প্রাইজ পেলাম!'

বিশ্বনাথ হাসলেন।

আবার গাড়িতে চড়ে ওরা ছুট লাগাল।

এবারে তিতলি গিয়ে থামল 'রিল্যাক্স' নামের একটা অ্যাডিক্‌শান জয়েন্টে। এখানে নেশার সবরকম খোরাক পাওয়া যায়।

তিতলি বলল, 'এখানে আমি প্রায়ই আসি—।'

'রিল্যাক্স'-এর বাইরে লাল-নীল নিওন সাইন দিয়ে বিরাট হরফে লেখা রয়েছে : 'য়ু মাস্ট বি এইটিন টু এনটার' তার মধ্যে 'এইটিন' কথাটা লাল রঙে সংখ্যায় লেখা।

ভেতরে ঢুকে বেশ অবাক হলেন বিশ্বনাথ। যদিও জানতেন চারপাশে এসব চলছে, তবুও নিজে কখনও এরকম আস্তানায় আগে আসেননি।

চতুর্দিকে আলোর মেলা। তারই মধ্যে আলো দিয়ে ছবি আঁকা সব বিজ্ঞাপন। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনই নানান লিকার কোম্পানির। তা ছাড়া আছে নেশা করার কিছু ড্রাগের বিজ্ঞাপন। আর লুকোনো স্পিকার থেকে ভেসে আসছে রক মিউজিক।

সত্যি, নেশা-প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে!

একটা রঙিন ফুলের ছবি চোখে পড়ল। সেটা রোজ দু-মিনিট করে শুঁকলেই অদ্ভুত নেশা হবে। আর মাসে একবার ফুলটাকে রিচার্জ করে নিতে হবে। সেইরকমই দাবি করেছে একটি কোম্পানি।

বিশ্বনাথ অবাক শিশুর চোখে জগৎটাকে দেখছিলেন।

বিশাল হলঘরের নানা জায়গায় দাঁড় করানো আছে মদের স্লট মেশিন। তাতে বোতাম টিপে স্মার্ট কার্ড টানলেই গ্লাসে পরিমাণ মতো তরল পাওয়া যাবে। একটা কোণে ওয়াইড স্ক্রিন প্লেট টিভি-তে সিনেমা চলছে। ডানপাশের একটা লম্বা কাউন্টারে ড্রাগের সুদৃশ্য পলিপ্যাক বিক্রি হচ্ছে। কাউন্টারের মাথায় নিওন সাইনে লেখা 'স্ম্যাক জ্যাক'। আর কাউন্টারের সামনে উঁচু টুলে বসে আছে ঝিম মেরে যাওয়া খদ্দেররা।

হলে সাজানো চেয়ার-টেবিলের মেলা ছাড়িয়ে দূরের একটা অঞ্চলে লাল নিওন সাইনে লেখা 'হট স্পট'। সেখানে সিলিং থেকে লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলো ঠিকরে পড়েছে। সেই আলোর নীচে চলেছে মাতালদের ছন্দহীন উদ্দাম নাচ।

বিচিত্র সব নেশার গন্ধে বিশ্বনাথ পাগল হয়ে গেলেন। তেজি ঘ্রাণশক্তি ওঁকে আরও বিব্রত করে দিচ্ছিল। ভাবছেন বেরিয়ে যাবেন কি না, ঠিক তখনই ওঁর হাত ধরে টান মারল তিতলি।

'চলুন, ওইখানে গিয়ে বসি—।' একটা খালি টেবিলের দিকে আঙুল তুলে দেখাল মেয়েটা।

'বসব? কেন' বিশ্বনাথের গলায় আপত্তির ছোঁয়া।

'ভী-ষণ তেষ্টা পাচ্ছে।' অনুনয় করে বলল। একটা কাউন্টারে সাজানো রঙিন বোতলের সারির দিকে দেখাল।

'না!'

'না কেন? আমার যে অভ্যেস...। তা ছাড়া এখানে বসে খাওয়ার মজাই

আলাদা...।'

একটু চুপ করে রইলেন বিশ্বনাথ। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি তা হলে বোসো—আমি যাই!'

তিতলি এবার বিশ্বনাথের হাত ধরে ফেলল ঃ 'সেটা কখনও হয় নাকি! আপনি আমার গেস্ট...।'

'তা হলে চলো...চলে যাই। এখানে আমার ভালো লাগছে না!'

ছোট বাচ্চার বায়না করার ভঙ্গিতে তিতলি বলল, 'একবার—জাস্ট একবার!'

বিশ্বনাথ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন।

তিতলি কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর বিশ্বনাথের চোখে তাকিয়ে বলল,'আপনার কথা শুনব, যদি আপনি আমার কথা শোনেন—।'

'কী কথা?'

'আমি আপনার কাছে বাইট নেব—আজ রাতে।'

বিশ্বনাথ একটা জোরালো ধাক্কা খেলেন। বাইশ বলে কী!

কিন্তু বাইশ জেদ ধরে বসে রইল। বিশ্বনাথের কোনও জ্ঞানের কথা সে শুনতে রাজি নয়।

কথা কাটাকাটি করতে-করতেই ওরা 'রিল্যাক্স'-এর বাইরে বেরিয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত তিতলি এমন কথাও বলে বসল, 'আপনি এত আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারছি না। যা চার্জ লাগে আমি দেব...।'

বিশ্বনাথ যে বেশ আহত হলেন সেটা ওঁর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল। আর কোনও তর্কাতর্কির মধ্যে গেলেন না। তিতলির সঙ্গে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই বিশ্বনাথ জিগ্যেস করলেন, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'আমার ফ্ল্যাটে—এখন বাইরে ডিনার করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে ফ্রিজের লেফ্‌ট ওভার গরম করে দুজনে খেয়ে নেব, কেমন।' গাড়ি চালাতে-চালাতেই বলল তিতলি। চোখ সামনের রাস্তার দিকে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। কখন যেন ধরিয়েছে।

বিশ্বনাথ কয়েক পলক ওকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমি নেমে যাব। বাইট কোথায় পাওয়া যায় সে-কন্ট্যাক্ট নম্বর তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে নামিয়ে দাও...।'

তিতলি তাকাল। হাসল। বলল, 'রাগ হয়েছে? অন্য কারও কাছে বাইট

নেব না—আপনার কাছেই নেব।'

'কেন?'

'আপনি স্পেশাল, তাই—।'

'কেন, স্পেশাল হতে যাব কেন?'

খিলখিল করে হাসল তিতলি। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'রিল্যাক্স-এ তো প্রচুর লোক নেশা করছিল—আপনি শুধু আমাকে বারণ করলেন কেন?'

বিশ্বনাথের মুখে রক্তের ঝলক ছুটে এল। লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন।

তিতলি থুতনি উঁচু করে বলল, 'আপনাকে আমি গাড়ি থেকে নামতে দেব না। দেখি আপনি কী করেন।'

বিশ্বনাথ একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি কিছুই করব না। হেরে ভূত হয়ে গেছি।'

'দ্যাট্স লাইক আ গুড বয়। আমি চাই আমাকে আজ রাতে ভূতে ধরুক।'

বিশ্বনাথ চমকে উঠে তিতলির দিকে তাকালেন। ও তখন একমনে সিগারেটে টান দিয়ে চলেছে।

ফ্ল্যাটে এসে ওদের আর-একদফা তর্কাতর্কি শুরু হল। চলল জেদ আর বায়নার দড়ি টানাটানি।

শেষে তিতলি চোখ কুঁচকে, ঠোঁট উলটে, একটা আঙুল দেখিয়ে আন্তরিকভাবে বলল, 'বাষট্টি, প্লিজ...একবার। জাস্ট একবার...।'

বিশ্বনাথ তা সত্ত্বেও গাঁইগুঁই করছিলেন।

তখন তিতলি ব্যথা পাওয়া গলায় বলল, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার হাতে বেশি সময় নেই। হয়তো বাইট কেমন সেটা আর জানাই হবে না কখনও...। একটা দুঃখ থেকে যাবে, বাষট্টি।'

'কেন, সময় নেই কেন?' বিশ্বনাথের জেদ নমনীয় হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, এর আগেও একদিন তিতলি এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়েও দেয়নি।

সোফাতে হেলান দিয়ে হাতদুটো ওপরে তুলে সোফার পিছনে ঝুলিয়ে দিতে চাইল মেয়েটা। তারপর ঘষা কাচের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বিশ্বনাথের দিকে।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে যেন অনেক কষ্টে বিশ্বনাথকে ফোকাস করল। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, 'আজ আপনাকে বলব...সব বলব।'

বিশ্বনাথ চুপ করে রইলেন। অপলকে বাইশকে দেখতে লাগলেন। ওঁর বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল।

বাইশ বলতে শুরু করল।

'আপনাকে কখনও বলা হয়নি। আমরা...আমরা জঘন্য বড়লোক। আমাদের দুটো কয়লা খনি, আর একটা অভ্র খনি আছে। এ ছাড়া আর যা-যা থাকে ...বড়লোকদের। মানে, কলকাতায় তিনটে বাড়ি, রাজারহাটে একটা বাগানবাড়ি। আর তিনটে গাড়ি...আমারটা নিয়ে।

'যদিও ''আমাদের'', ''আমাদের'' বলছি...আসলে এসবের মালিক এখন আমি একা। সব আমার। কারণ, দু-বছর আগে আমার মা-আর বাবা হাইওয়েতে ...এনএইচ-থার্টিফোর-এ...একটা হরিব্‌ল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। স্পট ডেড।

'আগে মনে-মনে একা ছিলাম, অ্যাক্সিডেন্টটার পর সত্যি-সত্যি একা হয়ে গেলাম। এক কাকা ছাড়া আর কেউ রইল না। আর সেই কাকা...কাকা আমাকে পাগলের মতো তাড়া করে বেড়াতে লাগল।'

তিতলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ডানহাত নামিয়ে চোখ ঢাকল।

বিশ্বনাথ বিড়বিড় করে বললেন, '...তাড়া করে বেড়াতে লাগল কেন?'

চোখ ঢেকে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল তিতলি। ওর বুকের ওঠা-নামা দেখে সেটা বুঝতে পারছিলেন বিশ্বনাথ।

একটু পরেই ও চোখ থেকে হাত সরাল। তারপর বারদুয়েক নাক টেনে বলল, 'কাকা আসানসোলে থাকতেন। মাইনগুলো দেখাশোনা করতেন। তার জন্যে বাবা টাকা দিত মাসে-মাসে। কিন্তু ওই রোড অ্যাক্সিডেন্টটার পর কাকা একেবারে খেপে গেলেন। একে ওই কোটি-কোটি টাকার প্রপার্টি...আর তার সঙ্গে লোভ। বছরদেড়েকের মধ্যেই আমার কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। আমাকে বোকা বানিয়ে তিনি সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার তাল করতে লাগলেন। আমি বুঝতে পেরে বাধা দিলাম। লোকজানাজানি হয়ে গেল। আর তখনই বাধল ঝামেলা।

'আমাকে কিডন্যাপ করে কাকার একটা লুকোনো আস্তানায় তোলার জন্যে কাকা সুপারি দিয়ে প্রফেশন্যাল হুডলামদের লাগিয়ে দিলেন। কারণ, কাকা সম্পত্তি আইনমাফিক কবজা করতে গেলে কয়েকটা ডকুমেন্টে আমার সাইন দরকার। তো সেই লোকগুলো আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। ওরা কখনও আমাকে ফোন করে ভয় দেখায়। কখনও ফলো করে। কখনও-বা ফ্ল্যাটের দরজায় এসে সময়ে-অসময়ে কলিংবেল বাজায়।

'প্রথম-প্রথম আমি ভীষণ ভয় পেতাম। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বুঝলাম, ফালতু ভয় পেয়ে আর লাভ নেই—মরতে হবেই। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তা ছাড়া একা-একা কারই-বা সেরকম বাঁচতে ইচ্ছে করে!'

তিতলি একটু থামতেই বিশ্বনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কেন? তুমি তো পুলিশে খবর দিতে পারো...।'

'দিয়েছিলাম।' তেতো হাসল ঃ 'কোনও লাভ হয়নি। ওরা কাউকে ট্রেস করতে পারেনি। খুন-টুন হলে তারপর ক্লু পাওয়া যায়। খুনের আগে থেকেই এগুলো এক্সপেক্ট করাটা বড্ড বাড়াবাড়ি। এ-কথা একজন পুলিশ অফিসার আমাকে বলেছেন।

'প্রথম-প্রথম আমি এ-শহর থেকে ও-শহর পালিয়ে বেড়াতাম। দু-মাস পর ক্লান্ত হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছি। আর কোথাও আমি পালাতে চাই না। টু হেল উইথ দৌজ সুপারি কিলার্স। আই ওয়ান্ট টু ডাই ইন মাই ওন সিটি। যা হবে দেখা যাবে।' বিরক্তি আর ঘেন্না নিয়ে কথা শেষ করল তিতলি।

'তোমার কোনও বন্ধু নেই।'

'এখন?'

ওর প্রশ্নে বিশ্বনাথ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না, আগে হোক, এখন হোক...।'

'তিনজন কপালে জুটেছিল। কিলারদের কথা শোনামাত্রই দুজন সটকে পড়েছে। আর-একজন তো একটা এনকাউন্টারের মাঝে পড়ে গিয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

'এনকাউন্টার?'

'হ্যাঁ। সেদিন রাতে জওহরলাল নেহরু রোডে যেমন হয়েছিল। দুটো লোক একটা গাড়ি নিয়ে আমাকে চেজ করেছিল। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, শুভ্র আমার পাশে বসে ছিল। হেকটিক কার চেজের পর কোনওরকমে ওদের কাটিয়ে দেখি শুভ্র ফেইন্ট হয়ে গেছে।'

হাসল তিতলি। বলল, 'আর কিছু জানতে চাও?'

বিশ্বনাথ মাথা নাড়লেন ঃ 'না!'

'একমাত্র আপনাকেই দেখলাম, অকারণে ছুটে এসে বোকার মতো ডেঞ্জারাস সিচুয়েশানে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন...।'

'হয়তো আমি বোকা, ডেঞ্জারাস, তাই।'

'আপনি কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার। সেজন্যেও হতে পারে।'

'কে জানে! হতেও পারে—।'

'কী অদ্ভুত ব্যাপার! আমার কথায় বারবার সায় দিচ্ছেন কেন?'

'সায় দিতে ভালো লাগছে।'

অবাক হয়ে বিশ্বনাথের দিকে তাকাল তিতলি। তারপর উঠে দাঁড়াল ঃ 'চলুন, এবার শুরু করুন...।'

'কী?'

'আহা! ন্যাকা! বাইট।'

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন বিশ্বনাথ। সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। চলো, বেডরুমে চলো...।'

বিশ্বনাথ যেরকম সহজভাবে 'বেডরুম' কথাটা বললেন, তিতলি তার চেয়েও সহজভাবে বলল, 'এই ফ্ল্যাটের রুমগুলোর মধ্যে বেডরুমটা আমার সবচেয়ে ফেবারিট।'

ওরা শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

অন্ধকার ঘরে ঢুকেই তিতলি সুইচ টিপল। ঘরের সিলিং-এ ছড়িয়ে পড়ল নীল আলোর আভা। কিন্তু ল্যাম্পটা বিশ্বনাথের চোখে পড়ল না। শুধু দেখলেন, অদ্ভুত এক নীল মায়া ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।

আর-একটা সুইচ টিপল তিতলি।

খুব নীচু লয়ে কোমল সুর জেগে উঠল কোথা থেকে। ঠিক যেন মায়ের আদর মাখা ঘুমপাড়ানি গান।

বিশ্বনাথ তিতলিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। গাঢ় নীল অন্ধকার দিয়ে সেজে উঠেছে মেয়েটা।

ও হাতছানি দিয়ে ডাকল বিশ্বনাথকে।

বিশ্বনাথ পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন ওর কাছে। কাঁধ আর গলার খাঁজে ঝুঁকে পড়লেন। পারফিউমের চড়া গন্ধ নাকে এল।

এক অদ্ভুত বিষণ্ণ আনন্দ বিশ্বনাথের মনে ঢেউ তুলছিল। আঙুলের ডগা দিয়ে কাঁধের কাছ থেকে ওর পোশাকটা একটু সরিয়ে দিলেন। তারপর আরও ঝুঁকে ঠোঁট রাখলেন ওর কোমল ত্বকে।

তিতলি হঠাৎই বিশ্বনাথকে জাপটে ধরল। চাপা গলায় বলল, 'ওঃ, সিক্সটি টু!'

বিশ্বনাথ নাভিমূল থেকে কেঁপে গেলেন। পলকে যেন ছাব্বিশ হয়ে গেলেন। ওর উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা বিশ্বনাথকে উষ্ণ করে তুলল। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল,

সব কেমন গুলিয়ে গেল।

ভ্যাম্পায়ারদেরও তা হলে নেশা হয়!

ঠোঁট ফাঁক করে কামড় বসালেন বিশ্বনাথ। এক অলৌকিক চরম তৃপ্তি ওঁর ভেতরে কাজ করে চলল। তিতলির রক্তের স্বাদ জিভে টের পাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে সিরাম গ্ল্যান্ডে চাপ পড়ছিল। নেশা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকছিল তিতলির শরীরে।

আগে খেয়াল করেননি, বিশ্বনাথ কখন যেন আঁকড়ে ধরেছেন মেয়েটাকে। দুজনের বুক প্রবল চাপে মিশে যাচ্ছিল। তার পরেও মেয়েটা বিশ্বনাথকে কাছে টানতে চাইছিল, পাগলের মতো করছিল।

সেই সময় বিশ্বনাথের ধারালো দাঁতের চাপে একটা রক্তের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ওঁর মনে হল, এইরকম একটা আশ্লেষের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ বছর বেঁচে থাকা যায়। ওঁর জীবনে পশ্চিমদিকটা আচমকা পুবদিক হয়ে গেল যেন। যে-সূর্যটা অস্ত যাচ্ছিল, সেটা যেন কোন এক ম্যাজিকে ভোরের সূর্য হয়ে গেল।

তিতলির ঠোঁট চিরে একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসছিল। ঘুমিয়ে পড়ার ঘোরে বাচ্চারা যেমন আলতো 'উঁ-উঁ' শব্দ করে সেইরকম।

শব্দের তেজ ক্রমশ কমতে-কমতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল। তিতলি শরীরের ভার ছেড়ে দিল বিশ্বনাথের হাতে।

বিশ্বনাথ ওকে যত্ন করে ধরে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। পকেট থেকে স্টিকিং প্লাস্টার বের করে লাগিয়ে দিলেন ক্ষতের ওপরে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন ওর ঘুম-ঘুম মুখের দিকে।

বিশ্বনাথ বিছানায় বসে পড়লেন। তিতলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মুখের ভেতরের নোনা আঁশটে স্বাদটা বারবার জিভ বুলিয়ে থুতু গিলে কমাতে চাইলেন।

বিশ্বনাথ নিজের নতুন জীবনের কথা ভাবছিলেন। কোথায় ছিলেন, আর কোথায় এসে পড়লেন। যে-জীবনটাকে প্রতিদিন ঘৃণায় দূরে ঠেলতে চাইতেন, সেটাকে এখন তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল।

ঘোর ভেঙে গিয়ে চমকে উঠলেন বিশ্বনাথ। কে এল এ সময়? তিতলি তো বলেছিল, ওর সেরকম কোনও আত্মীয় কিংবা বন্ধু নেই!

ঝরনার শব্দ তুলে বেল বাজল আবার।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি পা চালালেন ফ্ল্যাটের দরজার দিকে।

ডাইনিং রুমে কোনও আলো জ্বলছিল না। তবে ড্রইংরুমে জ্বলছিল। বিশ্বনাথ দরজার ম্যাজিক আই-তে চোখ রাখলেন।

দুটো অচেনা লোক দরজায় দাঁড়িয়ে। একজন বেশ লম্বা, আর-একজন বেঁটে। বেঁটে লোকটার মুখ লেন্স দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বড্ড বেশি নির্লিপ্ত কাঠখোদাই মুখ। বিশ্বনাথের ওকে পছন্দ হল না।

লম্বা লোকটা একপাশে মুখ ঘুরিয়ে কান চুলকোচ্ছিল। তাই ওর মুখটা দেখতে পেলেন না। কিন্তু ওর কান চুলকোনোটা অভিনয় হতে পারে বলে মনে হল।

কী ভেবে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন বিশ্বনাথ। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা খুললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বেঁটে লোকটা একটা লম্বাটে রঙিন কৌটো বিশ্বনাথের মুখের সামনে উঁচিয়ে ধরল। এবং বিশ্বনাথ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অ্যাটমাইজারের বোতাম টিপল।

'স্-স্-স্-স্' শব্দ করে মিহি রেণুর শঙ্কু ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বনাথের মুখে। মিষ্টি গন্ধ পেলেন। বুঝতে পারলেন, স্প্রে করা তরলটা ক্লোরোফর্ম কিংবা ওই জাতীয় কিছু হতে পারে।

তিতলি যেহেতু একা থাকে তাই বেঁটে লোকটা ভেবেছে তিতলিই দরজা খুলবে। ফলে দরজা খোলামাত্রই সময় নষ্ট না করে অ্যাটমাইজারের বোতাম টিপেছে। তিতলি অজ্ঞান হয়ে গেলেই ওরা দুজনে ওকে তুলে নিয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ দরজা খোলায় গল্পটা ভেস্তে গেল।

যে-পরিমাণ তরল বেঁটে লোকটা স্প্রে করেছে তাতে কমপক্ষে দুজন মানুষের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু সি. ভি. বিশ্বনাথ অজ্ঞান হলেন না। চোখের নিমেষে ডানহাত বাড়িয়ে বেঁটে লোকটার টুঁটি খামচে ধরলেন।

লোকটার হাত থেকে রঙিন কৌটোটা খসে পড়ে গেল। ও চোখ বড় করে হাঁসফাঁস করতে লাগল। দু-হাতে বিশ্বনাথের কবজি চেপে ধরল। প্রাণপণ চেষ্টায় টুঁটির বাঁধন ছাড়াতে চাইল।

কিন্তু কোনও কাজ হল না।

বিশ্বনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি একটা কামড় দিলে তুমি খতম

হয়ে যাবে।'

এ-কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ হল।

পিছনের লম্বা লোকটা সবে কী করবে ভাবতে শুরু করেছিল। ও সঙ্গীকে ফেলে রেখে সটান সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাল। বিশ্বনাথের হঠাৎই মনে হল, লম্বা লোকটা বোধহয় আগের দিন সংঘর্ষের সময় হাজির ছিল। বিশ্বনাথের কামড়ে কী হতে পারে ও হাড়ে-হাড়ে জানে।

বেঁটে লোকটার অবস্থা তখন মরা নেংটি ইঁদুরের মতো। বিশ্বনাথ ওকে পিছনে ঠেলে দিলেন। চাপা গলায় বললেন, 'তিতলির গায়ে হাত দিতে গেলে আমাকে ডিঙিয়ে যেতে হবে...।'

বিশ্বনাথের ধাক্কায় লোকটা পড়ে গিয়েছিল। গলায় হাত বোলাতে-বোলাতে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল।

বিশ্বনাথ বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে যেন আমার আর দেখা না হয়।'

লোকটা কোনও জবাব না দিয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু ওর ছুটটা এক-পা খোঁড়া কুকুরের মতো দেখাল।

বিশ্বনাথ হাঁপাচ্ছিলেন। একটু-আধটু ভয়ও করছিল। এরা যদি সেই সুপারি কিলার হয় তা হলে সহজে হাল ছাড়বে না—ওরা আবার আসবে, এবং তৈরি হয়ে আসবে।

ঘুমপাড়ানি ওষুধের কৌটোটা মেঝেতে পড়ে ছিল। বিশ্বনাথ সেটা কুড়িয়ে নিলেন। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ড্রইংরুমে সোফায় বসে কৌটোটা টেবিলে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। টেলিফোনের পাশ থেকে কাগজ আর পেন নিয়ে তিতলিকে দু-লাইন নোট লিখলেন :

*বাইশ,*

*একটা বিপদ এসেছিল। রুখেছি। চলে যাচ্ছি। কাল কথা হবে।*

*বাবট্টি*

কাগজটা নিয়ে বেডরুমে গেলেন। ঘুমন্ত তিতলিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর কাগজের টুকরোটা রেখে দিলেন ওর হাতের কাছে।

তিতলির ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর এক অদ্ভুত ক্লান্তি টের পেলেন। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল হঠাৎই। তখনই রেণুকণার গলা পেলেন, 'সারা সন্ধে যা ধকল গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো—।'

বিশ্বনাথ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন বোধহয়। তাই রেণুকণার গলা পেয়ে চমকে

চারপাশে তাকালেন। তারপরই বুঝতে পারলেন, রেণুকণার কথাগুলো এসেছে ওঁর বুকের ভেতর থেকে।

তিতলিকে গাঢ় আবেগে জড়িয়ে ধরেছেন। ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে আছেন গলা। পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছেন—সেইসঙ্গে তিতলির গন্ধও। বুঝতে পারছিলেন, এই বাইট অন্তত—কিছুতেই শেষ হবে না।

জীবনের টান ভোরবেলায় বিশ্বনাথকে এই স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। যখন জেগে উঠলেন তখনও স্বপ্নটা আদর মাখা চাদরের মতো বিশ্বনাথকে জড়িয়ে ছিল।

বেলা হতেই রোজকার মতো রাস্তায় বেরোলেন বিশ্বনাথ। এটিএম থেকে পেনশনের টাকা তুলতে হবে। তারপর 'শর্টস অ্যান্ড কিক্স'-এর স্পেশাল সেল-এ একবার ফোন করতে হবে। নিজের জন্য টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে আর ওষুধ কিনতে হবে। তারপর সন্দীপনের সঙ্গে একবার দেখা করবেন। সি. ভি. জীবনের সুঃখ-দুঃখ নিয়ে কথা বলবেন।

রোদে হাসিখুশি রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে মনে হল তিতলিকে একটা এসএমএস করা যাক। এখন সওয়া দশটা বাজে—নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙেছে ওর।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে এসএমএস করলেন বিশ্বনাথ ঃ

*বাইশ জেগে ওঠো। তবে না 'গুড মর্নিং' বলব।*
*তাকিয়ে দ্যাখো, একটা দিন আমাদের জীবন থেকে*
*কমে যাচ্ছে।*

বিশ্বনাথ যখন ওষুধের দোকানে তখন এসএমএস-এর উত্তর এল ঃ

*বাষট্টি, জেগেছি। গুড মর্নিং বলবেন না?*

বিশ্বনাথ ভাবলেন, ওষুধের দোকানে কাজ মিটিয়ে তারপর ওকে ফোন করবেন।

প্রায় দশমিনিট পর দোকান থেকে বেরোতে-না বেরোতেই আবার তিতলির এসএমএস ঃ

*কী ব্যাপার? হারিয়ে গেলেন নাকি?*

বিশ্বনাথ হেসে ফেললেন আপনমনে। কী অল্পেতে ঠোঁট ফোলায় মেয়েটা! আসলে ওর কোনও দোষ নেই। সারা জীবনে কারও কাছ থেকে ও কিছু

পায়নি। যা ওর পাওনা ছিল তাও না। না পাওয়ার যন্ত্রণা ওকে অভিমানী করে তুলেছে।

বিশ্বনাথ মোবাইল বের করে ওকে ফোন করলেন।

'হ্যালো, বাইশ। কেমন আছ?'

'কী ব্যাপার? হারিয়ে গেলেন নাকি?' তিতলি নয়, ওর অভিমান কথা বলল বলে মনে হল বিশ্বনাথের।

'গুড মর্নিং, বাইশ—।'

'গুড না ছাই! ফোন করতে আর-একটু দেরি হলেই মর্নিংটা ব্যাড হয়ে যেত।'

'কেন? তুমি তো ফোন করতে পারতে আমাকে—।'

'পারতাম। কিন্তু সকালের প্রথম ফোনটা আপনার কাছ থেকে পেতে ভালো লাগে।' হাসল তিতলি ঃ 'থ্যাংকস ফর দ্য সুইট বাইট লাস্ট নাইট।'

মনে পড়ে গেল কাল রাতের কথা। বিশ্বনাথ একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। নীল আলোয় যা আকাঙ্ক্ষার মনে হয়েছিল এখন ঝকঝকে রোদে সে-কথা মনে পড়তেই বিব্রত হয়ে পড়লেন হঠাৎ।

তারপর উঠল বিশ্বনাথের লিখে আসা দু-লাইন চিঠিটার কথা। কথা চলল, এবং চলতেই থাকল।

সময় ভুলে গেলেন বিশ্বনাথ। আর তিতলিও।

বিশ্বনাথের মনে পড়ল, বাড়িতে যেদিন ওঁর মোবাইল ফোনের রিং-এর শব্দ আলোক প্রথম শুনতে পেয়েছিল সেদিন ওর মুখের অবস্থাটা কী বিচ্ছিরিই না হয়েছিল। বিশ্বনাথের ঘরে ছুটে এসে গায়ের ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ছেলে। অবাক গলায় জিগ্যেস করেছিল, 'এ কী, বাবা, তুমি মোবাইল ফোন কিনেছ?'

'হ্যাঁ, কী হয়েছে?' শান্ত গলায় পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন বিশ্বনাথ।

'না, অনেক টাকার ব্যাপার...তাই...।'

'ঘরে যাও। পারমিতা তোমাকে বোধহয় ডাকছে।'

ভিক্টরের মতো গরগর করতে-করতে চলে গিয়েছিল আলোক।

পারমিতার কাছে অনেক খবরই ও পাচ্ছে আজকাল।

বিশ্বনাথ বড্ড বেশি বাড়ির বাইরে-বাইরে কাটাচ্ছেন। নতুন-নতুন জামাকাপড় তৈরি করাচ্ছেন। পারফিউম স্প্রে করছেন। আগে তিন-চারদিন পরপর শেভ করতেন—এখন রোজ করছেন। দু-একদিন ওঁকে ফুল হাতে নিয়ে ঢুকতে দেখেছে

পারমিতা।

ছেলে আর বউমার বিস্ময় অবশ্যই টের পান বিশ্বনাথ। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। পুরোনো জীবনকে তোয়াক্কা না করাটা এখন ওঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তিতলির সঙ্গে, বলতে গেলে রোজই দেখা করেন বিশ্বনাথ। ওর সঙ্গে পথে বেরিয়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তিতলির যেমন খেয়াল হয় সেভাবেই ওদের পা চলে।

একদিন তিতলি বলল, কলকাতার টুরিস্ট স্পটগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখবে। ব্যস, অমনই ওদের ট্যুর শুরু হয়ে গেল। পুরো চারদিন লেগেছিল সবগুলো দেখে শেষ করতে।

ওর ছেলেমানুষি দেখে বিশ্বনাথ মজা পান। সেইসঙ্গে ভালোও লাগে। ওর মনের সমস্ত ভাবনা, খামখেয়ালিপনা, এত স্পষ্ট, এত খাঁটি যে, তার তুলনা নেই। মনটা পড়ে নেওয়া যায় খোলা খাতার মতো।

একদিন সন্ধেবেলা ময়দানে হাঁটতে-হাঁটতে তিতলি বলল, 'হাতে আমার যদি বেশি সময় থাকত তা হলে ভালো হত...।'

'তার মানে?' বিশ্বনাথ জিগ্যেস করলেন।

'মানে বাইশ থেকে বাষট্টিতে পৌঁছতে ইচ্ছে করছে। সবকিছু ছেড়ে চট করে চলে যেতে মন চাইছে না...।'

'কোথায় চলে যাবে?'

চলতে-চলতে হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখাল।

'এসব পাগলামি ছাড়ো! কে তোমাকে চলে যেতে দিচ্ছে?'

'কে আটকাবে? আপনি?'

'যদি বলি হ্যাঁ—আমি।' বেশ জোর দিয়ে বললেন বিশ্বনাথ।

মনমরা হাসল তিতলি ঃ 'আপনি পারবেন না। ওরা প্রফেশন্যাল। ডেঞ্জারাস।'

'আর তুমি তো জানো, আমি বোকা এবং ডেঞ্জারাস—।'

তিতলি কোনও জবাব দিল না। ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসল শুধু।

বিশ্বনাথ তিতলির জন্য ভীষণ চিন্তা করছিলেন।

গত দশ-বারোদিন ধরে হুমকি-ফোনের ব্যাপারটা বেশ বেড়ে গেছে। তিতলিও ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে যেন। যখন ও মরতে ভয় পেত না তখন ওর কোনও ভয় ছিল না। যেদিন থেকে ওর বাষট্টি হতে ইচ্ছে করছে, একটু-আধটু বাঁচতে ইচ্ছে করছে, সেদিন থেকে ভয় চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে ওর ভেতরে।

সন্ধে হয়ে আসছে দেখে বিশ্বনাথ বললেন, 'বাইশ, এবার বাড়ি ফেরা যাক—।'

পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে তিতলি বলল, 'এখনও সূর্য অস্ত যায়নি।'

'দেরি করার কী দরকার!' বিশ্বনাথের কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। বারবার চারপাশে তাকাচ্ছিলেন।

লাল সূর্যের দিকে চোখ রেখে তিতলি বলল, 'বাষট্টি, কাল আমরা দূরে কোথাও বেড়াতে যাব।'

'কোথায়?'

'কাল ভোরে উঠে যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছে হবে সেদিকে...।'

হঠাৎই বিশ্বনাথ দেখলেন, তিনটে লোক মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। তার মধ্যে একজন একটু বেশি লম্বা।

ভয় চলকে উঠল। অদৃশ্য গিটারের মোটা তার ঝংকার তুলল বিশ্বনাথের বুকের ভেতরে।

মাঠে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও লোকজন রয়েছে। বিপদে পড়ে চিৎকার করে উঠলে তারা নিশ্চয়ই ছুটে আসবে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

বিশ্বনাথ এ-কথা ভাবছিলেন এবং আড়চোখে লোক তিনটের দিকে নজর রাখছিলেন।

তিতলি লাল-হয়ে-যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে নানান কথা বলছিল। কিন্তু সব কথা বিশ্বনাথের মাথায় ঢুকছিল না। কারণ, লোক তিনটের দিকে লক্ষ করছিলেন।

হঠাৎই বিশ্বনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

লোক তিনটে মোটেই ওদের দিকে আসছিল না। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। সেই গাছ-বরাবর তাকালে দূরের রাস্তায় তিতলির শ্যাওলা রঙের গাড়িটা চোখে পড়ছে। অর্থাৎ, গাড়ির কাছে যেতে হলে লোকগুলোকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বনাথ আরও লক্ষ করলেন, গাছের নীচটায় ছায়া নেমে এসেছে। মাঠের লোকজনও কমে যাচ্ছে দ্রুত।

আর ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। তিতলিকে হাত ধরে টান মারলেন বিশ্বনাথ ঃ 'বাইশ, চলো, আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

তিতলি বায়নার সুরে বলল, 'কেন? আর একটু থাকি...।'

'না।'

তিতলির হাত টেনে নিয়ে এগোতে লাগলেন। লক্ষ করলেন, আকাশের

লাল আভা মলিন হয়ে সেখানে ছায়া-ছায়া তুলির আঁচড় পড়েছে। ঘরে ফেরা কাক-চড়ুইয়ের দল ঝাঁকড়া গাছগুলোয় বসে তুমুল হল্লা করছে। রাস্তার ধারে পার্ক করা তিতলির গাড়িটাকে বেশ কষ্ট করে দেখতে পাচ্ছেন।

সেইসঙ্গে এও দেখতে পেলেন, লোক তিনটে বৃত্তচাপের ঢঙে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা কালো বাজপাখি যেন ডানা ছড়াচ্ছে।

বিশ্বনাথের আর সন্দেহ রইল না। চট করে চলার দিক পালটালেন। একইসঙ্গে গতিও বাড়ালেন।

তিতলি বারবার জিগ্যেস করছিল, 'কী হয়েছে?'

বিশ্বনাথ চাপা গলায় বললেন, 'সুপারি কিলার্স।'

তিতলির গলা দিয়ে একটুকরো ভয়ের শব্দ বেরিয়ে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বনাথ বললেন, 'চুপ! আমি তো আছি!'

'ওদের সঙ্গে বোধহয় আর্মস আছে...।'

ওকে সাহস দিতে বিশ্বনাথ হাসলেন ঃ 'আর্মস আমারও আছে—তুমি জানো।' দাঁতের পাটি ফাঁক করলেন, বন্ধ করলেন।

'আজ রাতে একটা বাইট প্রেজেন্ট করা যাবে?'

কী অদ্ভুত কথা! মেয়েটার কি মতিগতির ঠিক নেই? এই সাংঘাতিক মুহূর্তে নেশার আবদার করছে!

'ওসব পরে হবে। আগে...।'

বিশ্বনাথ লক্ষ করলেন, লোকগুলো আর দাঁড়িয়ে নেই। দুজন জায়গা বদলে গাড়ির দিকে এগোনোর পথটা আগলাচ্ছে। আর তিন নম্বর লোকটা জোর পায়ে ছুটে আসছে বিশ্বনাথ আর তিতলির দিকে।

'রান!' বিশ্বনাথ গলা উঁচিয়ে বললেন, 'ছুট লাগাও জলদি—।'

ওরা ছুটতে শুরু করল। কিন্তু কিছুটা দৌড়ে যাওয়ার পরই তিন নম্বর লোকটা ওদের ধরে ফেলল। একটা খাটো রড উঁচিয়ে ধরল মাথার ওপরে।

বিশ্বনাথ হাতের এক ঝটকায় তিতলিকে ছিটকে দিলেন ঘাসের ওপরে। আর একইসঙ্গে লোকটার নেমে আসা হাতটা রুখে দিলেন। কিন্তু আঘাতটা পুরোপুরি এড়াতে পারলেন না।

রডটা মাথার পাশে এসে লেগেছিল। তখনই বুঝতে পেরেছেন ওটা লোহার। একটা ভোঁতা যন্ত্রণা মাথায় চারিয়ে গেল। পুরোনো বিশ্বনাথ হলে হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যেতেন। নতুন বিশ্বনাথ ব্যথাটা সামলে নিলেন।

লোকটা মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করেনি। বিশ্বনাথও না।

লোকটাকে দেখলেন।

ছোট-ছোট চুল। পুরু গোঁফ। গাল ভাঙা। দাঁতে রঙিন ছোপ। গলায় সোনালি চেন। পোশাক বলতে চাপা প্যান্ট আর টি-শার্ট।

না, এই লোকটা সেদিন তিতলির ফ্ল্যাটে অ্যাটাক করতে আসেনি। এটা নতুন।

লোকটাকে দেখতে একপলক লাগল। আর ওর গলায় কামড় বসাতে আর এক পলক।

ভিক্টরের মতো অলৌকিক ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিশ্বনাথ। তারপর হিংস্রভাবে কামড় বসিয়েছেন। কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার যে আসল ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে কিছু কম নয়, সেটাই যেন মরিয়া হয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন।

এতক্ষণ কথা-না-বলা লোকটা এবার গুঙিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। ঢলে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। কিন্তু বিশ্বনাথ কামড় ছাড়েননি। লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে সমান তালে ঝুঁকে পড়েছিলেন। শেষে হুমড়ি খেয়ে রইলেন ওর গলার ওপর।

নোনা। নোনা। নোনা।

গোটা সমুদ্রটা যেন ঢুকে পড়ছিল বিশ্বনাথের মুখের ভেতরে। সেইসঙ্গে যেন সমুদ্রের মাছগুলোও। কারণ, জোরালো আঁশটে গন্ধ টের পাচ্ছিলেন। শুনতে পেলেন, রেণুকণা বলছেন, না, এ কোনও অন্যায় নয়। একটা শয়তানকে মেরে তুমি একটা দুঃখী মেয়েকে বাঁচাচ্ছ। বাঁচাও! বাঁচাও!

তার মানে, শয়তানটাকে মারো, মারো!

বিশ্বনাথ তাই করছিলেন। লোকটা গলা কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছিল। আর একইসঙ্গে ওর প্রাণটা ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ময়দানের ঘাস ভিজে যাচ্ছিল।

মিনিটখানেক পর লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন, কাছেই তিতলি দাঁড়িয়ে। চোখ বড়-বড় করে বিশ্বনাথের কাণ্ডকারখানা দেখছে।

'শিগগির ছোটো গাড়ির দিকে! গাড়ি নিয়ে পালাও! কুইক!'

কিন্তু তিতলি বিশ্বনাথের কথা যেন শুনতেই পেল না। বলল, 'ওই দ্যাখো, ওই দুটো লোক আসছে...।'

'আসুক। ওদের আমি রুখে দিচ্ছি। বাট্‌ য়ু রান লাইক হেল। আমার কথা শোনো, বাইশ, প্লিজ! গাড়ি নিয়ে স্ট্রেট বাড়ি চলে যাও। সিক্রেট পুলিশকে ইনফর্ম করো। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা লক করে বসে থাকো। খবরদার, আমার কথা বলবে না কিছুতেই। যাও!'

'আর তুমি?' কাঁদতে-কাঁদতে জিগ্যেস করল তিতলি।

'আমি তোমাকে ফোন করব। তারপর কাল হয়তো তোমার আস্তানায় গিয়ে হাজির হব।' কথাটা শেষ করে বিশ্বনাথ হাসতে চাইলেন। কিন্তু হাসি এল না। ঠোঁট-মুখ চটচট করছে। থুতনি, গলা বেয়ে আঠালো তরল গড়িয়ে নামছে। হয়তো জামাতেও লেগে গেছে।

ছায়া-ছায়া আঁধারে ঠিক কী যে হচ্ছিল বাকি দুটো লোক সেটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারেনি। তা ছাড়া ওরা গাড়ি আগলাবে না সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে, সেটা নিয়েও দোটানায় ছিল। তাই ওদের সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগেছে। এখন ওরা জোরকদমে এগিয়ে আসছে বিশ্বনাথদের দিকে।

তিতলি কান্না-ভেজা ভাঙা গলায় বলল, 'আমি একা যাব না—তুমিও চলো।'

বিশ্বনাথ তিতলিকে রুক্ষভাবে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'তুমি গাড়ি নিয়ে পালাও। আমি এদের ব্যবস্থা করে তারপর...।'

বিশ্বনাথ লম্বা-লম্বা শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছিলেন। আবার বললেন, 'বাইশ, লক্ষ্মীটি—আমার এই কথাটা রাখো—প্লিজ। যাও—।'

'বাষট্টি!' বলে ডুকরে উঠল তিতলি। তারপর ঘুরপথে ছুট লাগাল গাড়ির দিকে।

লোক দুটো তখন বিশ্বনাথের হাতদশেকের মধ্যে এসে গেছে। সাবধানে সতর্ক পা ফেলে এক পা এক পা করে শিকার ধরতে এগিয়ে আসছে।

দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটাকে একটু যেন চেনা মনে হল বিশ্বনাথের। তিতলির ফ্ল্যাটে কি লোকটা এসেছিল? তা হলে তো বিশ্বনাথকে ও চিনবে।

একটা লোকের গলা শোনা গেল, 'ছামিয়াটা যে ওদিক দিয়ে ছুট লাগাচ্ছে, বস—।'

'আগে এই ড্যামনাটাকে কোতল কর। হারামিটা রামাইয়াকে লুটিয়ে দিয়েছে। আমাদের অপারেশানে বারবার দখল দিচ্ছে। আর ওই ছামিয়া পালাবে কোথায়! ওর তো ওই একটাই ঠেক—।'

কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন বিশ্বনাথ। এক্স-ফ্যাক্টর ওঁকে চমৎকার সাহায্য করছিল। ওঁর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যাক, তিতলিকে আজ ওরা রেহাই দিচ্ছে। এই একটা দিনই বিশ্বনাথের দরকার। সন্দীপনের এক শালা সিক্রেট পুলিশে আছে। কাল সকালেই ওর সঙ্গে দেখা করে তিতলির ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। আগেও বিশ্বনাথ সন্দীপনকে এ-ব্যাপারে রেখে-ঢেকে একটু ইশারা দিয়েছেন, কিন্তু ইমার্জেন্সি ভেবে

সেরকম তাগাদা করেননি।

লোকদুটো কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল শত্রু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পায়ের কাছে রামাইয়ার দেহ—অথবা, মৃতদেহ—অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

বিশ্বনাথ তিতলির দিকে লক্ষ করছিলেন। দেখলেন, ও গাড়িতে উঠে পড়ল। হেডলাইট জ্বলে উঠল। তারপর হেডলাইট দুটো দুরন্ত গতিতে ছুটতে শুরু করল।

আঃ—!

পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেললেন বিশ্বনাথ। এখন আর কাউকে তিনি ভয় পান না। সামনের এই জঘন্য লোকদুটোকেও না।

দুটো লোকের গায়েই ঢোলা শার্ট। প্যান্টের ওপর দিয়ে ঝোলানো। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলেও বিশ্বনাথ ওদের দেখতে পাচ্ছিলেন। একজনের বাচ্চা-বাচ্চা লালিপপ মুখ। বাঁ ভুরুর ওপরে কাটা দাগ। গা থেকে ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছে।

আর অন্যজন সেই লম্বা লোকটা। শিকারি বাঘের মতো সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম সুযোগেই ক্ষিপ্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দুটো লোকই কোমরের কাছে হাত গুঁজে রেখেছিল। বোধহয় লুকোনো অস্ত্র হাতে ছুঁয়ে ভরসা খুঁজছিল। আর বিশ্বনাথের দু-পাটি অস্ত্র মুখের ভেতরে খটাখট শব্দ তুলে আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিল।

একটা হাত বেরিয়ে এল ঢোলা শার্টের আড়াল থেকে। হাতে ধরা ফুটখানেক লম্বা একটা চওড়া ব্লেডের ছুরি।

বিশ্বনাথ হিসেব কষছিলেন। এই হতচ্ছাড়া দুটোকে যেভাবে হোক আটকাতে হবে। খতম না হোক, অন্তত ঘায়েল করতে হবে। যাতে ওরা রাইশকে আর জ্বালাতে না পারে।

হিসেবের উত্তর অনুযায়ী বিশ্বনাথ ছুরিওয়ালার ছুরি লক্ষ করে ঝাঁপ দিলেন। ভঙ্গিটা এমন, যেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুরি চলল বাতাসে। বিশ্বনাথের বাঁ হাতে, কনুইয়ের ঠিক ওপরে, কেটে বসল ছুরিটা। বিশ্বনাথ লোকটার কান ধরলেন মুঠো করে। এক হ্যাঁচকায় ওকে টেনে নিলেন নিজের কাছে। এবং ওর ডান কাঁধে মরণ কামড় বসালেন।

শুয়োরের বাচ্চাটা বুঝুক ভ্যাম্পায়ারের কামড় কাকে বলে!

বাঁ-হাতে বসানো ছুরির ফলা। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু বাষট্টির কোনও তোয়াক্কা নেই। বরং কামড়টা ঠিকঠাক দিতে পেরেছে বলে বেজায় খুশি।

ঠিক সেই মুহূর্তে যন্ত্রণায় ছটফট করা লোকটা এক প্রবল ধাক্কা দিল বিশ্বনাথকে। বিশ্বনাথ ছিটকে পড়লেন বটে, তবে লোকটার কাঁধের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে চলে এল দাঁতে।

আঁশটে গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। থু-থু করে সব ফেলে দিলেন। তারপর নজর ফেরালেন লোকদুটোর দিকে। দেখলেন আহত লোকটা টলছে—যে-কোনও মুহূর্তে খসে পড়বে জমিতে।

কিন্তু দু-নম্বর লোকটা কোথায় গেল?

ওই তো! আহত সঙ্গীকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঘাসের ওপরে চিত হয়ে পড়ে দেখতে লাগলেন বিশ্বনাথ। ওঁর একটা পা লম্বা হয়ে আছে রামাইয়ার গায়ের ওপরে। আর-একটা পা হিম-ভেজা ঘাসে।

আকাশের দিকে চোখ গেল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে চাঁদকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। চাঁদের খাঁজ এবং বাঁকগুলো মুগ্ধ করল বিশ্বনাথকে। যে-বাতাস হঠাৎ বইতে শুরু করেছে তাতে শীতের গন্ধ পাচ্ছিলেন। তবে তার মধ্যে যেন আলতো করে মৃত্যুর পারফিউম মিশিয়ে দিয়েছে কেউ।

ওই তো লম্বা লোকটা! ও একা দাঁড়িয়ে আছে। ওর শাগরেদ—কাঁধে কামড় খাওয়া লোকটা—নির্ঘাত খসে পড়েছে মাটিতে।

শরীরের সব শক্তি জড়ো করে উঠে বসলেন বিশ্বনাথ। বাঁ-হাতটা অসম্ভব জ্বালা করছে। এবার শেষেরটাকে খতম করার পালা। তা হলেই নিশ্চিন্ত। অন্তত কিছুদিনের জন্য।

লম্বা লোকটা কোমরের কাছ থেকে কী একটা বের করে শূন্যে তুলল।

অস্ত্রটা চিনতে পারলেন বিশ্বনাথ। খাটো হাতলের একটা কুড়ুল। কিন্তু ততক্ষণে অস্ত্রটা বাতাস কেটে শূন্যে বৃত্তচাপ এঁকে ধূমকেতুর মতো ছুটে আসতে শুরু করেছে বিশ্বনাথের দিকে।

কুড়ুলটা বিশ্বনাথের বুকে এসে আছড়ে পড়ল। সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দ হল। ফলার অর্ধেকটা গেঁথে গেল ওঁর পাঁজরে। আর উঠে বসতে-চাওয়া বিশ্বনাথ কুড়ুলের ধাক্কায় সটান চিত হয়ে পড়ে গেলেন।

হেঁচকি তোলার একটা শব্দ বেরিয়ে এসেছিল মুখ থেকে। চেষ্টা করেও বিশ্বনাথ মর্মান্তিক শব্দটা চাপা দিতে পারেননি। একইসঙ্গে বুকের ভেতরে দম বন্ধ হয়ে এল। একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন শ্বাসনালীতে আটকে গেছে।

ঝাপসা চোখে লম্বা লোকটার দাঁড়ানো সিল্যুট দেখতে পেলেন। ওর মাথার পাশ দিয়ে উঁকি মারছিল শুক্লপক্ষের চাঁদ।

সামনে ঝুঁকে পড়ে কুড়ুলের হাতল ধরে প্রকাণ্ড এক হ্যাঁচকা মারল শত্রু। বোধহয় ইচ্ছে ছিল কুড়ুলের দ্বিতীয় আঘাত হানবে বিশ্বনাথের বুকে। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। কারণ, কুড়ুলের ফলাটা কিছুতেই ছাড়ানো গেল না বিশ্বনাথের পাঁজর থেকে।

বিশ্বনাথের সারাটা শরীর চটচট করছিল। আঁশটে গন্ধ তুফান ছুটিয়ে দিয়েছে চারপাশে। কুড়ুলের কাঠের হাতলটা কোনওরকমে চেপে ধরলেন। তারপর ওঁর আঙুলগুলো কাঁকড়ার দাঁড়া হয়ে হাতল বেয়ে উঠতে লাগল। লম্বা লোকটা তখনও হাতল ধরে টানাটানি করছে। বিশ্বনাথের আঙুল ওর আঙুলের নাগাল পেয়ে গেল।

ব্যস। সঙ্গে-সঙ্গে তিতলিকে নিরাপদ করার তীব্র অভিলাষ বিশ্বনাথকে পেয়ে বসল। লোকটার আঙুল আঁকড়ে ধরে এক হিংস্র টান মারলেন। লোকটা নিমেষের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিশ্বনাথের বুকের ওপর। বিশ্বনাথ এক মুহূর্তও দেরি না করে লোকটার গাল কামড়ে ধরলেন। সিরাম গ্ল্যান্ডে চাপ দিলেন প্রাণপণে।

হে ভগবান, একে খতম করার পুঁজি যেন থাকে আমার অলৌকিক জীবনে! বিড়বিড় করে বারবার এই প্রার্থনা জানাতে চাইলেন বিশ্বনাথ।

লোকটা এলোপাথাড়ি ছটফটাচ্ছিল। কিন্তু একটু পরেই দম-ফুরিয়ে-যাওয়া পুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল। টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল বিশ্বনাথের গায়ের ওপর থেকে।

বিশ্বনাথের মনটা পালকের মতো হালকা হয়ে গেল। চিত হয়ে শুয়ে কুড়ুলের কালো হাতল আর চাঁদ দেখতে লাগলেন। হাতলটা যেন ওঁর শরীরেরই একটা বিচিত্র প্রত্যঙ্গ—আকাশের দিকে প্রতিবাদে উঁচিয়ে আছে।

ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল হঠাৎই। বিশ্বনাথের জ্বালায় আলতো প্রলেপ লাগাল।

সঙ্গে-সঙ্গে পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল আনন্দের সুরে।

অতি কষ্টে ডানহাত পকেটে ঢুকিয়ে বের করে নিলেন ফোনটা। সুইচ টিপে ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন, 'হ্যালো—।'

'বাষট্টি, তুমি ঠিক আছ তো? আর য়ু ও. কে.?' উদ্বেগে পাগল তিতলির গলা।

'আমি ঠিক আছি।' কোনওরকমে বললেন বিশ্বনাথ। প্রাণপণে কষ্ট চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন : 'আর কোনও ভয় নেই, বাইশ...।'

'তুমি শিগগির আমার এখানে পালিয়ে এসো। এখানে কেউ তোমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না—।'

'যাচ্ছি।' বিশ্বনাথের গলা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল।

'শিগগির চলে এসো।' উচ্ছল গলায় বলল তিতলি, 'আমি তো ওয়েট করছি! আজ রাতে আমার ফ্ল্যাটে তুমি থেকে যাবে—।'

'যাচ্ছি—।' আবার বললেন বিশ্বনাথ। বইপত্র পড়ে কিংবা সিনেমা দেখে যেটুকু তিনি জেনেছেন, তাতে কুড়ুলের ঘায়ে ভ্যাম্পায়াররা খতম হয় না। কাঠের বল্লম দিয়ে ফুঁড়ে দিতে হয় তাদের হৃৎপিণ্ড। সুতরাং কোনও ভয় নেই। এক্ষুনি ওর বীভৎস ক্ষতের জায়গাটা অলৌকিক ম্যাজিকে মোলায়েম হয়ে জুড়ে যাবে। তারপর, বিশ্বনাথ উঠে বসবেন। তিতলির...।

কিন্তু গল্পের সঙ্গে, সিনেমার সঙ্গে, ব্যাপারটা মিলছিল না। শরীরটা কাহিল হয়ে আসছিল, হাঁ করে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন, আর চোখের নজর দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

বোকার হদ্দ মেয়েটা তখনও ফোনে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছিল, 'বাষট্টি, তুমি আসছ তো? বাষট্টি! বাষট্টি...।'

বিশ্বনাথের শিথিল হাত থেকে মোবাইল ফোনটা খসে পড়ে গেল ঘাসের ওপরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'যাচ্ছি...।'

---